ব্যাচেলর অব এডুকেশন

হিসাববিজ্ঞান শিক্ষণ

Teaching Accounting

EDBN 1432

রচনা

প্রফেসর দীপক কুমার নাগ
মোঃ জিল্লুর রহমান
মলয় কুমার সাহা
নীহারিকা মাঝি
সুশান্ত কুমার মিত্র

মূল্যায়ন

মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম
আবদুল হালিম ভূঞা
রোকেয়া পারভীন

সম্পাদনা

মলয় কুমার সাহা
সুশান্ত কুমার মিত্র

স্কুল অব এডুকেশন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

হিসাববিজ্ঞান শিক্ষণ
EDBN 1432
বিএড প্রোগ্রাম

প্রধান সমন্বয়ক
মোঃ জহির উদ্দিন বাবর
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ (টিকিউআই-২) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট

সমন্বয়ক
রায়হানা তসলিম, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
ড. রেহেনা খাতুন, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
কাজী সাখাওয়াৎ হোসেন, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
রিজওয়ানুল হক, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প

সহযোগিতায়
প্রফেসর মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
ড. সুধাংশু রঞ্জন রায়, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
আবু সাঈদ মজুমদার, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
রওশন আরা বেগম, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
মাকসুদা বেগম, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
গাজী মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, টিকিউআই-২ প্রকল্প

গ্রন্থস্বত্ব
শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এ বইয়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক মুদ্রণ, পুনঃমুদ্রণ সংশোধিত আকারে প্রকাশ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে কপিরাইট আইন প্রযোজ্য। তবে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক কার্যক্রমে এ বই ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রথম মুদ্রন: ডিসেম্বর ২০১৮
পুন:মুদ্রন: মার্চ ২০২০

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফদ্দীন আব্বাস

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর– ১৭০৫।

(স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৮২.১৪.০০৫.১৮.১০০ তারিখ: ৩১ জুলাই ২০১৯ ইংরেজি, ১৬ শ্রাবণ ১৪২৬ বাংলা অনুযায়ী অনুমোদনক্রমে TQI-II প্রকল্পের আওতায় প্রণীত জাতীয় বিএড প্রোগ্রামের পাঠ্যপুস্তক বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুন:মুদ্রন করা হলো।)

ISBN: 978-984-34-0116-8

মুদ্রণে:

হিসাববিজ্ঞান শিক্ষণ

সূচীপত্র

ইউনিট	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
ইউনিট ১	**মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে হিসাববিজ্ঞান**	**০১-০৭**
১.১	হিসাববিজ্ঞানের ধারণা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	০১
১.২	হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা, মাধ্যমিক স্তরে হিসাববিজ্ঞান পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	০৪
১.৩	মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ও জবাবদিহিতা প্রক্রিয়ায় হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা	০৫
ইউনিট ২	**মাধ্যমিক পর্যায়ে ৯ম-১০ম শ্রেণির হিসাববিজ্ঞান**	**০৮-১৮**
২.১	উত্তম পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়	০৮
২.২	পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন, হিসাববিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন	০৯
২.৩	শিক্ষক নির্দেশিকা	১৩
২.৪	শিক্ষক প্রশিক্ষণ	১৬
ইউনিট ৩	**হিসাববিজ্ঞান শিখন-শেখানো পরিকল্পনা**	**১৯-২৯**
৩.১	শিখনফল	১৯
৩.২	হিসাববিজ্ঞান শিক্ষার শিখনফল	২০
৩.৩	বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা ও একক পাঠ পরিকল্পনা	২২
৩.৪	পাঠ পরিকল্পনা, বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব ও ধাপসমূহ	২৬
৩.৫	পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন	২৭
ইউনিট ৪	**হিসাববিজ্ঞান শিখন-শেখানো পদ্ধতি**	**৩০-৪৬**
৪.১	শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতি ও শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি	৩০
৪.২	বক্তৃতা পদ্ধতি, আলোচনা পদ্ধতি, সমস্যা সমাধান পদ্ধতি, প্রকল্প পদ্ধতি (কারখানা পরিদর্শন)	৩৩
৪.৩	অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, হিসাববিজ্ঞান শিক্ষায় অংশগ্রহণমূলক শিখন- শিখানোর প্রয়োজনীয় কলাকৌশল ও দক্ষতাসমূহ- একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, মাথা খাটানো, মাইন্ড ম্যাপিং	৩৮
৪.৪	অনুশিক্ষণ, সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ	৪১
৪.৫	অনুশিক্ষণ কৌশল বা দক্ষতাসমূহ প্রদর্শন	৪২
৪.৬	সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণ/ছদ্ম শিক্ষণ সুবিধা ও অসুবিধা	৪৪
৪.৭	ফলাবর্তন, ফলাবর্তন কার্যকর করার কৌশল, ফলাবর্তনের সুবিধাসমূহ।	৪৫

ইউনিট ৫	**হিসাববিজ্ঞান শিখন-শেখানো সামগ্রী / উপকরণ সংগ্রহ ও এর উন্নয়ন**	**৪৭-৫৯**
৫.১	শিক্ষা উপকরণ, গুরুত্ব ও ব্যবহারের নীতিমালা	৪৭
৫.২	শিক্ষা উপকরণের শ্রেণিবিভাগ, শিক্ষা উপকরণ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ, বিনামূল্যের ও স্বল্পমূল্যের শিক্ষা উপকরণ	৫০
৫.৩	হিসাববিজ্ঞান শিক্ষার শিক্ষা উপকরণের তালিকা প্রস্তুতকরণ ও শিক্ষা উপকরণ তৈরি	৫২
৫.৪	অন্যান্য পাঠ্যপুস্তক, ICT উপকরণ-ভিডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	৫৪
ইউনিট ৬	**৯ম-১০ম শ্রেণির হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের আলোচ্য বিষয়**	**৬০-৮৬**
৬.১	দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতি, বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা	৬০
৬.২	ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়ের নিয়মাবলী	৬৩
৬.৩	হিসাবচক্র, মূলধন ও মুনাফা জাতীয় দেনদেনের পার্থক্য, হিসাব সমীকরণ	৬৪
৬.৪	আর্থিক বিবরণী, একমালিকানা ব্যবসায়ের আর্থিক বিবরণী	৬৯
৬.৫	আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের বিবেচ্য বিষয়	৭৬
৬.৬	আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণে হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালার প্রয়োগ	৭৭
৬.৭	পণ্যের ক্রয়মূল্য, উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয় মূল্য	৭৯
ইউনিট ৭	**হিসাববিজ্ঞান শিখন-শিখানো কার্যক্রমে সমন্বিত শিখন যাচাই**	**৮৭-১০১**
৭.১	হিসাববিজ্ঞান শিখন-শেখানো শিখন যাচাই কৌশল, শিখন যাচাইয়ের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা	৮৭
৭.২	ধারাবাহিক বা গঠনকালীন ও প্রান্তিক বা চূড়ান্ত শিখন যাচাই	৮৯
৭.৩	শ্রেণি অগ্রগতি অভীক্ষা প্রণয়ন-১	৯১
৭.৪	শ্রেণি অগ্রগতি অভীক্ষা প্রণয়ন-২	৯২
৭.৫	সৃজনশীল প্রশ্ন -১	৯৪
৭.৬	সৃজনশীল প্রশ্ন-২	৯৮
৭.৭	নম্বর প্রদানের মানদণ্ড	১০০
ইউনিট ৮	**হিসাববিজ্ঞান শিখন শেখানো পরিবেশ উন্নয়ন**	**১০২-১০৬**
৮.১	মাধ্যমিক পর্যায়ে হিসাববিজ্ঞান পাঠের উপযোগী শিখন শেখানো পরিবেশ তৈরি	১০২
৮.২	হিসাববিজ্ঞান শিক্ষকের যোগ্যতা ও গুণাবলী	১০৪
৮.৩	হিসাববিজ্ঞান শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন	১০৫
	গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)	১০৬

ইউনিট ১ : মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে হিসাববিজ্ঞান

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের অবদান অপরিসীম। শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের যথাযথ লিপিবদ্ধকরণ ও আর্থিক ফলাফল নিরূপণ করে হিসাববিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে পেশা হিসেবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব দূরীকরণে অবদান রাখছে বিধায় বর্তমান আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের যুগে হিসাববিজ্ঞান অধ্যয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই ইউনিটের আলোচ্য বিষয়সমূহ হলো–

১.১ : হিসাববিজ্ঞানের ধারণা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

১.২ : হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা, মাধ্যমিক স্তরে হিসাববিজ্ঞান পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১.৩ : মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ও জবাবদিহিতা প্রক্রিয়ায় হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা

১.১ : হিসাববিজ্ঞানের ধারণা (Concept of Accounting)

"প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে 'আজিজে মিশর' তার রাজ্যে উৎপাদিত খাদ্য শস্যের মিতব্যয়ি ব্যবহার ও সঞ্চিত মজুদের সঠিক হিসাব রেখে গোটা জাতিকে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা করেন"। মানব সভ্যতায় বিনিময় প্রথার সূচনা হতে কালক্রমে বিনিময়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তা লিখে রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং মানুষ তখন থেকে নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতিতে হিসাব রাখা শুরু করে। কালের বিবর্তনে ব্যবসায় বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের ফলে অসংখ্য ও জটিল ব্যবসায়িক লেনদেনগুলোকে সুনির্ধারিত নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়। ১৪৯৪ সালে ইটালির ধর্মযাজক ও গণিত শাস্ত্রবিদ লুকা পেসিওলি (Luca pecioli) তার æSumma de arithmetica, geometria, proportione et proportionalite" নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম ব্যবসায়িক লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের সোনালী সূত্রের উল্লেখ করেন। যার উপর ভিত্তি করেই কারবারি লেনদেন লিপিবদ্ধকরণে পদ্ধতিগতভাবে হিসাববিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়। এরপর ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রভুত উন্নয়নের ফলে লেনদেনের ধরণ পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রয়োজন অনুযায়ী হিসাবরক্ষণের কলা কৌশলে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। হিসাববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ধারায় বর্তমান আধুনিক ও জটিল ব্যবসায় ও বাণিজ্যের যুগে কারবারের আর্থিক লেনদেনসমূহের হিসাবরক্ষণ,ফলাফল নিরূপণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন পূর্বক কারবারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করে ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় হিসাবজ্ঞিান সম্পর্কে নিম্নোক্ত ধারণা পোষণ করা হয়।

হিসাববিজ্ঞান একটি তথ্য ব্যবস্থা (Accounting is an Information System)

হিসাববিজ্ঞান কারবারের আর্থিক লেনদেনগুলোকে লিপিবদ্ধকরণ এবং তা থেকে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যকলাপের ফলাফল (লাভ বা ক্ষতি) ও ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার চিত্র (সম্পদ ও দায়ের অবস্থা) নিরূপণ করে এবং প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সহকারে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পক্ষের নিকট তথ্য আকারে উপস্থাপন করে। হিসাববিজ্ঞান তথ্যের ব্যবহারকারীগণ তাদের নিজ নিজ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে যেমন:

- মালিক ব্যবসায় চলমান রাখবেন না বন্ধ করবেন, না অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ করবেন;
- ব্যবস্থাপক ব্যবসায়ের মুনাফা অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে কী কী কৌশল গ্রহণ করবেন;
- ঋণদানকারীসংস্থা উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ঋণ ধারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করবে কি করবে না;
- কর্মী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার প্রেক্ষিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানে থেকে যাবে না অন্যত্র চলে যাবে;
- কর কর্তৃপক্ষ আর্থিক বা ব্যবসায়িক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত কর যথাযথ হয়েছে কি না ইত্যাদি।

যেহেতু একমাত্র হিসাববিজ্ঞান কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান আর্থিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যত আর্থিক পরিকল্পনা করে বিধায় হিসাববিজ্ঞানকে তথ্য ব্যবস্থা (Information System) নামে অভিহিত করা হয়।

হিসাববিজ্ঞান এক প্রকার ব্যবহারিক জ্ঞান (Accounting is a Practical Knowledge)

হিসাববিজ্ঞান কারবারের আর্থিক লেনদেনসমূহকে লিপিবদ্ধকরণ, শ্রেণিবদ্ধকরণ, সংক্ষেপন এবং চূড়ান্ত হিসাব বা আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার কৌশল শেখায়। মালিক কর্তৃক মূলধন বিনিয়োগ, প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সম্পদ সংগ্রহ,ব্যবসায়িক পণ্য বা সেবার ক্রয়-বিক্রয়, নগদ আদান ও প্রদান, বিভিন্ন ব্যবসায়িক ও অব্যবসায়িক ব্যয় বা খরচ পরিশোধকরণ ইত্যাদি কার্যকলাপগুলো হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধকরণ এবং তা থেকে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ফলে সারা বিশ্বে অবস্থিত হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের জ্ঞানসমৃদ্ধ হিসাবরক্ষকগণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণী সার্বজনীন ভাবে গৃহিত এবং বোধগম্য হয়। আবার হিসাববিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে তা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি বা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা প্রকাশ করে।

হিসাববিজ্ঞান ব্যবসায়ের ভাষা (Accounting is the Language of Business)

ভাষা যেমন মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে তেমনি হিসাববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের যে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে যা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যাবলীর প্রতিচ্ছবি বা দর্পণ যার মাধ্যমে ব্যবসার মনোভাব প্রকাশ পায়। যেমন প্রতিষ্ঠানটি আর্থিকভাবে সবল না রুগ্ন, সম্পদশালী না দায়গ্রস্থ, লাভজনক না অলাভজনক ইত্যাদি। এই জন্যে হিসাববিজ্ঞানকে ব্যবসায়ের ভাষা বলা হয়। প্রতিটিভাষার যেমন নিজস্ব ও পৃথক শব্দ ভান্ডার থাকে যা ঐ ভাষাভাষির মানুষ বুঝে থাকে এবং ভাষাকে জানতে বা বুঝতে হলে ভাষা চর্চার মাধ্যমেঐ ভাষার জ্ঞান অর্জন করতে হয় ঠিক তেমনি হিসাববিজ্ঞানেরও কিছু শব্দ আছে যেমন ডেবিট, ক্রেডিট ,সম্পদ, দায়, আয়, ব্যয়, মালিকানা স্বত্ব ইত্যাদি যাএকমাত্র হিসাববিজ্ঞানের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ বা হিসাববিজ্ঞানের জ্ঞানসমৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গ বুঝে থাকেন এবং অন্যান্য ভাষার মতইব্যবসায়ের ভাষা হিসেবে হিসাববিজ্ঞানের জ্ঞান দীর্ঘমেয়াদী অধ্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়।

হিসাববিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (Origin and Gradual Evolution of Accounting)

গতিশীল বিজ্ঞান হিসাবে হিসাববিজ্ঞানের ইতিহাস মানব সভ্যতার ইতিহাসের মতই প্রাচীন। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ একে অপরের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় মানুষের মধ্যে বিনিময় প্রথা সূচিত হয় এবং এই বিনিময়ের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত হারে বৃদ্ধির সাথে সাথে তা লিখে রাখার প্রয়োজন হয়। সৃষ্টির আদিকাল থেকে এখন পর্যন্ত পৃথিবীর যেখানেই সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছে এবং পণ্য উৎপাদন, বিনিময় ও বন্টন ব্যবস্থা চালু হয়েছে সেখানেই নিজস্ব ধারায় ও বাস্তব প্রয়োগের সুবিধার প্রেক্ষিতেহিসাব লিখন ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে। হিসাববিজ্ঞানের উৎপত্তির ইতিহাস সঠিক ভাবে নির্ণয় করতে না পারলেও প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্ব হতেই হিসাব লিখন প্রচলন ছিল(৩)। প্রাচীন রোম, চীন, ব্যবলনীয়, ভারতীয় ও মিশরীয় সভ্যতায় হিসাবের প্রচলন লক্ষ করা যায়। হিসাববিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশকে নিম্নোক্ত চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. আদি যুগ বা উম্মেষ পর্ব (১৪৯৪ সাল পর্যন্ত) Development Period (pre -1494)
২. প্রাক বিশ্লেষণ পর্ব(১৪৯৪-১৮০০ সাল) Pre-Explanatory (1494-1800)
৩. বিশ্লেষণ পর্ব (১৮০০-১৯৫০ সাল) Explanatory Period (1800-1950)
৪. আধুনিক পর্ব (১৯৫০ সালের পরবর্তী) Modern Age (post 1950)

আদি যুগ বা উন্মেষ পর্ব (Development Period)

সভ্যতার শুরু হতে ১৪৯৪ সাল পর্যন্ত সময়কালকে আদি যুগ বা উন্মেষ পর্বে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এ সময়ের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি ও ধরণের উপর ভিত্তি করে এ যুগকে আবার নিম্নোক্ত চার ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রস্তর যুগ (Stone Age)

প্রস্তর যুগে মানুষ বনে জঙ্গলে ও পাহাড়ের গুহায় বসবাস করত। এসময় তারা বনের ফলমূল খেয়ে ও পশু পাখি শিকার করে জীবন ধারণ করত এবং উদ্বৃত্ত খাবার গুহায় সংরক্ষণ করত। তারা গুহার গায়ে অথবা পাথরের গায়ে দাগ কেটে বা ছবি এঁকে সঞ্চিত ফলমূল এবং শিকারের সংখ্যারহিসাব রাখত। মূলত এই গণনা থেকেই হিসাবের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়।

প্রাচীন যুগ (Ancient Age)

এই যুগে মানুষ ধীরেধীরে গুহা ছেড়ে সমভূমিতে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস আরম্ভ করে। সমাজ বিকাশের সাথে সাথে সামাজিক কর্মকান্ডে বিবর্তন আসে এবং চাষাবাদও বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড শুরু হয়। এই যুগে মানুষ ঘরের দেয়ালে দাগকেটে, রশিতে গিট দিয়ে তাদের উৎপাদিত ফসল ও পশু পাখির হিসাব সংরক্ষণ করত।

বিনিময় যুগ (Exchange Age)

সামাজিক বিবর্তন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পরিধি বৃদ্ধিও ফলে মানুষ এই যুগে জীবিকা অর্জনের জন্য বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করে। ফলে পেশাভিত্তিক জীবিকার সূচনা হয়। যেমন- কৃষক, জেলে, তাঁতী, কারিগর ও শিকারী ইত্যাদি। কৃষকের প্রয়োজন মাছ ও মাংসের, শিকারীর প্রয়োজন শস্যের ফলে মানুষ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং শুরু হয় বিনিময় প্রথা। এভাবে বিনিময়ের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে হিসাবরক্ষণপদ্ধতির অগ্রগতি সাধিত হয়। এসময় মানুষ মাটির দেয়ালে রঙ দিয়ে অথবা কাঠ খোদাই করে বিনিময়ের হিসাব সংরক্ষণ করে।

মুদ্রা যুগ (Money Age)

বিনিময় প্রথায় পণ্য বিনিময়ের অসুবিধা দূর করার জন্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মূদ্রা প্রচলন শুরু হয়।এর ফলে পেশাগত বণিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। ক্রমে ক্রমে বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় শুরু হয় এবং দেনা পাওনার হিসাবরক্ষণ শুরু হয়। এসময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানুষ নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণ করে যা ছিল অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যাকে বর্তমানে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি বলাহয়।

১. প্রাক-বিশ্লেষণ পর্ব (Pre- Explanatory Period)

১৪৯৪ সাল হতে ১৮০০ সাল পর্যন্ত সময় কালকে প্রাক-বিশ্লেষণ কাল ধরা হয়। চতুর্দশ শতাব্দির প্রথম দিকে ইটালির জেনোয়া বন্দরকে ঘিরে ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ফলে জটিল লেনদেনসমূহের যথাযথ নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী হিসাবরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অবশেষে ১৪৯৪ সালে ইটালির ধর্মযাজক ও গণিত শাস্ত্রবিদ লুকা পেসিওলি (Luca Pacioli) তার "Summa de arithmetica, geometria, proportionie et proportionalite" নামক যুগান্তকারী গ্রন্থে সর্বপ্রথম ব্যবসায়িক লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে, লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের সোনালী সূত্রের উল্লেখ করেন। যার উপর ভিত্তি করে হিসাবরক্ষণের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হিসেবে হিসাববিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়।

২. বিশ্লেষণ পর্ব (Explanatory Period)

১৮০০ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সময় কালকে বিশ্লেষণ পর্ব ধরা হয়। এই সময়ে বৃহদায়তন উৎপাদন, উৎপাদন ব্যবস্থা কারখানায় স্থানান্তর, যৌথ মূলধনী কারবারের আবির্ভাব, মালিকানা থেকে ব্যবস্থাপনা পৃথকীকরণ, মালিক শ্রমিক সম্পর্কে জটিলতা, প্রতিযোগিতা, সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও অধিক মুনাফা অর্জনের আকাঙ্খা ইত্যাদি কারণে হিসাব ব্যবস্থায় নতুন নতুন সমস্যা দেখাদেয় এবং নানা জটিলতার উদ্ভব হয়। ফলে এসব সমস্যা সমাধানের জন্য হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা শুরু হয় এবং নতুন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার হয়। মূলত আধুনিক হিসাববিজ্ঞানের যাত্রা এখান থেকেই শুরু হয়।

৩. আধুনিক পর্ব (Modern Age)

বিংশ শতাব্দীতে মানব সভ্যতার ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে হিসাববিজ্ঞানের আওতা ও কার্যকলাপ সম্প্রসারিত হয়।যুগের চাহিদা অনুযায়ী হিসাববিজ্ঞান বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়। যেমন: আর্থিক হিসাববিজ্ঞান, উৎপাদনব্যয় হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান, আয়কর নির্ধারণ হিসাব, নিরীক্ষা হিসাববিদ্যা, সামাজিক হিসাব ও বাজেট সংক্রান্ত হিসাবের সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিককালে কম্পিউটার আবিস্কারের ফলে কম্পিউটার চালিত Accounting Software এর মাধ্যমে পরিচালিত হিসাব ব্যবস্থা অনেক সহজ ও সময় সাশ্রয়ী হয়েছে এবং হিসাববিজ্ঞানকে তথ্য ব্যবস্থা(Information System) নামে অভিহিত করা হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, হিসাববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্রমবিকাশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতেই থাকবে।হিসাববিজ্ঞান পদ্ধতিকে যুগ উপযোগী করার লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন পন্ডিত ব্যক্তিগণ,বিভিন্ন সংস্থা ও গবেষকগণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা ও প্রয়োগ পদ্ধতিগুলোর সার্বজনীনতা আনয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে যুক্তরাজ্যে International Accounting Standards Committee(IASC) নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশও এর সদস্য। এই সংস্থা হিসাববিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ করে এর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে।

১.২ : হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা, মাধ্যমিক স্তরে হিসাববিজ্ঞানের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা (Objects and Importance of Accounting)

প্রত্যেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসাবকাল শেষে তার কারবারের আর্থিক ফলাফল যেমন জানতে চায়, তেমনি প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত বিভিন্ন পক্ষও তাদের স্বার্থ সম্পর্কে জানতে চায়।তথ্যব্যবস্থা হিসেবে হিসাববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য হল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও এরসাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে তাদের প্রয়োজনীয় ও প্রাসংগিক তথ্য সরবরাহ করে তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা।যেমন- আর্থিক হিসাববিজ্ঞন(Financial Accounting) এর কাজ হল কারবারের আর্থিক কার্যকলাপের ফলাফল ও অবস্থা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা। ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান (Management Accounting) এর কাজ হল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ব্যবসায় পরিচালনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযোগী তথ্য সরবরাহ করা। অপরদিকে উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান(Cost Accounting) এর কাজ হল পণ্য উৎপাদন ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে আর্থিক ও ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান উভয়কে সহায়তা করা। ব্যবসায় পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, বর্তমান ও ভবিষ্যত বিনিয়োগকারী, ঋণদানকারী কর্তৃপক্ষ, পাওনাদার, কর্মচারী ও শ্রমিকসংঘ, ব্যাংক, সরকার, কর কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি পক্ষসমূহ বর্তমান অবস্থার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চায়।আর হিসাববিজ্ঞানের মাধ্যমেই এসব উদ্দেশ্য সাধিত হয়। যেগুলো হিসাববিজ্ঞানের গুরুত্ব হিসাবে চিহ্নিত হয়। হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সমূহকে মৌলিক উদ্দেশ্য ও সহায়ক উদ্দেশ্য এই দু'ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়।

(ক) মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহ : নিম্নেহিসাববিজ্ঞানের মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করা হল।

স্থায়ী হিসাব সংরক্ষণ

হিসাববিজ্ঞানের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হল- প্রতিষ্ঠানেরআর্থিক লেনদেনগুলোকে স্থায়ীভাবে হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ করা। যাতে যেকোন লেনদেনের তথ্য ও উপাত্ত যেকোন সময় অতি সহজে খুঁজে পাওয়া যায়। জাবেদা ও খতিয়ানের মাধ্যমে লেনদেন স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।

আর্থিক ফলাফল নিরূপণ

একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যকলাপের ফলাফল নিরূপণ করা হিসাবজ্ঞিানের অন্যতম উদ্দেশ্য। এইজন্য একটি হিসাবকালের মধ্যে সংঘটিত আয় ও ব্যয় জাতীয় হিসাবের জেরগুলো নিয়ে বিশদ-আয় বিবরণী প্রস্তুত করে যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান তার আর্থিক কার্যকলাপের ফলাফল(লাভ ক্ষতি) জানতে পারে।

আর্থিক চিত্র উপস্থাপন

ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা বা ব্যবসায়ের সম্পদ, দায় ও মালিকানাস্বত্বের পরিমাণগত অবস্থা নিরূপণ করা হিসাববিজ্ঞানের আরেকটি উদ্দেশ্য। এইজন্য একটি হিসাবকালের শেষ তারিখে সম্পদ ও দায়জাতীয় হিসাবগুলোর জের এবং মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ নির্ণয় পূর্বক যে আর্থিক অবস্থার বিরণী প্রস্তুত করে যার মাধ্যমে ব্যবসায়ের প্রকৃত আর্থিক চিত্র প্রকাশিত হয় এবং এই আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষ ভবিষ্যৎ বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা

হিসাববিজ্ঞান হিসাব তথ্যসমূহকে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপকগণের চাহিদা অনুযায়ী এমনভাবে উপস্থাপন করে যা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ, মূল্য নির্ধারণ, ফলাফল মূল্যায়ন, ব্যবসায়ের ঝুকি বিশ্লেষণ ও অন্যান্য আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

(খ)সহায়ক উদ্দেশ্যসমূহ : হিসাববিজ্ঞানমৌলিক উদ্দেশ্যের পাশাপাশি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যেগুলো সহায়ক উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।সহায়ক উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরুপ-

ব্যয় নিয়ন্ত্রণ

প্রতিষ্ঠানেরকাঙক্ষিত ফলাফল অর্জনে আয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যয়(নিয়ন্ত্রণ) করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যথাযথ ব্যয় হিসাবরক্ষণের মাধ্যমে ব্যয় নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা হিসাববিজ্ঞানের একটি সহায়ক উদ্দেশ্য।

জাল ও জুয়াচুরি রোধ

হিসাববিজ্ঞানলেনদেন সনাক্তকরণ এবং লেনদেনের স্বপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণাদি সংরক্ষণ সাপেক্ষে লেনদেনগুলোকে হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ করে জাল,জুয়াচুরি ও প্রতারণা রোধে সহায়তা করে যা ব্যবসায়িক ফলাফল অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা হিসাববিজ্ঞানের আরেকটি উদ্দেশ্য।

সঠিক দেনা-পাওনার তথ্য প্রদান

ব্যবসায়ের আর্থিক কার্যক্রম সুনামের সহিত মসৃণভাবে পরিচালনার জন্য দরকার সঠিক দেনা পাওনা সংক্রান্ত তথ্য। হিসাববিজ্ঞান সঠিক ভাবে দেনা পাওনার হিসাব রেখে কখন কাকে কি পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে আবার কোন দেনাদারের নিকট থেকে কি পরিমাণ আদায় হবে ইত্যাদি তথ্য প্রদান করা হিসাববিজ্ঞানের আরেকটি সহায়ক উদ্দেশ্য।

নগদান বহি সংরক্ষণ

নগদান বহি সংরক্ষণের মাধ্যমে নগদ আদান প্রদান সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করে নগদ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রদান করা হিসাববিজ্ঞানের আরেকটি সহায়ক উদ্দেশ্য।

কর নির্ধারণে সহায়তা

সরকারের রাজস্ব আয়ের অন্যতম উৎস কর ও ভ্যাট। হিসাববিজ্ঞান বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের লেনদেন যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করে আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করে কর নির্ধারণ ও ভ্যাট চলতি হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রদেয় ভ্যাট নির্ণয় করা হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

আইনগত চাহিদাপূরণ

আধুনিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। যেমন কোম্পানি আইন, অংশীদারী আইন, শুল্ক আইন, কর অধ্যাদেশ শিল্প আইন, সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ এ্যাক্ট ইত্যাদি। এ সমস্ত আইনের বিধি বিধান অনুযায়ী হিসাবরক্ষণ ও উপস্থাপন হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সর্বসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের চাহিদা পূরণে বৈচিত্রময় উদ্দেশ্যের জন্যই হিসাববিজ্ঞানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

মাধ্যমিক স্তরে হিসাববিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের অবদান অপরিসীম। শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী শিল্প, বাণিজ্য ওসেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের শাখাসমূহের সমন্বিতব্যবস্থাকে ব্যবসায় শিক্ষা বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ শাখায় শিক্ষা যথার্থভাবে আয়ত্তকরতে পারলে চাকরি এবং চাকরির বিকল্প হিসেবে ব্যবসায়কে আত্মকর্মসংস্থান-ভিত্তিক জীবিকার উপায়হিসেবে গ্রহণ করা যায়। হিসাববিজ্ঞান হল ব্যবসায় শিক্ষা জ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা। মাধ্যমিক স্তরে হিসাববিজ্ঞান শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ।

- হিসাববিজ্ঞান সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করা।
- ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করা।
- শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে ঝরে পড়লে অর্জিত শিক্ষা দ্বারা আত্মকর্মসংস্থানের পথ সুগম করা।
- হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত ডিগ্রি অর্জনের পথ সুগম করা ইত্যাদি।

১.৩ : মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ও জবাবদিহিতা প্রক্রিয়ায় হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা (Role of Accounting in Developing Values and Accountability)

মূল্যবোধ হল মানুষের আচার আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসের মানদন্ড যা শিক্ষালব্দ জ্ঞান ও অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষের মনে ধীরে ধীরে তৈরী হয় যা তার আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান হল মূল্যবোধ। একটি সুন্দর সুশৃংখল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে মানুষের মনে মূল্যবোধের উপস্থিতি অপরিহার্য। মূল্যবোধের অবক্ষয়ে সমাজে দেখাদেয় নানা অনিয়ম, দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা।ব্যবসায়িক মূল্যবোধ বলতে মূলত ব্যবসায়িক কর্মকান্ড এমনভাবে পরিচালনাকে বুঝায় যার মাধ্যমে সমাজে সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধিত হয়। হিসাববিজ্ঞানের রীতি-নীতি ও কলাকৌশল যথার্থভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের মানবিক অনুভূতি, সততা, নিয়মানুবর্তিতা, দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতা সৃষ্টি করে মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে হিসাববিজ্ঞান তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক. মূল্যবোধ সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা

নৈতিক চরিত্র গঠন

হিসাববিজ্ঞানের রীতি নীতি অনুশীলন ও প্রয়োগের মাধ্যমে হিসাবরক্ষণে স্বচ্ছতা আসে ও হিসাব সচেতনতা তৈরী হয় । হিসাব সচেতনতা মানুষকে নিয়মানুবর্তিতা, নিষ্ঠা ও রক্ষণশীলতার শিক্ষা দেয় ।ফলে এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নৈতিক চরিত্র গঠিত হয় এবং মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

সঞ্চয়ী ও মিতব্যয়িতা অর্জন

সঞ্চয়ী ও মিতব্যয়িতা মূল্যবোধের উপাদান। হিসাববিজ্ঞানের কলাকৌশল অনুযায়ী সঠিকভাবে হিসাবরক্ষণের ফলে ব্যয় পরিমিত হয় ফলে লাভ বেশী হলে সঞ্চয় করতে পারে এবং লাভ কম হলে মিতব্যয়িতা অর্জন করতে পারে।

ধর্মীয় অনুশীলন

ধর্মীয় অনুশীলন অনুযায়ী সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের হিসাব রাখা মানুষের কর্তব্য। হিসাববিজ্ঞান অর্থনৈতিক লেনদেনের যথাযথ ভাবে হিসাবরক্ষণ করে ধর্মীয় অনুশীলন মেনে চলার মাধ্যমে মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

ঋণ পরিশোধে সচেতনতা

মূল্যবোধের অবক্ষয় ঋণখেলাপী প্রবণতা জন্ম দেয় যা রাষ্ট্রের অর্থনীতির উপর বিরুপ প্রভাব ফেলে। হিসাববিজ্ঞান সঠিকভাবে ঋণ হিসাব সংরক্ষণ করে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সময়মত ঋণ পরিশোধে সচেতন করে।

জালিয়াতি ও প্রতারণা থেকে নিবৃত করে

হিসাববিজ্ঞান কারবারের আর্থিক লেনদেনগুলি দালিলিক প্রমাণাদিসহ হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ করে এবং হিসাবকাল শেষে হিসাবরক্ষকগণ কর্তৃক রক্ষিত হিসাবের শুদ্ধতা যাচাইয়েরজন্য তৃতীয় পক্ষ বা পেশাদার নিরীক্ষক দ্বারা হিসাব নিরীক্ষণ করে। এর ফলে হিসাবরক্ষণের সাথে জড়িত ব্যক্তি হিসাবরক্ষণে জালিয়াতিও প্রতারণা করলে তা উদঘাটনের ভয়ে নিজেকে জালিয়াতি ও প্রতারণা হইতে নিবৃত করে এবং তা ব্যক্তিক আচরণে প্রভাব ফেলে এবং মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

খ. জবাবদিহিতা সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞনের ভূমিকা

নিজের কাজের জন্য তৃতীয় পক্ষের নিকট ব্যাখ্যা প্রদানের যে দায়বদ্ধতা থাকে তাকে জবাবদিহিতা বলে। প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনে জবাবদিহিতার ভূমিকা অনেক। প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতা চর্চা নিশ্চিত করতে পারলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে নৈতিক চরিত্র গঠিত হয় এবং তারা প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যকে নিজ নিজ লক্ষ্য মনে করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ফলে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জিত হয়। জবাবদিহিতা সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা নিম্নরূপ-

দায়িত্ববোধ সৃষ্টি

হিসাববিজ্ঞানে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তাদের সম্পাদিত কার্যাবলির জন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট জবাবদিহি করতে হয়। ফলে কোন রকম অসদুপায়ের আশ্রয় নিলে তা উন্মোচন বা প্রকাশ হওয়ার ভয়ে প্রত্যেক কর্মচারী সততা, নিয়মানুবর্তিতা ও দায়িত্বশীলতার সংগে কার্য সম্পাদন করে যা তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে। এভাবে হিসাববিজ্ঞানে জবাবদিহিতা নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।

আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন

আর্থিক বিবরণী প্রণয়নের মাধ্যমে হিসাবরক্ষক ও ব্যবস্থাপনায় জড়িত ব্যক্তিদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়।

সরকারের নিকট জবাবদিহিতা

নির্ধারিত নিয়ম নীতি অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে কিনা এবং যথাযথ ভাবে শুল্ক, ভ্যাট ও কর পরিশোধ হচ্ছে কি না তা দেখার অধিকার সরকারের সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের রয়েছে। যথাযথ হিসাবরক্ষণের মাধ্যমে এই জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, হিসাববিজ্ঞান ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রায় প্রতিটিক্ষেত্রে জড়িত ব্যক্তিবর্গের মূল্যবোধ ও জবাবদিহিতা সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. হিসাববিজ্ঞানের জনক বলা হয় কাকে?
২. লুকা প্যাসিওলি কর্তৃক প্রণীত গ্রন্থের নাম কি?
৩. ব্যবসায়ের ভাষা বলা হয় কাকে?
৪. IASC কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
৫. কোন সময়কে হিসাববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশে প্রাক-বিশ্লেষণ পর্ব ধরা হয়?
৬. লুকা প্যাসিওলিকে কেন হিসাববিজ্ঞানের জনক বলা হয়?
৭. হিসাববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে কয় ভাগে ভাগ করা হয় এবং কি কি?
৮. হিসাববিজ্ঞান বলতে কি বুঝায়?
৯. হিসাববিজ্ঞান পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো কী ?
১০. হিসাববিজ্ঞানকে ‘‘তথ্য ব্যবস্থা” বলা হয় কেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. হিসাববিজ্ঞানের আধুনিক ধারণা বর্ণনা করুন।
২. হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।
৩. হিসাববিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
৪. “হিসাববিজ্ঞান ব্যবসায়ের ভাষা” ব্যাখ্যা করুন।
৫. মূল্যবোধ সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা আলোচনা করুন।

ইউনিট ২ : মাধ্যমিক পর্যায়ে ৯ম-১০ম শ্রেণির হিসাববিজ্ঞান

Teaching-Learning ব্যবস্থায় সর্বাধিক সাধারণ ও বহুল ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণ হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। বিশ্বের প্রায় সব দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যপুস্তকের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বের সকল দেশে বিশেষ কিছু নীতিমালা অনুসরণ করে পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয়। আর এ পাঠ্যপুস্তক রচনায় অনুসরণ করা হয় একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি। অন্যভাবে বলা যায় "A Textbook is a book designed for classroom use, carefully prepared by experts in the field and equipped with the usual teaching devices."কোন নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডে/রাষ্ট্রে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের সুস্থ, সামাজিক, মানসিক ও শারীরিক বিকাশের উপযোগী এবং শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক বয়সানুক্রমিক ও শ্রেণিভিত্তিক পাঠ্যবইসমূহই পাঠ্যপুস্তক (Textbook)।

এই ইউনিটের আলোচ্য বিষয়সমূহ হলো–

২.১ : উত্তম পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়

২.২ : পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন ও হিসাববিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন

২.৩ : শিক্ষক নির্দেশিকা

২.৪ : শিক্ষক প্রশিক্ষণ

২.১ : উত্তম পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়

পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য

পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হলো।

- **পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুগত বৈশিষ্ট্য**
    - শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও শিখনফলের আলোকে বিষয়বস্তু প্রণয়ন করতে হবে।
    - পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে পাঠ্যসূচি যথাযথভাবে পালন করতে হবে।
    - পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু অবশ্যই সর্বাধুনিক হতে হবে।
    - পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আগ্রহ পূরণে সমর্থ হবে।
    - পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে তত্ত্ব ও তথ্যগত কোন ভুল থাকবে না।
    - পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু অবশ্যই মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।
    - পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে কোন রকম দ্বিধা বা সংশয় থাকবে না।
- **পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর বিন্যাসগত বৈশিষ্ট্য**
    - পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু বিন্যাসের নীতিমালা ও পদ্ধতি অনুসরণ করে বিষয়বস্তুর বিন্যাস করতে হবে।
    - শিক্ষাদানের দার্শনিক , সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি অনুসরণ করে বিষয়বস্তু সাজাতে হবে।
    - বিষয়বস্তুর প্রসার ও মাত্রাগত পার্থক্য দুর করতে হবে।
    - শ্রেণিভিত্তিক ধারাবাহিকতা ও অনুবন্ধ ঠিক রেখে বিষয়বস্তুর বিন্যাস করতে হবে।
    - বিভিন্ন অধ্যায়ের অনুচ্ছেদগুলো রচনায় যৌক্তিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিষয়বস্তুর বিন্যাস করতে হবে।
- **পাঠ্যপুস্তকের উপস্থাপনাগত বৈশিষ্ট্য**
    - শিখনের নীতি ও তত্ত্ব অনুসরণ করে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হবে।
    - পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে।
    - পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে প্রয়োজনীয় ছবি , চিত্র ও চার্ট সংযোজন করতে হবে।
    - পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে শব্দ সম্ভার , বাক্য কাঠামো ও রচনা শৈলী শিক্ষার্থী উপযোগী হবে।
    - পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু প্রমিত চলিত রীতিতে প্রণয়ন ও উপস্থাপন করতে হবে।

- **পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যাগত বৈশিষ্ট্য**
    - জটিল বিষয়কে সহজবোধ্য করে উপস্থাপনের জন্য উপযুক্ত উপমা এবং যথাযথ উদাহরণের অবতারণা করতে হবে।
    - পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যায় দৈনন্দিন জীবন থেকে উদাহরণ দিতে হবে।
    - বিতর্কিত বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সতর্কতা ও নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে হবে।
    - পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর পরিধি বড় হলে সমগ্র বিষয়কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে ব্যাখ্যা করতে হবে।
- **পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনী সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য**
    - পাঠ্যপুস্তকের প্রত্যেক অধ্যায় শেষে পর্যাপ্ত অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
    - পাঠ্যপুস্তকে লিখিত ও মৌখিক উভয় ধরনের অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
    - বিভিন্ন মেধার শিক্ষার্থীদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায় , এরকম অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
    - পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনে নৈর্ব্যক্তিক, রচনামূলক, সৃজনশীল ও ডোমেইনভিত্তিক অভীক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
    - নৈর্ব্যক্তিক অংশে সঠিক উত্তর নির্বাচন, শূন্যস্থান পূরণ ও মিলকরণ জাতীয় প্রশ্ন থাকবে।
    - মূল্যায়নে বিভিন্ন দিক/ এলাকা থেকে সমহারে প্রশ্ন নির্বাচন করতে হবে।
- **পাঠ্যপুস্তকের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য**
    - পাঠ্যপুস্তকের আকার ও আয়তন শ্রেণি উপযোগী হতে হবে।
    - পাঠ্যপুস্তকের কভার ও ডিজাইন আকর্ষণীয় হতে হবে।
    - পাঠ্যপুস্তকের বাঁধাই টেকসই হতে হবে।
    - পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ স্পষ্ট হতে হবে।
    - পাঠ্যপুস্তকের ছাপার আকার যথাযথ হতে হবে।
    - পাঠ্যপুস্তকের কাগজ উন্নতমানের হতে হবে।
    - পাঠ্যপুস্তকের দাম অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত হতে হবে।
- **পাঠ্যপুস্তকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য**
    - পাঠ্যপুস্তক সংশ্লিষ্ট বিষয় বিশেষজ্ঞ কর্তৃক রচিত হতে হবে।
    - পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করার কোন সুযোগ থাকবে না।
    - পাঠ্যপুস্তকটি অবশ্যই দেশীয় প্রেক্ষাপটে রচিত হতে হবে।

পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব

১। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যেই পাঠদান করে থাকেন।

২। শিক্ষার্থীরা বাড়িতে নিজে নিজে পাঠ্যপুস্তক পড়ে জ্ঞান লাভ করেন এবং শিক্ষক প্রদত্ত বাড়ির কাজ তৈরি করেন।

৩। পিতা-মাতা পাঠ্যপুস্তক দেখে ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ায় সাহায্য করেন।

৪। পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করে পরীক্ষক শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার মূল্যায়ন করেন।

৫। শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ পাঠ্যপুস্তক নিয়ে নানারকম গবেষণা করেন। তাঁদের চিন্তা-ভাবনা ও বক্তব্যকেশিক্ষার্থীদের সন্মুখে তুলে ধরার প্রকৃত মাধ্যমই হল পাঠ্যপুস্তক।

২.২ : পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন, হিসাববিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন

পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন

সাধারণ অর্থে মূল্যায়ন হল পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কোন একটি বস্তু বা গূণ এর মূল্যমান বিচার করার প্রক্রিয়া। মূল্যায়নের দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাহলো পরিমাপ এবং মূল্যমান বিচার। আর পরিমাপ সব সময় কোন না কোন মানদন্ডের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন হল শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর আলোকে শিক্ষার মুদ্রিত উপকরণ হিসেবে একটি পাঠ্যপুস্তকের মূল্যমান বিচারকরণ। যখন একটি আদর্শ পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্যের আলোকে কোন একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের মূল্যমান ও উপযুক্ততা বিচার করে ঐ পুস্তকটির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা হয় তখন তাকে পাঠ্যপুস্তকের মূল্যায়ন বলা হয়।

পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়নের উদ্দেশ্য

ক) পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন

- উত্তম পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করা।
- ভাল পাঠ্যপুস্তক বাছাই করার জন্য মূল্যায়ন করা।

খ) পাঠ্যপুস্তকের উন্নতি বিধান

- পাঠ্যপুস্তকের উন্নতি বিধানে সহায়তা করা।
- উন্নত মানের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের পূর্ব শর্ত হল পাঠ্যপুস্তকের ক্রমাগত পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন।
- পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজ একটি গতিশীল প্রক্রিয়া।
- পাঠ্যপুস্তকের সবল ও দুর্বল দিক নির্বাচন করা।
- পাঠ্যপুস্তকের দুর্বল দিকসমূহ পরিমার্জন ও সংশোধন করে উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন।
- পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন শিক্ষাক্রম গবেষণার একটি ক্ষেত্র।

পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্যসমূহ

পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন একটি কঠিন ও জটিল কাজ। যেন তেন ভাবে একটি পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন করা যায় না। তাই পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়নের জন্য কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করা হয়। নিম্নে পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়নের নির্ণায়ক/ বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হল।

- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুগত বৈশিষ্ট্য
- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর বিন্যাসগত বৈশিষ্ট্য
- পাঠ্যপুস্তকের উপস্থাপনাগত বৈশিষ্ট্য
- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যাগত বৈশিষ্ট্য
- পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনী সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য
- পাঠ্যপুস্তকের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য
- পাঠ্যপুস্তকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুগত বৈশিষ্ট্য

- শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও শিখনফলের আলোকে বিষয়বস্তু প্রণয়ন করতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে পাঠ্যসূচি যথাযথভাবে পালন করতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু অবশ্যই সর্বাধুনিক হতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আগ্রহ পূরণে সমর্থ হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে তত্ত্ব ও তথ্যগত কোন ভুল থাকবে না।
- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু অবশ্যই মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে কোন রকম দ্বিধা বা সংশয় থাকবে না।

পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর বিন্যাসগত বৈশিষ্ট্য

- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু বিন্যাসের নীতিমালা ও পদ্ধতি অনুসরণ করে বিষয়বস্তুর বিন্যাস করতে হবে।
- শিক্ষাদানের দার্শনিক , সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি অনুসরণ করে বিষয়বস্তু সাজাতে হবে।
- বিষয়বস্তুর প্রসার ও মাত্রাগত পার্থক্য দূর করতে হবে।
- শ্রেণিভিত্তিক ধারাবাহিকতা ও অনুবন্ধ ঠিক রেখে বিষয়বস্তুর বিন্যাস করতে হবে।
- বিভিন্ন অধ্যায়ের অনুচ্ছেদগুলো রচনায় যৌক্তিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিষয়বস্তুর বিন্যাস করতে হবে।

পাঠ্যপুস্তকের উপস্থাপনাগত বৈশিষ্ট্য

- শিখনের নীতি ও তত্ত্ব অনুসরণ করে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে প্রয়োজনীয় ছবি , চিত্র ও চার্ট সংযোজন করতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে শব্দ সম্ভার , বাক্য কাঠামো ও রচনা শৈলী শিক্ষার্থী উপযোগী হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু প্রমিত চলিত রীতিতে প্রণয়ন ও উপস্থাপন করতে হবে।

পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যাগত বৈশিষ্ট্য

- জটিল বিষয়কে সহজবোধ্য করে উপস্থাপনের জন্য উপযুক্ত উপমা এবং যথাযথ উদাহরণের অবতারণা করতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যায় দৈনন্দিন জীবন থেকে উদাহরণ দিতে হবে।
- বিতর্কিত বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সতর্কতা ও নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর পরিধি বড় হলে সমগ্র বিষয়কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে ব্যাখ্যা করতে হবে।

পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনী সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য

- পাঠ্যপুস্তকের প্রত্যেক অধ্যায় শেষে পর্যাপ্ত অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকে লিখিত ও মৌখিক উভয় ধরনের অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- বিভিন্ন মেধার শিক্ষার্থীদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায় , এরকম অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনীতে নৈর্ব্যক্তিক , রচনামূলক , সৃজনশীল ও ডোমেইনভিত্তিক অভীক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- নৈর্ব্যক্তিক অংশে সঠিক উত্তর নির্বাচন , শূন্যস্থান পূরণ , সত্য-মিথ্যা নির্ণয় ও মিলকরণ জাতীয় প্রশ্ন থাকবে।
- মূল্যায়নে বিভিন্ন দিক/ এলাকা থেকে সমহারে প্রশ্ন নির্বাচন করতে হবে।

পাঠ্যপুস্তকের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য

- পাঠ্যপুস্তকের আকার ও আয়তন শ্রেণি উপযোগী হতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের কভার ও ডিজাইন আকর্ষণীয় হতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের বাধাঁই টেকসই হতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ স্পষ্ট হতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের ছাপার আকার যথাযথ হতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের কাগজ উন্নতমানের হতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের দাম অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত হতে হবে।

পাঠ্যপুস্তকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

- পাঠ্যপুস্তক সংশ্লিষ্ট বিষয় বিশেষজ্ঞ কর্তৃক রচিত হতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকে মুখস্থ করার কোন সুযোগ থাকবে না।
- পাঠ্যপুস্তকটি অবশ্যই দেশীয় প্রেক্ষাপটে রচিত হতে হবে।

একটি পাঠ্যপুস্তক উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে যথাযথভাবে তুলনা করণের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকের গুণগতমান পরিমাপ করাই হল পাঠ্যপুস্তকের মূল্যায়ন। গুণগতমান ভাল হলে পাঠ্যপুস্তকটি নির্বাচন করা যাবে অন্যথায় পাঠ্যপুস্তকের উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

হিসাববিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন

পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকটি যাচাই করে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া গেল–

বৈশিষ্ট্য	মন্তব্য
ক) পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুগত বৈশিষ্ট্য	১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭।
খ) পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর বিন্যাসগত বৈশিষ্ট্য	১। ২। ৩। ৪। ৫।
গ) পাঠ্যপুস্তকের উপস্থাপনাগত বৈশিষ্ট্য	১। ২। ৩। ৪। ৫।
ঘ) পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যাগত বৈশিষ্ট্য	১। ২। ৩। ৪।

ঙ) পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনী সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য	১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬।
চ) পাঠ্যপুস্তকের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য	১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭।
ছ) পাঠ্যপুস্তকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য	১। ২। ৩।

২.৩ : শিক্ষক নির্দেশিকা

শিক্ষক নির্দেশিকার ধারণা

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া বিজ্ঞানভিত্তিক ও পদ্ধতিগত। এই শিখন-শেখানো কাজে শিক্ষক নির্দেশনামূলক যে উপকরণ ব্যবহার করেন সাধারণভাবে তাই হচ্ছে শিক্ষক নির্দেশিকা। উন্নত দেশসমূহে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষক নির্দেশিকার ব্যবহার ব্যাপক। আমাদের দেশেও এর প্রচলন শুরু হয়েছে। NCTB (National Curriculum & Textbook Board) অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি শিক্ষক নির্দেশিকা হিসেবে শিক্ষক শিক্ষাক্রম গাইড (TCG) তৈরি করেন। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষক নির্দেশনা দান করেন আর শিক্ষার্থী আপন প্রচেষ্টায় শিক্ষকের নির্দেশনায় শিখতে সক্ষম হন। আর যে লিখিত সামগ্রীর মাধ্যমে শিক্ষক সহায়তা দান করবেন তাই শিক্ষক নির্দেশিকা। শিক্ষক কোন বয়সের শিক্ষার্থীকে কোন বিষয়ের কোন অংশ কোন প্রক্রিয়ায় পড়াবেন এসব কিছুর সুষ্ঠু নির্দেশনা থাকে শিক্ষক নির্দেশিকায়।অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সার্বিক জ্ঞান অর্জন তথা শিখনফল অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া তথা পদ্ধতি, কৌশল, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য শিক্ষকের জন্য পদ্ধতিগতভাবে প্রণীত নির্দেশনামূলক লিখিত সামগ্রী হচ্ছে শিক্ষক নির্দেশিকা।

শিক্ষক নির্দেশিকা শিক্ষকদের জন্য একটি সার্বক্ষণিক সহায়ক শিখনসামগ্রী। এটি তাঁদের শিক্ষণ কার্যক্রমকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করবে। শিক্ষাক্রম বুঝতে এবং তা বাস্তবায়নে , পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে এ নির্দেশিকা ব্যবহৃত হবে। শিক্ষাক্রম শুধু কী বিষয়বস্তু শিক্ষা দেওয়া হবে তাই ঠিক করে না , বরং শিখনফল কী হবে , কীভাবে পাঠ উপস্থাপন করা হবে এবং শিক্ষার্থীর শিখন-অর্জন কীভাবে যাচাই করা হবে ইত্যাদি বিষয় শিক্ষাক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন শিক্ষকের দায়িত্ব হলো এমন ব্যবস্থা করা যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষাক্রমে উল্লেখকরা প্রতিটি শিখনফল অর্জনে সমর্থ হয়। এই কাজটি সফলভাবে করার জন্য শিক্ষকদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়।

শিক্ষক নির্দেশিকার বৈশিষ্ট্য

শিক্ষক নির্দেশিকার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করা হলো-

১। শিক্ষকের শিখন-শেখানো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সহায়ক হিসেবে শিক্ষক নির্দেশিকা ব্যবহৃত হয়।
২। এটি NCTB (National Curriculum & Textbook Board) অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত।
৩। মূলত বিষয়ভিত্তিকভাবে শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়।
৪। শিক্ষক নির্দেশিকায় শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া তথা পদ্ধতি, কৌশল, শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা থাকে।
৫। বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাঠে বিভক্ত করে উপস্থাপন করার নির্দেশনা শিক্ষক নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়।
৬। পাঠ সংশ্লিষ্টশিক্ষা উপকরণ ও তার ব্যবহারবিধি শিক্ষক নির্দেশিকায় উল্লেখ থাকে।
৭। প্রশ্ন তৈরির নিয়মাবলি শিক্ষক নির্দেশিকায় উল্লেখ থাকে।
৮। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল শিক্ষক নির্দেশিকায় আলোচনা করা হয়।
৯। এতে প্রতিটি বিষয় শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায় ও পাঠের উপস্থাপনের উদ্দেশ্য, শিখনফল, পাঠদান পদ্ধতি ও উপকরণের উল্লেখ থাকে।
১০। এতে নমুনা পাঠ পরিকল্পনার উল্লেখ থাকে।

শিক্ষক নির্দেশিকার বিভিন্ন উপাদান

শিক্ষক নির্দেশিকা তিনটি মূল অংশে বিভক্ত। যথা-সামগ্রিক নির্দেশনা, বিষয় ভিত্তিক নির্দেশনা এবং বিষয় ভিত্তিক নমুনা পাঠ পরিকল্পনা। প্রথম অংশে শিক্ষাক্রম ২০১২ বাস্তবায়নে সার্বিকভাবে কিছু বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যা মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শ্রেণি ও বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দ্বিতীয় অংশে সংশ্লিষ্ট বিষয়কে বিবেচনায় রেখে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বিষয় ভিত্তিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে,সবার শেষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সকল অধ্যায়ের জন্য কিছু নমুনা পাঠ পরিকল্পনা দেয়া আছে।

ক. সামগ্রিক নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হচ্ছে-

১. জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষার্থীদের কাঙ্খিত জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ
২. শিক্ষক নির্দেশিকার উদ্দেশ্য ও ব্যবহার
৩. জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য
৪. শিখন-সহায়ক উপকরণ ও ব্যবহার
৫. শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার
৬. শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা
৭. শিক্ষার্থীর মনোযোগ
৮. ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া হিসাবে শিখন
৯. শিক্ষার্থীর প্রতি আচরণ
১০. শিক্ষার উদ্দেশ্য ও শ্রেণিবিভাগ
১১. প্যাডাগোজি (শিক্ষণ বিজ্ঞান)
১২. গঠনবাদের প্রয়োগ
১৩. একীভূত শিক্ষা
১৪. শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা
১৫. শিখন অর্জন যাচাই
১৬. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি, প্রশ্ন করার রীতি, প্রশ্নের ধরন, শিক্ষকের করণীয়

১৭. দলগত কাজ করার প্রক্রিয়া
১৮. পাঠ পরিকল্পনার ছক
১৯. শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিকসমুহ
২০. শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের নির্দেশক রুব্রিকস
২১. শিক্ষার্থীদের সমস্যা-সমাধান দক্ষতা নির্ণায়ক
২২. শিক্ষার্থীদের স্বমূল্যায়ন-দক্ষতা নির্ণায়ক

খ. বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা

২৩. সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গুরুত্ব
২৪. সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বৈশিষ্ট্য
২৫. শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিষয় ভিত্তিক উদ্দেশ্য
২৬. সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠ পরিচালনায় বিশেষ করণীয়

গ. সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অধ্যায় ও শিখনফল ভিত্তিক কিছু নমুনাপাঠ পরিকল্পনা

শিক্ষক নির্দেশিকা ব্যবহারের সুবিধা

প্রতিষ্ঠান ও অঞ্চলভেদে দেশের সকল শিক্ষকের সক্ষমতা একরকম নয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষকবৃন্দের দক্ষতার অভাব থাকতে পারে। শিক্ষক নির্দেশিকা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

- **একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে তত্বাবধান:** একটি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে শ্রেণিকার্যক্রম চলমান থাকে। সকল বিষয়ে প্রধান শিক্ষকের বিষয়ভিত্তিক একাডেমিক দক্ষতার সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। এক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নির্দেশিকার মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের সামগ্রিক একাডেমিক কার্যক্রম আরো সুষ্ঠুভাবে তত্বাবধান করতে পারেন।
- **শিক্ষকের কার্যভার হ্রাস:** একটি বিষয়ের শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকায় প্রতি অধ্যায়ের জন্যই একাধিক পাঠ পরিকল্পনা দেয়া আছে, তাছাড়া বিভিন্ন শিখনক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শিখন-অর্জন যাচাইয়ে সহজ ও ব্যবহার উপযোগি একাধিক মূল্যায়ন ছকও নির্দেশিকায় সংযোজন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক সহজেই এগুলো কাজে লাগাতে পারেন।
- **শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষকের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ:** নির্দেশিকায় প্রতিটি শিখনফলের বিপরীতে সুনির্দিষ্টভাবে শিখন পদ্ধতি, মূল্যায়ন কৌশল, শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষকের আত্মমূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে যা শ্রেণি কার্যক্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিক্ষকের কাজের একটি নমুনাহিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তাই শ্রেণি শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃক শিক্ষক নির্দেশিকার ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে শ্রেণি কার্যক্রমে তাঁদের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে।
- **পরিকল্পিতভাবে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা:** শিক্ষক নির্দেশিকায় শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া অধ্যায়ভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনাও রয়েছে। নির্দেশিকাটি ব্যবহারের মাধ্যমে একজন বিষয়শিক্ষক তার প্রয়োজনমতো শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত শিখন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে নিতে পারেন। কার্যকরভাবে শিক্ষার্থীদের শিখনের সাথে মূল্যায়ন/শিখন-অর্জন যাচাইয়ের সমন্বয় সাধন করতে পারেন। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক তার বিষয়ের বার্ষিক পরিকল্পনাও করতে পারেন।
- **শিখনফলভিত্তিক পাঠদান:** জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এ প্রতিটি বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের শিখনফল দেয়া আছে। প্রতিটি শিখনফলই শিক্ষার্থীর বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক নির্দেশিকায় সব ধরনের শিখনফলের জন্যই নমুনা পাঠ পরিকল্পনা দেয়া আছে। তাই শ্রেণি শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃক শিক্ষক নির্দেশিকার ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে শিখনফলভিত্তিক পাঠদান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
- **প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের প্রকৃতি নির্ধারণ ও ব্যবহার:** শিক্ষক নির্দেশিকায় প্রদত্ত সকল নমুনা পাঠ পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের তালিকা ও ব্যবহার পদ্ধতি বর্ণনা করা আছে। একজন বিষয়শিক্ষক তার প্রয়োজনমতো নতুন নতুন শিক্ষা উপকরণ নির্ধারণ ও ব্যবহার করতে পারেন।
- **শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার: শিখন-শেখানো** প্রক্রিয়ায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সাধারণ আলোচনার পাশাপাশি নমুনা পাঠ পরিকল্পনায় শিখন-শেখানো কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের বিভিন্ন উদাহরণ নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- **শিক্ষকের সক্ষমতা বৃদ্ধি:** একাডেমিক কার্যক্রমে শিক্ষক নির্দেশিকার অনুশীলনের মাধমে একজন শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন সম্ভব।

শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকার ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রধান শিক্ষকের করণীয়

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জনের একটি পরিপূর্ণ দলিল। বিদ্যালয়ে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষকমন্ডলীকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। তাই এর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা খুব জরুরী। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের ভূমিকাই মূখ্য। শিক্ষক নির্দেশিকার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে নিম্নে প্রধান শিক্ষকের করণীয় সম্পর্কে কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। স্বভাবতই একজন অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক এই তালিকা আরো দীর্ঘ করবেন।

- শিক্ষক নির্দেশিকা ব্যবহারের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য নিয়মিত (যেমন-প্রতি মাসে) পর্যালোচনা সভার আয়োজন করতে হবে। এর ফলে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার ভাল সমাধান যেমন পাওয়া যাবে, তেমনি নির্দেশিকা ব্যবহারে সংশ্লিষ্টদের আগ্রহ ও জবাবদিহিতাও বাড়বে।
- শ্রেণি কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে পরামর্শ প্রদান করতে হবে। এজন্য অভিজ্ঞ শিক্ষকদের নিয়ে একটি কমিটি করা যেতে পারে। এছাড়া কোন বিষয়ে একাধিক শিক্ষক থাকলে পিয়ার মনিটরিং হতে পারে।
- নিয়মিত (যেমন- প্রতি মাসে একবার) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। সকল বিদ্যালয়েই অল্পসংখ্যক হলেও প্রশিক্ষিত শিক্ষক থাকেন। যদি একজনও না থাকে, তাহলে প্রাথমিক পর্যায়ে পাশ্ববর্তী কোন বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ শুরু করতে হবে। বিএড/এমএড ডিগ্রিধারী শিক্ষকরাও ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে কাজ করতে পারেন।
- বছরের শুরুতেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক যাতে অধ্যায় ও শ্রেণিভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনার আলোকে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করে একাডেমিক কাউন্সিলে জমা দেন তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতি বিষয়ের অধিকাংশ অধ্যায় ও শ্রেণিভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষক নির্দেশিকায় দেয়া আছে। সংশ্লিষ্ট শ্রেণিশিক্ষককে অল্পসংখক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে, প্রদত্ত পাঠ পরিকল্পনার কিছু হয়তো নিজের বিদ্যালয় পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য পরিমার্জনও করতে হবে। কাজটি অসম্ভব নয়। তাছাড়া একবার পাঠ পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গেলে তা শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। তবে প্রতিটি শ্রেণি কার্যক্রমের অভিজ্ঞতার আলোকে ধারাবাহিক পরিমার্জনের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার মান বৃদ্ধি করতে হবে।
- শিক্ষকবৃন্দকে শিক্ষক নির্দেশিকা কার্যকরভাবে ব্যবহারের জন্য লজিস্টিক সাপোর্ট দিতে হবে। মনে রাখতে হবে সুষ্ঠুভাবে সময়মত শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার উপরই বিদ্যালয়ের সফলতা নির্ভরশীল।
- শ্রেণি কার্যক্রমে আইসিটি ব্যবহারে শিক্ষকবৃন্দকে উৎসাহিত করতে হবে। আইসিটি ব্যবহারে সক্ষম শিক্ষক /শিক্ষকবৃন্দের সহযোগিতায় অন্যদেরও সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। একথা সত্য যে অনেক বিদ্যাল্যয়ে আইসিটি উপকরণ অপ্রতুল কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যালয়েই বিদ্যমান আইসিটি উপকরণের কার্যকর ব্যবহার হয় না।

২.৪ : শিক্ষক প্রশিক্ষণ

শিক্ষক প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১। ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের কলাকৌশল আয়ত্বকরণ ও বাস্তবায়নের উপায় সম্পর্কে ধারণা অর্জন;
২। প্রশিক্ষকের যোগ্যতা, দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনার মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ;
৩। বিষয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষাক্রম এবং এর প্রয়োগের কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন;
৪। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিষয়বস্তুর নবতর ও উল্লেখযোগ্য দিক সম্পর্কে ধারণা অর্জন;
৫। উপযুক্ত শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও কৌশল এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালনার দক্ষতাঅর্জন;
৬। মানসম্পন্ন এবং যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি এবং ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন;
৭। প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদা ও মনোভাব অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পরিচালনার উপায় জানা;
৮। শিক্ষাবিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী অনুশিক্ষণ অনুশীলন করা;
৯। শিক্ষাবিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী ছদ্মশিক্ষণ অনুশীলন করা;
১০। সহযোগিতামূলক শিখনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইতিবাচক প্রশিক্ষণের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারা;
১১। একীভূত শিখনের ধারণা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালনার দক্ষতা অর্জন;
১২। প্রশিক্ষক হিসেবে ব্যক্তিগত উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রউন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্যনিজেকে প্রস্তুত করা।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মধ্যে পার্থক্য

শিক্ষার লক্ষ্য প্রশিক্ষণ থেকে আলাদা এবং ব্যাপক।শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য শিক্ষার্থীর আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন। এক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম ও বিভিন্ন ধরনের শিখন সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু শেখানো হয়। অন্যদিকে প্রশিক্ষণ কোন একটি সুনির্দিষ্ট কাজ অধিকতর ভালভাবে সম্পাদনের দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে। অতএব দেখা যাচ্ছে, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য শিক্ষার চেয়ে অধিকতর সুনির্দিষ্ট। এ জন্য প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত শিখনফল / বিশেষ উদ্দেশ্য সহজভাবে পরিমাপযোগ্য ভাষায় বর্ণনা করা হয় যাতে করে প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণ শেষে তা অর্জন করতে পেরেছে কিনা তা সহজে মূল্যায়ন করতে পারেন।প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মধ্যে ওপরে উল্লিখিত পার্থক্যের কারণে উভয়ের শিখন - শেখানো পদ্ধতিতে কিছুটাপার্থক্য থাকা স্বাভাবিক।

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ও শিশু শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে থাকেন। বয়সের কারণে তারা পূর্ব থেকেই প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছুটা অভিজ্ঞতা ধারণ করে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষকের কাজ হবে প্রশিক্ষণার্থীর বিদ্যমান অভিজ্ঞতাকে সম্মান করা বা মূল্য দেওয়া এবং তার ওপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট নবতর ধারণা প্রদান।

প্রশিক্ষক হিসেবে তাই আমাদের মনে রাখা উচিত প্রশিক্ষণার্থীগণ শিশুদের চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেই প্রশিক্ষণে আসেন। সুতরাং তাদের এ বিদ্যমান অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুকে তাদের অভিজ্ঞতার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। তাই প্রশিক্ষক হিসেবে আপনি যখন দায়িত্ব পালন করবেন তখন প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে আপনারা কী জানতে চান ? এ প্রশ্নটি সরাসরি জিজ্ঞাসা না করে বিষয়টি সম্পর্কে তাদের কী ধারণা আছে সেটি প্রথমে জানবেন এবং তাদের জানার সাথে সম্পৃক্ত করে পরবর্তী ধারণা/ প্রশিক্ষণ দিবেন এবং এভাবে উদ্দেশ্য অর্জনে সাহায্য করবেন। এজন্য গতানুগতিক বক্তৃতা পদ্ধতি পরিহার করে সংলাপ (ডায়ালগ) ও আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবেন। আপনার প্রশিক্ষণ পরিচালনা পদ্ধতি এমন হতে হবে যাতে করে প্রশিক্ষণার্থীরা বুঝতে পারেন যে আপনি তাদের প্রতি সম্মান দেখাচ্ছেন এবং তাদের অভিজ্ঞতাকে মূল্য দিচ্ছেন। যেহেতু বয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে আমাদের কাছে পূর্ব অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ সেহেতু এর প্রতি প্রশিক্ষক হিসেবে আপনার স্বীকৃতি তাদের মধ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রেষণা সৃষ্টি করবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিচালনার মূলনীতি

শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ওপরে উল্লিখিত দুটি মৌলিক বিশ্বাস থেকে আমরা শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিচালনার তিনটি মূলনীতি খুঁজে পাই। যথা-

ক. শিক্ষক প্রশিক্ষণ হবে প্রশিক্ষণার্থী / শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি
খ. শিক্ষক প্রশিক্ষণ হবে বয়স্ক শিক্ষার্থী ভিত্তিক
গ. শিক্ষক প্রশিক্ষণ একটি বৃত্তাকার / ধারাবাহিক প্রক্রিয়া

ক. শিক্ষক প্রশিক্ষণ হবে প্রশিক্ষণার্থী / শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি

শিক্ষক প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত আমাদের অনেকেই শিক্ষার্থী জীবনে যে শিক্ষক কেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি দেখেছি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি তার চেয়ে অনেক দিক দিয়েই আলাদা। আর শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিচালনায় আমাদের প্রয়োজন প্রশিক্ষণার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি। এর কারণ-

- শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীরা প্রাপ্ত বয়স্ক।
- তাঁদের এ সত্তার স্বীকৃতি শিখনে তাদেরকে উৎসাহিত করে।

তাঁদের মধ্যে এ উৎসাহ সৃষ্টি করা গেলে প্রশিক্ষণ থেকে দীর্ঘমেয়াদি ও অধিকতর কার্যকরী ফলাফল সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। এ ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষককে জ্ঞান প্রদানকারীর পরিবর্তে প্রশিক্ষণার্থীদের ফ্যাসিলিটেটর বা সহায়তাকারী হিসেবে দেখা হয়।

খ. শিক্ষক প্রশিক্ষণ হবে বয়স্ক শিক্ষার্থী ভিত্তিক

বয়স্ক শিক্ষা এবং শিশু শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। এজন্য বিশেষজ্ঞরা এ বিষয় দুটিকে ভিন্নভাবে নামকরণ করেন। বয়স্কদের শিখন-শেখানো পদ্ধতিকে বলা হয় Andragogy এবং শিশুদের শিখন-শেখানো পদ্ধতিকে বলা হয় Pedagogy. অর্থাৎ শিশুর শিখন-শেখানোকে বোঝাতে Pedagogy শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 'Ped' একটি গ্রীক শব্দ যার অর্থ শিশুর আর 'gogy' এ গ্রীক শব্দটির অর্থ হলো শিখন। এ কারণেই Pedagogy শব্দের অর্থ বলতে শিশুকে শেখানোর বিজ্ঞান এবং কলাকে বোঝায়। অন্যদিকে Andragogy এর 'Andra' শব্দটিও গ্রীক। এর অর্থ হলো মানুষ (Man)। তাই এ শব্দটি দ্বারা বয়স্কদের প্রয়োজন অনুযায়ী শেখানোর বিভিন্ন উপায় নির্দেশ করে। কোন ব্যক্তি যখন একজন বয়স্ক মানুষে পরিণত হয় তখন তারা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত পূর্ববর্তী শিখনের উপর ভিত্তি করে শিখনের ওপর গুরুত্ব দেয়। সে কারণে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অবশ্যই Andragogy কে ব্যবহার করতে হবে যাতে করে প্রশিক্ষণার্থী নিজের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিখতে পারে।

ঘ. শিক্ষক প্রশিক্ষণ একটি বৃত্তাকার / ধারাবাহিক প্রক্রিয়া

শিক্ষক প্রশিক্ষণ একটি বৃত্তাকার / ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। Millano and Ullius (১৯৯৮) এর মতে এর পাঁচটি ধাপ থাকা উচিত।

১ । প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদা পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে।
২। চিহ্নিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের মূল বিষয়বস্তু চিহ্নিত করতে হবে।
৩। বিষয়বস্তু উপস্থাপনের ধারাবাহিক চার্ট এবং প্রশিক্ষণের Flow Chart নির্বাচন করতে হবে।
৪। প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রণয়ন করতে হবে।
৫। প্রশিক্ষণ কৌশল ও মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী মূল্যায়ন হাতিয়ার তৈরি করতেহবে।

প্রশ্নমালা

১.পাঠ্যপুস্তক কী?

২. উত্তম পাঠ্য পুস্তকের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী?

৩.পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন বলতে কী বুঝেন?

৪. ৯ম-১০ম শ্রেণির মাধ্যমিক হিসাববিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের মূল্যায়ন করুন।

৫.শিক্ষক নির্দেশিকা বলতে কী বুঝেন?

৬.শিক্ষক নির্দেশিকার বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী?

৭. শিক্ষক নির্দেশিকা ব্যবহারের সুবিধাসমূহ আলোচনা করুন।

৮. শিক্ষক নির্দেশিকার ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রধান শিক্ষকের করণীয় কী কী?

৯.শিক্ষক প্রশিক্ষণ কী?

১০.শিক্ষক প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

১১.শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মধ্যে পার্থক্য কী?

১২.শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিচালনার মূলনীতি বর্ণনা করুন।

ইউনিট-৩ : হিসাববিজ্ঞান শিখন-শেখানো পরিকল্পনা

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর আচরণের কাঙ্খিত পরিবর্তন আনয়ন করা। আর এই আচরণগত পরিবর্তন বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীর জ্ঞান , দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। তাই বলা যায়, কোন একটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা কি জ্ঞান , দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট বিবৃতি বা বাক্যই হল শিখনফল (Learning Outcomes) .শিখনফলকে শিখন যোগ্যতাও বলা হয়।

এই ইউনিটের আলোচ্য বিষয়সমূহ হল–

৩.১ : শিখনফল

৩.২: হিসাববিজ্ঞান শিক্ষার শিখনফল

৩.৩: বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা ও একক পাঠ পরিকল্পনা

৩.৪: পাঠ পরিকল্পনা, বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব ও ধাপসমূহ

৩.৫: পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন

৩.১ : শিখনফল

শিখনফল (Learning Outcomes)

একটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা কি কি পারদর্শিতা অর্জন করবে তাই শিখনফল (Learning Outcomes) . শিখনফল সাধারণত বিবৃতি বা বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। শিক্ষক বিষয়বস্তু শিক্ষাদানের পূর্বেই শিখনফল নিরূপণ করে থাকেন এবং মূল্যায়নে শিখনফল অর্জন হয়েছে কিনা তা যাচাই করে দেখেন।

শিখনফলের (Learning Outcomes) বৈশিষ্ট্য

শিখনফলের মূল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে-

১। শিখনফল সংক্ষিপ্ত , স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয়।

২। শিখনফল পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপযোগ্য হয়।

৩। শিখনফল শিক্ষার্থীর আচরণের প্রত্যাশিত পরিবর্তনকে ভিত্তি করে লেখা হয়।

৪। শিখনফলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান , দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রত্যাশা করা হয়।

৫। শিখনফল বাক্যের মাধ্যমে লেখা হয়।

৬। শিখনফল ক্রিয়াবাচক শব্দে (Action Verb) লেখা হয়।

শিখনফল লেখার উপযোগী ক্রিয়াবাচক শব্দগুলো (Action Verb) হলো-

- বলতে পারবেন
- লিখতে পারবেন
- বর্ণনা করতে পারবেন
- পরিমাপ করতে পারবেন
- বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন
- ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- তুলনা করতে পারবেন
- শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন
- ভাগ করতে পারবেন
- চিহ্নিত করতে পারবেন
- অঙ্কন করতে পারবেন
- মিল করতে পারবেন
- অনুবাদ করতে পারবেন
- সনাক্ত করতে পারবেন
- গঠন করতে পারবেন
- সাজাতে পারবেন
- নির্বাচন করতে পারবেন
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন
- দেখাতে পারবেন

৩.২: হিসাববিজ্ঞান শিক্ষার শিখনফল

কোন বিষয় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যে সকল জ্ঞান , দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট বিবৃতি বা বাক্যই হল ঐ বিষয়ের শিখনফল । অর্থাৎ হিসাববিজ্ঞান বিষয় পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে সকল পারদর্শিতা অর্জন করবে তাই হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের শিখনফল । এখানে হিসাববিজ্ঞান বলতে মাধ্যমিক স্তরে ব্যবসায় শিক্ষা শাখার হিসাববিজ্ঞান বিষয়কে বোঝানো হয়েছে। হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যায়ভিত্তিক শিখনফল নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের শিখনফল

প্রথম অধ্যায়: হিসাববিজ্ঞান পরিচিতি

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা-

- হিসাববিজ্ঞানের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।
- হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে।
- হিসাববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- হিসাববিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারীদের সনাক্ত করতে পারবে।
- মূল্যবোধ ও জবাবদিহিতা সৃষ্টিতে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- সমাজ ও পরিবেশের সাথে হিসাব ব্যবস্থার সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবে।
- দৈনন্দিন , ব্যক্তিগত , পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডে হিসাব রাখতে আগ্রহী হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: লেনদেন

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা-

- লেনদেনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- লেনদেনের প্রকৃতি সনাক্ত করতে পারবে।
- হিসাব সমীকরণ বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- হিসাব সমীকরণে ব্যবসায়িক লেনদেনের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের উৎস দলিলাদির তালিকা তৈরি করে বর্ণনা করতে পারবে।
- লেনদেনের সমর্থনে প্রয়োজনীয় দলিলাদি যথাযথভাবে প্রস্তুত করতে পারবে।

তৃতীয় অধ্যায়: দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা-

- লেনদেনের দ্বৈতস্বত্বা নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির ধারণা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
- দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- লেনদেনে জড়িত দুটি পক্ষ অর্থাৎ ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ সনাক্ত / চিহ্নিত করতে পারবে।
- হিসাবচক্রের বিভিন্ন ধাপ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- লেনদেনের জন্য উপযুক্ত হিসাবের বই চিহ্নিত করতে পারবে।
- এক তরফা ও দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবে।

চতুর্থ অধ্যায়: মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা-

- মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।
- মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের পার্থক্য নিরুপণ করতে পারবে।
- মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের পার্থক্যকরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- লাভ-ক্ষতি পরিমাপ এবং আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকালে মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারবে।

পঞ্চম অধ্যায়: হিসাব

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা-

- হিসাবের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- হিসাবের বিভিন্ন প্রকার ছক ('T'-ছক ও 'চলমান জের' ছক) প্রস্তুত করতে পারবে।
- হিসাব সমীকরণ অনুযায়ী হিসাবের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবে।
- দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট হিসাবে ডেবিট-ক্রেডিট লিপিবদ্ধ করতে পারবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: জাবেদা

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা-

- প্রারম্ভিক লিখন হিসেবে জাবেদার ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- জাবেদার শ্রেণিবিভাগ করতে পারবে।
- লেনদেনের সাধারণ জাবেদা দাখিলা লিপিবদ্ধ করতে পারবে।
- চালানের ভিত্তিতে ক্রয় ও বিক্রয় জাবেদা , ডেবিট নোটের ভিত্তিতে ক্রয় ফেরত জাবেদা এবং ক্রেডিট নোটের ভিত্তিতে বিক্রয় ফেরত জাবেদা প্রস্তুত করতে পারবে।

সপ্তম অধ্যায়: খতিয়ান

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা-

- পাকা বই হিসেবে খতিয়ানের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- খতিয়ানের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবে।
- জাবেদা ও খতিয়ানের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবে।
- 'T'-ছক ও 'চলমান জের'- ছক এ হিসাব প্রস্তুত করে হিসাবের জের নির্ণয় করতে পারবে।
- বিভিন্ন ধরণের খতিয়ানের ডেবিট ও ক্রেডিট জেরের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।

অষ্টম অধ্যায়: নগদান বই

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা-

- নগদান বই-এর ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিভিন্ন প্রকার নগদান বই প্রস্তুত করতে এবং নগদান বইয়ের জের টানতে পারবে।
- বিপরীত দাখিলা লিপিবদ্ধ করতে পারবে।
- নগদ প্রাপ্তি জাবেদা ও নগদ প্রদান জাবেদা প্রস্তুত করতে পারবে।
- নগদ বাট্টা লিপিবদ্ধ করতে পারবে।
- নগদান বইয়ের জের খতিয়ানে যথার্থভাবে স্থানান্তর করতে পারবে।
- ব্যাংক বিবরণীর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ব্যাংক বিবরণী ও নগদান বইয়ের উদ্বৃত্তের পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

নবম অধ্যায়: রেওয়ামিল

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা-

- হিসাবের উদ্বৃত্ত দিয়ে যথাযথ ছকে রেওয়ামিল প্রস্তুত করে হিসাবের গাণিতিক নির্ভুলতা পরীক্ষা করতে পারবে।
- হিসাব লিখনের ভুলগুলোর মধ্যে কোন ভুলগুলো রেওয়ামিলের গরমিল ঘটাবে এবং কোন ভুলগুলো রেওয়ামিলের গরমিল ঘটাবে না তা সনাক্ত করতে পারবে।
- অনিশ্চিত হিসাবের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- অনিশ্চিত হিসাব খুলে সাময়িক ভাবে রেওয়ামিলের উভয় দিক মেলাতে পারবে।

দশম অধ্যায় : আর্থিক বিবরণী

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা-

- মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের পার্থক্য এবং আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণে এই পার্থক্যের প্রয়োগ করতে পারবে।
- বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করতে পারবে এবং তা থেকে লাভ-ক্ষতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করতে পারবে এবং এ থেকে স্থায়ী ও চলতি সম্পদ এবং দীর্ঘমেয়াদী ও চলতি দায়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবে।
- নগদ ও পণ্য উত্তোলন, নতুন মূলধন, নীট লাভ / ক্ষতি কিভাবে মূলধন হিসাবে পরিবর্তন আনে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- অনাদায়ী পাওনা এবং সন্দেহজনক অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে হিসাবভুক্ত করতে পারবে।
- সম্পদসমূহের অবচয়ের অর্থ , উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা বুঝে এর হিসাব রাখতে পারবে এবং আর্থিক বিবরণীতে এর প্রয়োগ দেখাতে পারবে।
- ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং মূল্যায়নের জন্য হিসাব সংক্রান্ত অনুপাতের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- হিসাব সংক্রান্ত অনুপাত যেমন বিক্রয়ের সাথে নীট মুনাফার হার , মূলধনের সাথে নীট মুনাফার হার এবং চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের অনুপাত নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- বিশদ আয় বিবরণী এবং দুই বছরের গুরুত্বপূর্ণ হিসাবের অংকগুলি পাশাপাশি রেখে তুলনা করতে পারবে এবং আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারবে।

একাদশ অধ্যায় : পণ্যের ক্রয়মূল্য, উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পণ্যের ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে।
- উৎপাদন ব্যয়ের উপাদানের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবে।
- পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করে মোট উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে।

দ্বাদশ অধ্যায় : পারিবারিক ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগের হিসাব

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা-

- পারিবারিক হিসাব ব্যবস্থার ধারণা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- পারিবারিক বাজেট প্রণয়ন করতে পারবে।
- পারিবারিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করতে পারবে।
- আত্মকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগের বাজেট প্রণয়ন ও তার হিসাব সংরক্ষণ করতে পারবে।

৩.৩ : বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা ও একক পাঠ পরিকল্পনা

বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা

পাঠ্যসূচি অনুসরণে রচিত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু বছরব্যাপী পাঠদান এবং বছরের কোন মাসে কোন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ইত্যাদি সম্বন্ধীয় পরিকল্পনাকে আমরা বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা বলে থাকি। কোন শ্রেণির জন্য নির্ধারিত কোন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক সারা বছরে পাঠদান সম্পন্ন করে নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হলে আশা করা যায় যে, বিষয়টি ঐ শ্রেণিতে পাঠদানের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে এবং শিক্ষার্থীরা পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। পাঠ্যসূচীতে যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলো যদি সারা বছর পড়িয়ে শেষ করা না যায় তবে শিক্ষার্থী পরবর্তী শ্রেণির পাঠ গ্রহণে যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হবে না। এসব গুরুত্বপূর্ণ দিক যেমন- যথাসময়ে শ্রেণি পাঠদান সম্পন্নকরণ, হাতে কলমে শিক্ষাদান এবং পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করার লক্ষ্যেই বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করার দরকার হয়।

বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনার গুরুত্ব

- বার্ষিক পাঠ পকিল্পনার অভাবে সারা দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একই পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার হওয়া সত্বেও বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পাঠের অগ্রগতিতে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।
- কোন কোন বিদ্যালয়ে অনেক বিষয়ের পাঠ অসমাপ্ত থেকে যায়। অপরদিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বছরের শেষাংশে অসমাপ্ত পাঠ তাড়াহুড়া করে শেষ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।
- অনেক সময় একই বিদ্যালয়ে কোন শ্রেণির কোন বিষয়ের পাঠ সম্পন্ন করে একাধিকবার পড়ানো হয়েছে অন্যদিকে কোন বিষয় একবারেও শেষ হয়নি।
- বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনার অভাবে শহরে ও পল্লী এলাকায় শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির মাত্রার তারতম্য দিন দিন বেড়েই চলেছে।
- পরিদর্শক বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে পাঠ পরিকল্পনা অনুসারে পঠন পাঠনের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিতে পারেন।

বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা ব্যবহার করার ফলে সকল বিদ্যালয়ে পঠন পাঠন অগ্রগতি হচ্ছে এবং পাঠ অসমাপ্ত রাখার প্রবণতা হ্রাস পাচ্ছে।

একক পাঠ পরিকল্পনা

ইউনিটের সাধারণ অর্থ হলো একক বা একটি বৃহৎ জিনিসের ক্ষুদ্র অংশ। পাঠের সমগ্র বিষয়কে একটি একক ধরে উপস্থাপনার পর বিষয়কে পুনরায় ছোট ছোট এককে (sub-unit বা উপ-এককে) পাঠদান করাকে একক পাঠ পরিকল্পনা বা ইউনিট পাঠ পরিকল্পনা পদ্ধতি বলা হয়।

একক পাঠ পরিকল্পনার ধাপসমূহ

- বিষয় নির্বাচন
- উদ্দেশ্য নিরূপণ
- পাঠের বিষয় সংগঠন বা বিভাজন
- পুনরালোচনা ও উপসংহার
- মূল্যায়ন

একক পাঠ পরিকল্পনার সুবিধাসমূহ

- একক পাঠ পরিকল্পনা একটি মনোবিজ্ঞান সম্মত পাঠদান পদ্ধতি।
- অর্জিত জ্ঞানকে সমন্বিত আকারে ধরে রাখার উপর জোর দেওয়া হয়।
- শিক্ষকের বিষয়বস্তু ও শিক্ষাদান পদ্ধতি বাছাই করার স্বাধীনতা বেশি থাকে।
- প্রতি ইউনিটের মাধ্যমে বিষয়টি অবগত হওয়ার সুযোগ থাকে বিধায় পাঠে শিক্ষার্থীর আগ্রহ জন্মে।
- শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর অনুষঙ্গ স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

একক পরিকল্পনার অসুবিধাসমূহ

- শিক্ষককে অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হয়।
- এ পদ্ধতিতে পাঠদান করার জন্য যে পাঠ্য বই, সহায়ক বই ও শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজন অনেক ক্ষেত্রে তা সহজলভ্য নয়।
- এ পদ্ধতিতে পাঠদানে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়, যা ক্লাশ রুটিনে ঐ পরিমান সময় বরাদ্দ থাকে না।
- শিক্ষকের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব থাকে।

বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ(হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের ক্ষেত্রে)

- ৯ম ও ১০ম শ্রেণির হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের সিলেবাস
- ৯ম ও ১০ম শ্রেণির হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক
- বর্ষপঞ্জী (ক্যালেন্ডার)
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য সরকারিভাবে প্রণীত ছুটির তালিকা
- বিদ্যালয়ে অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত দিবস সংখ্যা
- সিলেবাস অনুযায়ী বিষয়ের জন্য বরাদ্দকৃত সাপ্তাহিক পিরিয়ড সংখ্যা
- বৎসরের মোট কর্ম দিবস ও বিষয়ের জন্য প্রাপ্য কর্ম দিবস সংখ্যা

উদাহরণ :

বিবরণ	দিবস সংখ্যা
বৎসরের মোট দিবস সংখ্যা	৩৬৫ দিন
ছুটির হিসাব : বৎসরের মোট শুক্রবার	৫২ দিন
সরকারি ছুটির দিন	৮৫ দিন
অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত দিবস সংখ্যা	৩০ দিন
অনিবার্ষ কারণে ক্লাশ বন্ধের দিন	০৫ দিন
মোট ছুটির দিবস সংখ্যা	১৭২ দিন
মোট কার্য দিবস (৩৬৫-১৭২) দিন	১৯৩ দিন বা ২৮ সপ্তাহ (প্রায়)
বিষয়ের জন্য বরাদ্দকৃত সাপ্তাহিক পিরিয়ড	০২ পিরিয়ড
বৎসরে মোট পিরিয়ড সংখ্যা	২৮×২ = ৫৬ পিরিয়ড
৯ম-১০ম শ্রেণির হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের মোট অধ্যায় সংখ্যা	১২টি
৯ম শ্রেণির জন্য আনুমানিক অধ্যায় সংখ্যা	০৮ টি।

বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনার নমুনা

বিদ্যালয়ের নাম : চৌগাছা শাহাদৎ পাইলট হাই স্কুল, চৌগাছা, যশোর।
বিষয় : হিসাববিজ্ঞান শ্রেণি : ৯ম
মোট অধ্যায় সংখ্যা : ১২ ৯ম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত অধ্যায় সংখ্যা : ০৮ টি
ব্যবহারিক পাঠ : ০৫
সংরক্ষিত ক্লাস : ০৬
৯ম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত অধ্যায় সংখ্যা : ০৮
৯ম শ্রেণির জন্য আনুমানিক পাঠ সংখ্যা=২৮ সপ্তাহ(সপ্তাহে কমপক্ষে ২টি হিসাবে) ২৮×২=৫৬ টি

অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার জন্য

সময়	অধ্যায়	পাঠ সংখ্যা	পাঠ শিরোনাম
১লা জানুযারি থেকে ৩০ জুন	১ম অধ্যায়: হিসাববিজ্ঞান পরিচিতি	০৫ টি	▪ হিসাববিজ্ঞানের ধারণা ▪ হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা ▪ হিসাববিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ,হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারী ▪ সমাজ ও পরিবেশের সাথে হিসাব ব্যবস্থার সম্পর্ক ▪ মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ও জবাবদিহি প্রক্রিয়ায় হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা, জবাবদিহিতায় হিসাববিজ্ঞান
	২য় অধ্যায় : লেনদেন	০৪ টি	▪ লেনদেনের ধারণা, লেনদেনের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য ▪ লেনদেন চিহ্নিতকরণ,হিসাব সমীকরণ ▪ হিসাবসমীকরণের উপর লেনদেনের প্রভাব ▪ ব্যবসায়িক লেনদেন উৎস এবং এতদ্‌সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি
	৩য় অধ্যায়: দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি	০৬ টি	▪ দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির ধারণা, দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিরমূলনীতি বা বৈশিষ্ট্য ▪ দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ ▪ ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়ের নিয়মাবলি ▪ লেনদেনে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির প্রভাব ▪ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে রক্ষিত হিসাবের বহি ▪ হিসাবচক্র

	৪র্থ অধ্যায় : মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন	০৬টি	▪ মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের ধারণা-১ ▪ মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের ধারণা-২ ▪ মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন পার্থক্যকরণের প্রয়োজনীয়তা ▪ মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের প্রভাব, বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় ▪ মূলধন ও মুনাফা জাতীয় হিসাবের তালিকা ▪ অনুশীলন
	৫ম অধ্যায় : হিসাব	০৭ টি	● হিসাবের ধারণা, হিসাবের ছক ● হিসাবের শ্রেণিবিভাগ ● হিসাব ও লেনদেনের সহিত সংশ্লিষ্টতা/ সম্পর্ক ● ডেবিট ও ক্রেডিট, হিসাবের উপর লেনদেনের প্রভাব-১ ● হিসাবের উপর লেনদেনের প্রভাব-২ ● অনুশীলন-১ ● অনুশীলন-২

বার্ষিক পরীক্ষার জন্য

সময়	অধ্যায়	পাঠ সংখ্যা	পাঠ শিরোনাম
১৫ জুলাই থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত	৬ষ্ঠ অধ্যায়:জাবেদা	০৭ টি	▪ জাবেদার ধারণা, জাবেদার গুরুত্ব ▪ জাবেদার শ্রেণিবিভাগ ▪ বিশেষ জাবেদা, সাধারণ দাখিলা প্রদানে বিবেচ্য বিষয় ▪ প্রকৃত জাবেদা ▪ বাট্টা ও বাট্টার প্রকারভেদ ▪ অনুশীলন-১ ▪ অনুশীলন-২
	৭ম অধ্যায় : খতিয়ান	০৬ টি	▪ খতিয়ানের ধারণা, খতিয়ানের বৈশিষ্ট্য ▪ খতিয়ানের গুরুত্ব ▪ জাবেদা ও খতিয়ানের পার্থক্য ▪ খতিয়ানভুক্তকরণ বা পোস্টিং, হিসারের জের টানা বা ব্যালেন্সিং ▪ অনুশীলন-১ ▪ অনুশীলন-২
	৮ম অধ্যায়: নগদান বহি	০৬ টি	▪ নগদান বই-এর ধারণা, নগদান বই-এর বৈশিষ্ট্য ▪ নগদান বইয়ের গুরুত্ব ▪ নগদান বইয়ের শ্রেণিবিভাগ ▪ ব্যাংক বিবরণী, ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী ▪ অনুশীলন-১ (এক ঘরা ও দুইঘরা নগদান বই) ▪ অনুশীলন-২(তিনঘরা নগদান বই)
ব্যবহারিক		০৫টি	শিক্ষক নির্ধারণ কররেন
সংরক্ষিত(পুনরালোচনা/মূল্যায়ন/নির্ধারিত কাজ/ফিডব্যাক		০৪ টি	
মোট পিরিয়ড		৫৬ টি	

হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে একটি একক পরিকল্পনার নমুনা

একক নম্বর	০৭	বিষয়	হিসাববিজ্ঞান
এককের নাম	খতিয়ান	প্রতি পাঠের সময়	১ ঘণ্টা
শ্রেণি	৯ম	মোট পাঠ সংখ্যা	০৪ টি

তারিখ	পাঠের উদ্দেশ্য	পাঠের বিষয়	উপকরণ	পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল	বিশেষ নির্দেশনা
০১/১০	খতিয়ানের ধারণা ও খতিয়ানের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবে।	খতিয়ানের ধারণা, খতিয়ানের বৈশিষ্ট্য	খতিয়ানের ধারনা ও বৈশিষ্ট্য সম্বলিত পোস্টার পেপার	মিনি লেকচার, একক ও দলীয় আলোচনা	প্রতিটি শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।
০৯/১০	খতিয়ানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। পারবে।	খতিয়ানের গুরুত্ব	খতিয়ানের গুরুত্ব মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে Smart Art-এ প্রদর্শন।	সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর ও মাথা খাটানো	প্রতিটি শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।
১৭/১০	জাবেদা ও খতিয়ানের পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারবে।	জাবেদা ও খতিয়ানের পার্থক্য	জাবেদা ও খতিয়ানের পার্থক্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন।	সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা, মাইন্ড ম্যাপিং, দলীয় কাজ।	প্রতিটি শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।
২৪/১০	খতিয়ানভুক্তকরণ বা পোস্টিং, হিসারের জের টানা বা ব্যালেন্সিং করতে পারবে।	খতিয়ানভুক্তকরণ বা পোস্টিং, হিসারের জের টানা বা ব্যালেন্সিং	হোয়াইট/ব্লাক বোর্ড, মার্কার কলম/চক, ডাস্টার ইত্যাদি	সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা, মাইন্ড ম্যাপিং, একক কাজ, দলীয় কাজ।	প্রতিটি শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।

৩.৪ : পাঠ পরিকল্পনা, বৈশিষ্ট্য, গুরুত্বও ধাপসমূহ

পাঠ পরিকল্পনা

পাঠদান প্রক্রিয়াকে কার্যকর ও আকর্ষণীয় করার জন্য একটি পূর্ব নির্ধারিত নকশাই হচ্ছে পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Plan).শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান, মানসিক ক্ষমতা, বয়স, রুচি, আগ্রহ ইত্যাদি বিচার করে শিক্ষার্থীর পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের উদ্দেশ্যে শিক্ষক শ্রেণি পাঠদানের প্রতিটি পাঠের ক্ষেত্রে দৈনিক যে পূর্ব প্রস্তুতি (লিখিত /অলিখিত) গ্রহণ করে থাকেন, তাই পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Plan)। অর্থাৎ পাঠ পরিকল্পনা বা পাঠটীকা (Lesson Plan) হচ্ছে পাঠদানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শ্রেণি ও পিরিয়ডে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের প্রদত্ত পাঠের উপর তার মানসিক পূর্ব প্রস্তুতির লিখিত বহি:প্রকাশ।

পাঠ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য

১।পাঠ পরিকল্পনা একটি পূর্ব নির্ধারিত নকশা।
২। পাঠ পরিকল্পনা প্রতিটি পাঠের ক্ষেত্রে দৈনিক পূর্ব প্রস্তুতি।
৩। পাঠ পরিকল্পনা লিখিত ও অলিখিত উভয়ই হতে পারে।
৪। পাঠ পরিকল্পনা শ্রেণি ও পিরিয়ডভিত্তিক করতে হয়।
৫। পাঠ পরিকল্পনা সময়ভিত্তিক কার্যকর শিখন পরিকল্পনা।

পাঠ পরিকল্পনার গুরুত্ব

১। পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে ভূমিকা রাখে।
২। পাঠদান প্রক্রিয়াকে কার্যকর ও আকর্ষণীয় করার জন্য পাঠ পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
৩। পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষককে সঠিক পথে রাখে।
৪। পাঠ পরিকল্পনা শ্রেণি পাঠদানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
৫। কার্যকর শিখনের (Active Learning) জন্য পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Plan) অত্যন্ত জরুরী।
৬। শিখন কার্য বাস্তবায়নে শিক্ষককে ধারাবাহিক ও সুনিয়ন্ত্রিত রাখে।
৭। শিক্ষাদানে শিক্ষককে আত্ম বিশ্বাসী করে তোলে।

পাঠ পরিকল্পনার ধাপ / বিভিন্ন স্তর

ক) পঞ্চ সোপান বিশিষ্ট পাঠটীকা
খ) ত্রি সোপান বিশিষ্ট পাঠটীকা

ক) পঞ্চ সোপান বিশিষ্ট পাঠটীকা : জন হার্বার্ট শিশুর মানসিক গঠন ও আগ্রহের ধারাকে বিচার করে একটি পাঠকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন। যেমন- পর্যবেক্ষণ, ধারণা, চাহিদা ও কাজ। এই স্তর বিভাগ থেকেই তিনি পাঠদান পদ্ধতির চারটি স্তর বের করেন। সেগুলো হলো - (ক) স্পষ্টতা (Clearness) (খ) পারস্পরিক সম্পর্ক (Association) (গ) সূত্র নির্ধারণ (Generalization) এবং (ঘ) প্রয়োগ (Application)। হার্বার্টের এক শিষ্য প্রথম স্তরটি স্পষ্টতা (Clearness) কে ভেঙ্গে প্রস্তুতি(Preparation) এবং উপস্থাপন (Presentation) নামে দু' ভাগে ভাগ করেন। তার অন্য আর একজন শিষ্য যার নাম রেইন (Wren) প্রস্তুতির পরে উদ্দেশ্য বলে একটি স্তর যোগ করেন। হার্বার্ট প্রদত্ত পাঁচ স্তর বিশিষ্ট পাঠদান পরিকল্পনা বিশ্বব্যাপী এক বিপ্লব আনয়ন করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনিই সর্ব প্রথম পাঠ পরিকল্পনার একটি বিজ্ঞান সম্মত ভিত্তিস্থাপন করেন। হার্বার্টের এই জগদ্বিখ্যাত পাঠ পরিকল্পনার পাঁচটি সোপান রয়েছে। এগুলোকে সংক্ষেপে পঞ্চ সোপান বলে। অবশ্য হার্বার্টের পঞ্চসোপানকে আধুনিককালে মূলত তিনটি বা ত্রি-সোপান বিশিষ্ট পাঠটীকা বলা যায়।

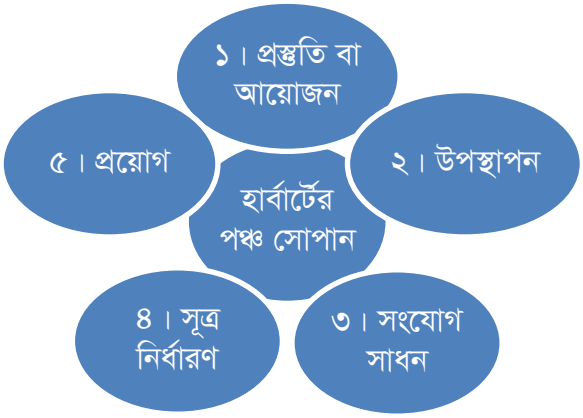

হার্বাটের পঞ্চ সোপানের ফ্লো চার্ট

খ) ত্রি-সোপান বিশিষ্ট পাঠটীকা : হার্বার্ট ও তাঁর অনুগামী শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাদানের সোপানের পাঁচটি স্বতন্ত্র পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে দুটি সোপান বাদ দেয়া হয় তাহলো তুলনাকরণ এবং সমান্যকরণ । বস্তুত এ সোপান দুটি স্বতন্ত্রভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক নয়। তাছাড়া পঞ্চসোপান অনুসরণে প্রয়োজনীয় সময়েরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাই আধুনিককালে ত্রি-সোপান বিশিষ্ট পাঠটীকা অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এ তিনটি সোপান হলো:

১। প্রস্তুতি (Preparation)
২। উপস্থাপন (Presentation)
৩। প্রয়োগ (Application) বা মূল্যায়ন (Evaluation).

৩.৫ : পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন

বিদ্যালয়ের নাম

প রি চি তি	শিক্ষকের নাম: শ্রেণি: বি এড রোল: শিক্ষাবর্ষ:	শ্রেণি: নবম বিষয়: হিসাববিজ্ঞান সময়: ৪৫মি: তারিখ: / / ২০
শি খ ন ফ ল	এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা... ১। চালানের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২। চালান তৈরি করতে পারবে। ৩। ভাউচারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪। বিভিন্ন প্রকার ভাউচার তৈরি করতে পারবে।	

সোপান	সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উপকরণ
প্র স্তু তি	৫মি	১। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করব। ২। প্রয়োজনে আসন বিন্যাস করব। ৩। বাড়ির কাজ আদায় করব। ৪। পূর্বজ্ঞান যাচাই ও মানসিক পরিবেশ গঠন করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্ন করব: ➢ বাস্তব উপকরণ চালান ও ভাউচার দেখিয়ে প্রশ্ন করব এটা কী? ➢ এগুলো কেন ব্যবহার করা হয়? তাহলে এসো আজ আমরা "চালান ও ভাউচার" সম্পর্কে জানব-এই বলে পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিব।	১। শিক্ষার্থীরা শুভেচ্ছা বিনিময় করবে। ২। শিক্ষার্থীরা আসন বিন্যাসে সহযোগিতা করবে। ৩। শিক্ষার্থীরা বাড়ির কাজ জমা দিবে। ৪। শিক্ষার্থীরা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠ গ্রহণে মানসিকভাবে প্রস্তুত হবে। শিক্ষার্থীরা উত্তর দিতে চেষ্টা করবে। ➢ চালান ও ভাউচার। ➢ লেনদেনের প্রামান্য দলিল হিসেবে ব্যবহার করা হয়? শিক্ষার্থীরা পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখে নিবে।	
উ প স্থা প ন	৩০মি;	নিম্নলিখিত কৌশল প্রয়োগে আজকের পাঠে অগ্রসর হব। ১।শিক্ষার্থীদের সাথে মত বিনিময় করে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে চালান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করব। ২। চালান তৈরির কৌশল প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপস্থাপন করব। ৩।প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ভাউচার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করব। ৪। ভাউচার তৈরির কৌশল প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপস্থাপন করব। শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করব এবং প্রত্যেক দলকে একটি করে কাল্পনিক নাম ঠিকানা ব্যবহার করে চালান ও ভাউচার তৈরি করতে বলব। ➢ দলগত কাজ তদারকি করব। ➢ দলনেতাকে দলগত কাজ উপস্থাপনের জন্য আহবান করব। এবার চালান ও ভাউচারের ধারণা,প্রকারভেদ ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব এবং কোন ভাউচার কোন কাজে লাগে তা বুঝিয়ে দিব।	শিক্ষার্থীরা মত বিনিময়ে অংশগ্রহণ করবে। শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে দলগত কাজে অংশ নিবে। ➢ মনোযোগ সহকারে দলগত কাজ করবে। ➢ দলনেতা দলগত কাজ উপস্থাপন করবে। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শিক্ষকের কথা শুনবে। ➢ শিক্ষার্থীরা মত বিনিময়ে অংশগ্রহণ করবে।	চালান ও ভাউচারের নমুনা ভাউচারের শ্রেণিবিভাগের চার্ট

প্র য়ো গ	১০মি:	নিম্ন লিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করব। ১। চালান কী? ২। চালান কে প্রস্তুত করেন? ৩। ভাউচার বলতে কী বোঝায়? ৪। ভাউচারে কার কার স্বাক্ষর থাকে? ৫। ডেবিট ভাউচার কী? ● বাড়ির কাজ বোর্ডে লিখে দিব। চালান ও ভাউচার এর মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য লিখ। সবশেষে বোর্ড পরিষ্কার করে শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করব।	শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিবে। ১। পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের একটি প্রামাণ্য দলিল। ২। বিক্রেতা। ৩। লেনদেনে যে প্রমাণপত্র ব্যবহৃত হয় তাই ভাউচার। ৪।ক্যাশিয়ার,হিসাবরক্ষক,ব্যবস্থাপক এবং গ্রহীতা। ৫। ক্রয় এবং ব্যয় এর স্বপক্ষে যে ভাউচার তাই ডেবিট ভাউচার। ● শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ডায়রীতে বাড়ির কাজ লিখে নিবে। ● শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে শিক্ষককে সম্মান করবে এবং মুখে সালাম জানাবে।	

প্রশ্নমালা

১। শিখনফল বলতে কী বুঝায়?

২ । শিখনফলের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী?

৩। নবম-দশম শ্রেণির মাধ্যমিক হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যায় অনুযায়ী শিখনফল উল্লেখ করুন।

৪। একক পাঠ পরিকল্পনা বলতে বুঝায়? হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের একটি নমুনা একক পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুতকরুন।

৫। বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা কী? বাৎসরিক পাঠ পাঠ পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৬। পাঠ পরিকল্পনা কী?

৭। পাঠ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ কী?

৮। পাঠ পরিকল্পনার গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

৯। আধুনিক পাঠ পরিকল্পনার ধাপসমূহ উল্লেখ করুন।

ইউনিট-৪ : হিসাববিজ্ঞান শিখন-শেখানো পদ্ধতি

শিখন-শেখানো কার্যক্রম একটি জটিল প্রক্রিয়া। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করার জন্য কিছু পদ্ধতি রয়েছে। পদ্ধতি মাফিক পাঠদান না করলে তা শিক্ষার্থীর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। ফলে শিক্ষার্থী শিক্ষকের পাঠ গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে না। শিখন হল শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থার ক্রম রূপান্তর। শিখন কখনও শূন্যে সংঘটিত হয় না। এর জন্য প্রয়োজন অনুকুল পরিবেশ ও পরিস্থিতি। শিক্ষার্থীর বয়স, পরিপক্কতা, বুদ্ধি, মেধা, শারীরিক সুস্থতা, প্রেষণা ইত্যাদি হচ্ছে শিখনের প্রাথমিক উপাদান। দ্বিতীয় উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে শিখনের বিষয়বস্তু, শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা, শিখন সামর্থের বর্তমান স্তর, শিক্ষামূলক উপাদান ইত্যাদি। শিখন প্রক্রিয়াকে কার্যকর করতে দুটি উপাদনের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হবে।

এই ইউনিটের আলোচ্য বিষয়সমূহ হল-

৪.১ : শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতি ও শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি

৪.২ : বক্তৃতা পদ্ধতি, আলোচনা পদ্ধতি, সমস্যা সমাধান পদ্ধতি, প্রকল্প পদ্ধতি (কারখানা পরিদর্শন)

৪.৩ : অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, হিসাববিজ্ঞান শিক্ষায় অংশগ্রহণমূলক শিখন-শিখানোর প্রয়োজনীয় কলাকৌশল ও দক্ষতাসমূহ-একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, মাথা খাটানো, মাইন্ড ম্যাপিং

৪.৪ : অনুশিক্ষণ, অনুশিক্ষণের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

৪.৬ : অনুশিক্ষণ কৌশল বা দক্ষতাসমূহ ও প্রদর্শন

৪.৬ : সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণ, সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

৪.৭ : ফলাবর্তন, ফলাবর্তন কার্যকর করার কৌশল ও ফলাবর্তনের সুবিধাসমূহ

৪.১ : শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতি ও শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি

শিক্ষণ পদ্ধতি

শিক্ষণ পদ্ধতি (Teaching Methodology) একদিকে বিজ্ঞানধর্মী এবং অপরদিকে সৃজনধর্মী শিল্পকলা। শিক্ষণ পদ্ধতির একদিকে রয়েছে অফুরন্ত জ্ঞানের ভান্ডার। অপরদিকে রয়েছে ক্রমবিকাশমান শিশু মন। এ দু'য়ের মাঝে সংযোগ সাধনের মধ্যে রয়েছে পদ্ধতি প্রয়োগের সার্থকতা। কাজেই একদিকে শিক্ষককে যেমন বিষয়জ্ঞান অর্জন করতে হবে, অপরদিকে তেমনি শিক্ষার্থীর মন মানসকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে হবে। সেই সঙ্গে নিজ চিন্তা, যুক্তি, বুদ্ধি ও বিবেচনা দিয়ে পদ্ধতিকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তুলতে হবে। এখানেই শিক্ষাদান পদ্ধতির কলাধর্মী বৈশিষ্ট্যটি নিহিত।

শিক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

ক. পদ্ধতি হবে লক্ষ্য ভিত্তিক। প্রথমে লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিয়ে লক্ষ্যের অনুকুলে বিষয়বস্তু উপস্থাপন ও লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সর্বশেষে লক্ষ্য অর্জনের জন্য মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।

খ. শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ কখনও এলোমেলো হতে পারে না। সুষ্ঠু নীতির উপর ভিত্তি করে প্রয়োগ পদ্ধতি হবে সুপরিকল্পিত। জানা থেকে অজানা, বাস্তব থেকে অবাস্তব, মূর্ত থেকে বিমূর্ত, বিশ্লেষণ থেকে সংশ্লেষণ ইত্যাদি হল সুষ্ঠু পদ্ধতি প্রয়োগের নীতি। তবে সব সময় এ নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে এমন কোন নিয়ম নেই। এটি নির্ভর করে শিক্ষকের দূরদৃষ্টি, প্রজ্ঞা ও কল্পনা শক্তির উপর।

গ. শিক্ষণ পদ্ধতি হতে হবে মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক। শিশু যা শেখে তাই তার আচার-আচরণে রূপান্তরিত হয়ে নিজ জীবনে বাস্তবায়িত হয়। তাই শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ, আগ্রহ, ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করা বাঞ্ছনীয়।

ঘ. সুষ্ঠু শিক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল ক্রীড়া ও কর্মভিত্তিক। মাধ্যমিক স্তর অপেক্ষা প্রাথমিক স্তরে পদ্ধতি প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অধিক ক্রীড়াভিত্তিক হলেও মাধ্যমিক স্তরের জন্য কর্মভিত্তিক পদ্ধতিই অধিকতর শ্রেয়।

ঙ. সার্থক শিক্ষণ পদ্ধতি সমাজ ও জীবনভিত্তিক উপাদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। মনে রাখতে হবে শিক্ষার্থীর সমস্ত জ্ঞানার্জনই তাকে জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ধাবিত।

চ. উত্তম শিক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষার্থীর মনকে যুক্তি ও চিন্তাধর্মী করে তোলা। প্রাথমিক অবস্থায় শিশুর মন যুক্তি ও বিচারধর্মী থাকে না। শিক্ষার্থী যত বড় হতে থাকে, তার ভিতর ধীরে ধীরে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিও তত জাগ্রত হয়। কাজেই প্রাথমিক স্তরে মূর্ত বিষয় দিয়ে শুরু করে উচ্চতর স্তরগুলিতে বিমূর্ত বিষয়ের অবতারণা করা শ্রেয়।

ছ. সার্থক শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যক্তি ও শ্রেণি উভয়কেই প্রাধান্য দেয়। একজন সার্থক শিক্ষক ব্যক্তি বিশেষের ভিন্নতার দিকে যেমন নজর রাখেন, তেমনি সমগ্র শ্রেণির প্রতি তার দৃষ্টি সদা জাগ্রত থাকে। স্বল্প মেধা, গড় মেধা, এবং উচ্চ মেধা এই তিন শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীদের প্রতি সমান দৃষ্টি রেখেই তাকে শিক্ষা দান করতে হয়।

একজন শিক্ষকের জন্য প্রথম প্রয়োজনীয় জিনিসটি হল তার বিষয়গত জ্ঞান এবং দ্বিতীয়টি হল পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক জ্ঞান।

শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতি

প্রাচীনকালে গুরু-শিষ্য ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিষ্য গুরুর গৃহে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবস্থান করত, গুরুর সকল রকম কাজে সাহায্য করত। গুরু শিষ্যের সকল ধরনের শিক্ষার কাজ গ্রহণ করতেন। জ্ঞান, দক্ষতা, আচার-আচরণ সকল প্রকারের শিক্ষা গুরু মুখোমুখি(face to face) পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করতেন এবং শিষ্য শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তা গ্রহণ করত। এই শিক্ষা ব্যবস্থার দিক ছিল গুরু হতে শিষ্য যাকে কথ্য ভাষায় বলা হত "জগ-মগ তত্ত্ব "।

এরপর যখন ক্রমান্বয়ে প্রাতিষ্ঠানিক বা বিদ্যালয়ভিত্তিক এক হতে বহু (one to many) শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হল, তখন একজন শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে সকল বিষয় শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। পরবর্তীতে শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এবং বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান বহুধা বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক একটি শ্রেণিতে একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে একটি বিষয় পড়াতে শুরু করলেন। এই সময়ে উন্নত বিশ্বে শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণার কাজ শুরু হল এবং সময়ের সাথে শিক্ষাবিদরা উপলব্ধি করলেন শিক্ষার "জগ-মগ তত্ত্ব" আর কার্যকর থাকছে না।

গবেষণার ফল অনুধাবন করে বিদ্যালয়ের শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর দলগত, একক সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিল। ক্রমান্বয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষককেন্দ্রিক হতে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভুত হল।

আমাদের দেশে শিক্ষার্থী সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় দীর্ঘকাল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষককেন্দ্রিক ছিল এবং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক প্রধাণত বক্তৃতা নির্ভর পদ্ধতি ব্যবহার করতেন।

শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতির দুর্বলতা হল এতে শিক্ষক পাঠ্যসূচী অনুযায়ী মুল বিষয়বস্তু তুলে ধরেন, শিক্ষার্থী শুধু শ্রোতা হয়ে শোনে। কোন বিশেষ অংশ সম্পর্কে শিক্ষক আলোকপাত করেন, মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রাখেন, শিক্ষার্থী মনোযোগ সহকারে শুনছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখেন, বাড়ির কাজ প্রদান করে সকল প্রকার দায়িত্ব পালন করেছে ভেবে সন্তুষ্টি লাভ করেন।

শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতিতে পাঠদানকালে শিক্ষক মূল ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি অনুসরণে শিক্ষাদান কার্যকে বাস্তবায়িত করলে শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় নীরবতা পালন করে। শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষাদান কার্যকে সজীব করে তুলতে শিক্ষকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে শিক্ষার্থীগণ তাদের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সজাগ রেখে শিক্ষক যা বলেন তা যদি বুঝতে বা অনুধাবন করতে কিংবা অনুসরণ করতে চেষ্টা না করে তবে শিক্ষকের ভূমিকা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, শিক্ষাদান সেখানে ব্যর্থ হতে বাধ্য। সুতরাং শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতিতেও শিক্ষার্থীর ভূমিকা রয়েছে, তবে শিক্ষার্থীর ভূমিকা সেখানে প্রধান নয়। যে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকাই মুখ্য আর শিক্ষার্থীর ভূমিকা গৌণ, সেই শিক্ষাদান পদ্ধতিই বহুদিন থেকে আমাদের দেশে অনুসৃত হয়ে আসছে। এই কারণে এ পদ্ধতিকে সনাতন পদ্ধতি নামে অভিহিত করা হয়।

শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর নিজস্ব প্রয়োজন, সামর্থ্য, আগ্রহ, পছন্দ-অপছন্দের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার ও শিক্ষা পদ্ধতির আমুল সংস্করের প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার স্বীকৃতি, শিখনে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ, তার পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব আরোপ, সুশৃঙ্খল মানসশক্তির অধিকারী করে তোলা, সৃজনশীলতার উদ্দীপনা সৃষ্টি এবং ব্যক্তিসত্ত্বার পূর্ণ বিকাশ।

শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর চিন্তা শক্তি সচল থাকে, প্রত্যেকটি বিষয়বস্তু সে সঙ্গে সঙ্গে আত্মীকরণের চেষ্টা করে, নিজের পূর্ব জ্ঞানের সঙ্গে দিনের পাঠ্যবিষয়বস্তুর জ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপন করে, জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করে শিক্ষকের নিকট খোলামেলা প্রশ্ন করে, সহপাঠী এবং শিক্ষকের সাথে তার্কিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের মোড়ও ঘুরিয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থী নিজস্ব চিন্তাধারা দ্বারা শিক্ষকের বা পুস্তকের চিন্তাকে প্রতিস্থাপিত করার উদ্যোগ নেয়। প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে প্রবেশ করে মেধাবী ও চিন্তাশীল শিক্ষার্থী প্রয়োজনবোধে নিজের উন্নত চিন্তার স্বপক্ষে স্বীকৃতি দাবি করে।

প্রখ্যাত চিন্তাবিদ তায়না কায়ভোলা(Taina Kaivola) বলেন, "Any method can, in principle be use in either a teacher-centered way which focuses on the transmission of disciplinary content or in a student-centered way which is more directly concerned with the conceptual and skill development of the students".

অর্থাৎ "শিখন-শেখানের যে কোন পদ্ধতি শিক্ষককেন্দ্রিক ব্যবস্থা অথবা শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগ করা সম্ভব। শিক্ষককেন্দ্রিক ব্যবস্থা বিষয়বস্তু অত্যন্ত ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপনের উপর গুরুত্ব প্রদান করে এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ব্যবস্থা মূলত শিক্ষার্থীদের ধারনা গঠন ও দক্ষতা উন্নয়নের সাথে জড়িত"।

তায়না আরো বলেন, "The crucial indicator of a student-centered approach is the breadth of consideration undertaken by the teacher in designing the curriculum, the range of teaching and assessment methods adopted to achieve aims in the most appropriate manner and the learning climate developed within the department".

অর্থাৎ " শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় শিক্ষক শিক্ষাক্রম সাজানোতে প্রচুর ভাবনা চিন্তা করেন, পাঠের উদ্দেশ্য সফলভাবে বস্তবায়নের জন্য শিক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের সার্থকতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে অত্যন্ত সঠিক আচরণের প্রয়োগ করেন এবং শিখন পরিবেশ এর গঠন সম্পর্কেও সচেতন থাকেন"।

শিখণ-শেখানো কাজে ব্যবহৃত দুইটি পৃথক পদ্ধতির মৌলিক পদ্ধতিগত পার্থক্যসমূহ:

শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি	শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি
• এই পদ্ধতিতে শিক্ষক পঠিত বিষয়স্তুর উপযোগিতা অনুসারে পাঠদান কৌশল নিজেই নির্ধারণ করেন যাতে করে তিনি বিষয়বস্তু সার্থকভাবে (তার ধারনা মতে) শিক্ষার্থীর কাছে পৌছে দিতে পারেন।	• এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীবৃন্দ শিক্ষকের সহায়তায় নিজেরাই গভীর চিন্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পঠিত বিষয়বস্তুর প্রকৃত ধারণা নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে।
• শিক্ষক পাঠদান কাজে প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করেন। শিক্ষার্থী উপস্থাপিত ধারণার আলোকে শিক্ষকের নিকট গ্রহণযোগ্য উত্তর প্রদানে সচেষ্ট থাকে।	• শিক্ষার্থী ''constructivist" তত্ত্ব অনুসারে নিজের পূর্ববর্তী ধারণার সাথে বর্তমানে বিষয়বস্তুর সংযোগ ঘটিয়ে সক্রিয়ভাবে বস্তুনিষ্ঠ উত্তর প্রদান এবং নিজের প্রদত্ত উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদানে তৎপর থাকে।
• এই পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর নিকট সঞ্চালন করেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তিনি সনাতন শিক্ষা পদ্ধতি ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দবোধ করেন।	• এই পদ্ধতির লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর শিখন উন্নয়ন করা। সুতরাং শিক্ষক নিজস্ব শিখন-শেখানো পদ্ধতি/কৌশল উন্নয়নে সদা তৎপর থাকেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, শিক্ষককেন্দ্রিক ব্যবস্থা হতে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগে অভ্যস্থ হতে একজন শিক্ষকের যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হবে। সুতরাং একজন প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষক অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

৪.২ : বক্তৃতা পদ্ধতি, আলোচনা পদ্ধতি, সমস্যা সমাধান পদ্ধতি, প্রকল্প পদ্ধতি (কারখানা পরিদর্শন)

বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture Method)

বাচনধর্মী পদ্ধতিগুলির মধ্যে বক্তৃতা পদ্ধতি অন্যতম। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য গল্প বলা পদ্ধতিই মাধ্যমিক স্তরে গিয়ে বক্তৃতা পদ্ধতিরূপে গণ্য হয়। বক্তৃতা পদ্ধতি একটি একমুখী প্রক্রিয়া। শিক্ষক বলেন, শিক্ষার্থী শোনে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করার বা শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে প্রশ্ন করার তেমন সুযোগ থাকে না। বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষক মৌখিক বিবৃতির সাহায্যে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপন করেন।এতে শিক্ষকের বাগ্মিতা, বক্তৃতাদানের কলাকৌশল, বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর হৃদয়গ্রাহী করে তোলার ক্ষমতা, শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা, আগ্রহ, পারগতা ইত্যাদি বিবেচনা করে শিক্ষণীয় বিষয়কে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের দক্ষতার উপর শিক্ষাদানের সার্থকতা অনেকাংশে নির্ভর করে। বক্তৃতা পদ্ধতি একমুখী প্রক্রিয়া হওয়াতে অত্যন্ত একঘেয়ে এবং সবচেয়ে কম ফলপ্রসূ। অল্পবয়সী শিক্ষার্থীর জন্য এ পদ্ধতি একেবারেই উপযোগী নয়। প্রকৃতপক্ষে সত্যিকারের বক্তৃতা পদ্ধতিতে কোথাও পড়ানো হয় না। শিক্ষক বক্তৃতা পদ্ধতির সঙ্গে প্রয়োজনীয় কলাকৌশল যোগ করে বক্তৃতা পদ্ধতিতে ফলপ্রসূ করে তোলেন।

অনেক সমালোচনা সত্ত্বেও বক্তৃতা হচ্ছে বহুল প্রচলিত শিক্ষাদান কৌশল। Bergevin বক্তৃতাকে ' a carefully prepared oral presentation of a subject by a qualified person' বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যদিও অনেক সময়ই বক্তৃতা সযত্নে তৈরি করা হয় না এবং দক্ষ ব্যক্তি দ্বারাও করানো হয় না। যত সমালোচনাই থাকুক না কেন, প্রায় সকল শিক্ষকই বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যবহার অব্যাহত রেখেছেন। কোন কোন শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নন বলে অন্যান্য পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্পর্কে কম জানেন অথবা অন্যান্য পদ্ধতি প্রয়োগ করার মত আত্মবিশ্বাস নেই বলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

বক্তৃতা পদ্ধতি ফলপ্রসূ করার উপায়

- এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের কণ্ঠস্বর, বক্তব্য, উপস্থাপন এবং প্রকাশভঙ্গি যথেষ্ঠ মনোজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন।
- বিষয়বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীর অনুরাগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে শিক্ষককে মাঝে মাঝে অভিব্যক্তির বৈচিত্র সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ এবং মনোযোগ অক্ষুণ্ন রাখার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।
- বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করতে শিক্ষার্থীদের মানসিক পূর্বপ্রস্তুতির জন্য শিক্ষককে কল্পনাশক্তি ও রসবোধের পরিচয় দিতে হবে।
- বক্তৃতামূলক পদ্ধতিতে পাঠদান আকর্ষণীয় করার উদ্দেশ্যে শিক্ষক প্রয়োজনীয় শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করেন। শুধু বক্তৃতাদান শিক্ষার্থীদের মনে একঘেঁয়েমী, অবসাদ, ক্লান্তি, বিরক্তির সঞ্চার করতে পারে।
- এই পদ্ধতিতে শিক্ষককে যথাসম্ভব মিতভাষী হওয়া আবশ্যক। অপ্রাসঙ্গিক বিবৃতিদান থেকে তিনি সচেতনভাবে বিরত থাকবেন। তবে তাকে মূল বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ উপমা, উদাহরণ ও গল্প উপস্থাপন করতে হবে।
- এই পদ্ধতিকে ফলপ্রসূ করতে হলে শিক্ষককে যথার্থ প্রস্তুতি সহকারে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ ও পাঠদান কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন করতে হবে।

বক্তৃতা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ

- বক্তৃতামূলক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান সবচেয়ে কম ব্যয় সাপেক্ষ। কারণ, শিক্ষকের মৌখিক বিবৃতিকে সম্বল করেই এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা হয়।
- উন্নয়নশীল দেশের আর্থিক সংগতি সীমিত কিন্তু শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশী। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি বলেই বক্তৃতামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।
- আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হলে পাঠসহায়ক যে সমস্ত মূল্যবান উপকরণ সরবরাহ করা আবশ্যক তা উন্নয়নশীল দেশসমূহের পক্ষে সরবরাহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এজন্য বক্তৃতামূলক পদ্ধতির ওপর নির্ভর করতে হয়।

বক্তৃতা পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ

- বক্তৃতা পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি এই যে, এতে শিক্ষার্থীর একটি মাত্র ইন্দ্রিয়(শ্রবণ) সক্রিয় থাকে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার অভাব ঘটে। শ্রেণিকক্ষে নিষ্ক্রিয়ভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকার বক্তৃতা শুনে তারা পাঠের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তাই নিরবতা অবলম্বন করলেও শ্রেণিপাঠে তারা মনোযোগী থাকে না।
- এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সক্রিয় নিরবতার অভার ঘটে। সক্রিয় নিরবতা বলতে আমরা বুঝি শিক্ষর্থীগণ কর্তৃক মনোযোগের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকার বক্তব্য শ্রবণ এবং তার মর্মার্থ অনুধাবন করা। এতে শ্রেণি পাঠের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।
- এই পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠদান করতে হলে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে কঠোর মনোভাবের পরিচয় দিতে হয়, অন্যথায় শ্রেণি শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও অনুকুল পরিবেশ বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।
- বক্তৃতা পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার সময় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে মাঝে মাঝে ভাবের আদান প্রদান করা সম্ভব হয়ে উঠে না। পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর কাছে সহজবোধ্য না হলে তাদের মনে নানা প্রশ্নের ভীড় জমে। শ্রেণিকক্ষে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি থাকায় তারা শিক্ষককে প্রশ্ন করার সুযোগ পায় না।
- এই পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠ দানের ক্ষেত্রে উন্নত মেধা ও ক্ষীণ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের প্রতি শিক্ষকের নজর দেওয়া সম্ভব হয় না । তাছাড়া বক্তৃতাদান পদ্ধতি অনুসরণে অনেক সময় শিক্ষকের উদ্ভাবন শক্তি স্তিমিত হয়ে পড়ে, যা শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে সহায়ক নয়।

আলোচনা পদ্ধতি (Discuss Method)

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে রেখে কোন একটি সমস্যার সমাধান বের করার জন্য পারস্পরিক আলোচনায় লিপ্ত হয়। তারা সমস্যাটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মত বিনিময় করে তথ্য সংগ্রহ করে। সমস্যার স্বরূপ ও পরিধি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করার পর দায়ী কারণগুলো সনাক্ত করে। সবদিক বিবেচনার পর তারা সম্ভাব্য সমাধানের পথ খুঁজে বের করে। শিক্ষার্থীরা মুখোমুখি বসে স্বাধীনভাবে আলোচনা করলেও সমস্ত আলোচনা শিক্ষক-শিক্ষিকা বা দলনেতা কর্তৃক পরিচালিত হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজের চেষ্টায় শিখতে পারে। আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বই-পুস্তক সংগ্রহ করে এবং পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জেনে নিতে তৎপর হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকা পাঠ্যবিষয় সংশ্লিষ্ট সহায়ক গ্রন্থাবলীর তালিকা সরবরাহ করতে পারেন। যেমন-হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের কোন সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষক বিভিন্ন হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের লেখকের বইয়ের নাম বলে দিবেন। পাঠ্য বিষয়টি দীর্ঘ হলে শিক্ষক বিষয়টিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে দিতে পারেন। শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভিক্ত হয়ে আলোচনায় অংশ নেবে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব মতামত দানের সুযোগ ঘটে এবং নিজের চেষ্টায় জ্ঞান অর্জন করার ফলে তা স্থায়ী হয়।

আলোচনা পদ্ধতি প্রধানত দু'ধরনের। যথা-১. অনানুষ্ঠানিক এবং ২. আনুষ্ঠানিক।

আনুষ্ঠানিক আলোচনাকে আবার কয়েকটিভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-

ক. প্যানেল আলোচনা

খ. বির্তক

গ. সিম্পোজিয়াম

ঘ. সেমিনার

ঙ. গোলটেবিল বৈঠক

- **অনানুষ্ঠানিক আলোচনা-** অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ পূর্ব নির্ধারিত কোন রুটিন বা বিধি নিষেধ ছাড়াই কোন সমস্যা বা বিষয় নিয়ে স্বাধীন বা খোলামেলাভাবে আলোচনা করতে পারে। এখানে শিক্ষক নিজেই উদ্যোগী হয়ে নেতৃত্ব দেন এবং শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তাব রাখেন। আলোচনার বিষয়বস্তু যাতে কোন একটি উদ্দেশ্য পূরণের দিকে ধাবিত হয় শিক্ষক সে দিকে সচেষ্ট থাকেন। অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় শিক্ষক যেমন প্রশ্ন করতে পারেন, তেমনি শিক্ষর্থীরাও প্রশ্নের মাধ্যমে আলোচনাকে সজীব ও প্রাণবন্ত রাখতে পারে।
- **আনুষ্ঠানিক আলোচনা**-আনুষ্ঠানিক আলোচনা পদ্ধতিতে আগে থেকেই পরিকল্পনা গ্রহণ, নীতি নির্ধারণ, বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং আলোচনার জন্য দল গঠন নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং শিক্ষক মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তবে

আলোচনাকে ফলপ্রসূ ও প্রাণবন্ত করার জন্য শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান একান্ত দরকার। নিচে কয়েক ধরনের আনুষ্ঠানিক আলোচনা তুলে ধরা হলো-

- **প্যানেল আলোচনা**-প্যানেল আলোচনায় বিষয়বস্তু আগে থেকেই শিক্ষক ঠিক করে দেন বা ঘোষণা দেন। এর পর তিনি কয়েকজন শিক্ষার্থী নিয়ে একটি প্যানেল গঠন করেন। প্যানেলে একজন শিক্ষার্থীকে দলনেতা নির্বাচন করা হয়। শিক্ষক থাকেন প্যানেলের সভাপতি। প্যানেলের সদস্যবৃন্দ শিক্ষার্থীদের সামনে উপবিষ্ট হয়ে বিষয়বস্তুটি পরস্পরের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে। অপরাপর শিক্ষার্থীরা তা মনোযোগ দিয়ে শোনে। আলোচনা শেষে শিক্ষার্থীরা প্যানেলের সদস্যদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। এভাবেই সমস্ত আলোচনাটি এগিয়ে যায়। আলোচনা যাতে নির্ধারিত সময়ে শেষ হয়, সেদিকে অবশ্যই শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হবে। সবশেষে শিক্ষক আলোচিত বিষয়ের একটি সারাংশ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরেন।
- **বিতর্ক** - বিতর্ক পদ্ধতিতে আলোচনার শুরুতে শিক্ষক বিষয়বস্তুটিকে সমস্যা বা প্রস্তারের আকারে পেশ করেন। শিক্ষার্থীরা প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে দু'টি দলে বিভক্ত হয়। দু'দলে দলনেতা থাকে। দু'দলের প্রত্যেকটি সদস্য নিজ নিজ মতামত শ্রেণির সামনে তুলে ধরে একে অন্যের যুক্তি খন্ডনের চেষ্টা করে। শিক্ষক এখানে স্পীকারের ভূমিকা পালন করেন। বির্তক পদ্ধতিতে প্রত্যেক বক্তার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে।
- **সিম্পোজিয়াম**-প্যানেল আলোচনার সঙ্গে সিম্পোজিয়ামের পার্থক্য হল, নির্বাচিত কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীকে নির্বাচিত বিষয়ের উপর প্রবন্ধ লেখার দায়িত্ব দেওয়া হয। এক্ষেত্রে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে সারা বছর যেন সকল শিক্ষার্থীই প্রবন্ধ লেখার সুয়োগ পায়। প্রবন্ধ লেখকরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রবন্ধ পাঠ শেষ করে। এরপর চলে প্রশ্ন উত্তরের পালা। শ্রেণির অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তাদের প্রশ্ন করে এবং তারা প্রশ্নের উত্তর দেয়। এই পদ্ধতির সুফল হল প্রবন্ধ লেখার জন্য যেমন শিক্ষার্থীরা প্রচুর বইপত্র পড়াশোনা করে, তেমনি অধিক প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যে অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও পড়াশুনা করে। যেহেতু এখানে নির্বাচিত বিষযের উপর একাধিক মতামত গৃহীত হয়, সেহেতু নির্বাচিত বিষয় সম্পর্কে সকল শিক্ষার্থী পরিপূর্ণ ধারনা লাভ করে।
- **সেমিনার**-সেমিনার আলোচনা মূলত: কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের জন্য প্রযোজ্য। এখানে গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করা হয় ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনার ব্যবস্থা থাকে। প্রশ্ন উত্তর ও আলোচনার বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করার জন্য এক বা একাধিক প্রতিবেদক থাকে।
- **গোলটেবিল বৈঠক** -এ ধরনের বৈঠকে শিক্ষকের ডানে, বামে এবং সামনে শিক্ষার্থীরা অর্ধচন্দ্রাকারে বসে ও সকলেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। শিক্ষকের ডানে এবং বাম পাশের দু'জন শিক্ষার্থী আলোচনার রিপোর্ট বা প্রতিবেদন তৈরি করে।

আলোচনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

- আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ই অংশগ্রহণ করে থাকেন।
- এটি দল ভিত্তিক আলোচনা প্রক্রিয়া।
- এতে শিক্ষার্থীরা নিজের মতমত প্রকাশ করতে পারে।
- এতে শিক্ষক আলোচনার বিষয়বস্তু এবং দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।
- আলোচনায় অংশগ্রহণের পূর্বে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করা হয়।
- শিক্ষার্থী নিজস্ব চিন্তা- চেতনায় বিষয়বস্তুর পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি তৈরি করে।
- আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ থাকে।
- শিক্ষক আলোচনায় সার্বিক নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন।
- সামনা-সামনি যে কোন তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়ে থাকে।
- নির্ধারিত কার্যক্রমের পূর্বে প্রস্তুতি বা পূর্ব পরিকল্পনা সম্পন্ন হয়ে থাকে।

আলোচনা পদ্ধতির সুফল

- এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভরশীল হতে হয় না। বিষয়জ্ঞান গভীর না হলে আলোচনায় অংশগ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।
- এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা নগণ্য, শিক্ষার্থীদের ভূমিকাই প্রধান। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক কেবলমাত্র পথ প্রদর্শকের দায়িত্ব পালন করে।
- এই পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষের শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের উপর বর্তায় বলে শিক্ষকের সরাসরি এই দায়িত্ব পালনের জন্য মাথা ঘামাতে হয় না।

আলোচনা পদ্ধতির ত্রুটিসমূহ

- বিভিন্ন বিষয়ের পঠন-পাঠনের জন্য দৈনন্দিন নির্ধারিত ৩০-৪০ মিনিট সময়ের মধ্যে আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠদান সম্ভবপর নয়।
- আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠদানের জন্য যে ধরনের উন্নতমানের গ্রন্থাগারের প্রয়োজন তা আমাদের দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই।
- এই পদ্ধতি উন্নত মেধার শিক্ষার্থীর জন্য উপযোগী হলেও মাঝারি ও নিম্ন মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য ফলদায়ক হয় না। কেননা তারা যথাযথভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।
- স্বশিক্ষিত হওয়ার প্রবণতা ও মানসিকতা অনেক শিক্ষার্থীর থাকে না বলে এই পদ্ধতিতে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে, যদি শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি যথাযথভাবে মনোযোগ না দেন।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতি (Problem Solving Method)

সমস্যা সমাধান পদ্ধতি হিসাববিজ্ঞান পাঠদানের অন্যতম পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে শিক্ষাদান কালে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে আলাপ-আলোচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে একটি অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করেন। এ রকম পরিবেশে শিক্ষক সকলের অলক্ষ্যে একটি সমস্যাকে তুলে ধরেন। শিক্ষার্থীরা অনুকুল পরিবেশে সমস্যা সমাধানে এগিয়ে যান। শিক্ষক যদি সুস্পষ্ট ভাষায় সমস্যাটি শিক্ষার্থীর নিকট তুলে ধরতে পারেন তবেই এ পদ্ধতি দ্বারা হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদান কার্য আকর্ষণীয় ও কার্যকর করা যায়।

শিখন-শেখানো কৌশল হিসাবে সমস্যা সমাধান পদ্ধতির ব্যবহার সক্রেটিসের (খ্রিষ্ট পূর্ব ৪৭০-৩৯৯) সময় থেকে দেখা যায়। সক্রেটিস প্রথমে সমস্যার সৃষ্টি করতেন। পরে তার সমাধান খোঁজার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান করতেন। কিন্তু সমস্যা সমাধান পদ্ধতির বিজ্ঞান ভিত্তিকরূপ পায় ডিউইর (John Dewey 1859-1952) সময়ে।

ডিউইর মতে মানুষের চিন্তাশক্তি বা বুদ্ধির মূল্য অসাধারণ। এই বুদ্ধি আমাদেরকে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি সাধনে সহায়তা করে। ডিউই চার ধরনের বুদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে চতুর্থ বা উচুস্তরের চিন্তা বা বুদ্ধিকে মননমূলক (Refleective) বলা হয়েছে। এই মননমূলক চিন্তা বা বুদ্ধি আমাদের জীবনে সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে। জীবন অভিজ্ঞতার অপর নাম সক্রিয়তা।

ডিউই বলেন,মানুষ তার সক্রিয়তা দ্বারা পরিবেশের উপর প্রতিক্রিয়া করে। মানুষ কোন সমস্যায় পড়লে প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করার জন্য বা সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন তথ্য বা সংবাদ সংগ্রহ করে। অনেকগুলি তথ্য থেকে শক্তিশালী ধারনা কে সমস্যা সমাধানে উপায় হিসেবে নির্বাচন করে। এরপর বাস্তবে প্রয়োগের পর এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করে। ডিউই এভাবেই সক্রিয়তা তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে সমস্যা পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মনের শিক্ষার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় হল মনের সামনে সমস্যার উপস্থিতি এবং সেই সমস্যার সমাধানের জন্য মনকেই সুযোগ ও স্বাধীনতা দেওয়া।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল,"শিক্ষাই জীবন, জীবনই শিক্ষা"। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মানুষ সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে সে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। সমস্যার সমাধান প্রক্রিয়ায় মানুষ অভ্যস্ত হলে জীবন সমস্যার সমাধান তার পক্ষে সহজ হয়। এই প্রক্রিয়ায় মানুষকে অভ্যস্ত করতে হলে সমস্যা পদ্ধতিকে শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। সমস্যা সমাধান পদ্ধতির মূল কথা হল শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক আলাপ আলোচনা, কথাবার্তার মাধ্যমে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। এই পরিবেশে সবার অলক্ষ্যে তিনি সমস্যাটির সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন। পরিবেশ ও প্রস্তাবনা সঠিক হলে শিক্ষার্থীরা স্বত:স্ফূর্তভাবে সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে আসবে। তবে সমস্যা এমন হওয়া উচিত যার সঙ্গে শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য আছে এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অনুকুল পরিবেশ বিরাজ করছে। অনুকুল পরিবেশে শিক্ষার্থী সমস্যাটিকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করবে।

সমস্যা সমাধানের স্তর

সমস্যা সমাধানের স্তরগুলি হল-

- **প্রস্তুতি :** প্রস্তুতি স্তরে শিক্ষকের দায়িত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সামনে সমস্যাটি এমনভাবে তুলে ধরবেন যাতে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারেন যে সমস্যাটি তাদের কাছে সমাধানের জন্য প্রদান করা হয়েছে।
- **পরিকল্পনা :** দ্বিতীয় স্তরে শিক্ষার্থীরা সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সমস্যা সমাধনের সুবিধার জন্য শিক্ষার্থীরা নিজেদের কয়েকটি দলে ভাগ করে তথ্য সংগ্রহ এবং সংগৃহীত তথ্যগুলি সুসজ্জিত করার দায়িত্ব পালন করে।
- সমাধান বা সিদ্ধান্ত: তৃতীয় স্তরে শিক্ষার্থীরা সমস্যা সমাধানের কর্ম প্রচেষ্টায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
- সিদ্ধান্ত বিষয়ে পুনর্বিবেচনা : সবশেষে শিক্ষার্থীরা উপনীত সিদ্ধান্তসমূহের পুনঃপরীক্ষা করে কর্মসম্পাদন করে থাকেন।

এ পদ্ধতিতে শিক্ষক সব সময় প্রস্তুত থাকবেন কারণ যে কোন সময় শিক্ষকের পরামর্শের প্রয়োজন হতে পারে।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে শিক্ষকের করণীয়

- শিক্ষক সমস্যাটি শিক্ষার্থীদের সামনে স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরবেন।
- শিক্ষক সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জেনে শিক্ষার্থীদের জানাবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবেন।
- সিদ্ধান্তগুলো মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক সর্বদা শিক্ষার্থীদের প্রেরণা যোগাবেন।
- সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সময় আগে থেকেই বরাদ্দ করে দিবেন।
- বরাদ্দকৃত সময়ের মধ্যে সমস্যা সমাধান করার জন্যই শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির সুবিধাসমূহ

- মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত জীবনে নানা রকম সমস্যা থাকে। সমস্যা সমাধান পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধান করতে সাহায্য করে।
- সমস্যা সমাধনের বিষয়টি বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে সম্পাদন করা হয়। এর দ্বারা শিক্ষার্থী যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তা পরবর্তী জীবনে কাজে লাগে।
- সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী সমস্যার গভীরতা ও সমস্যা চিন্তা করার ফলে বাস্তব জীবনের সর্বক্ষেত্রে চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটে।
- এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে রিপোর্ট তৈরি ও তা উপস্থাপন করতে হয়। এতে শিক্ষার্থীর রিপোর্ট তৈরির দক্ষতা এবং কথা বলার দক্ষতা বাড়ে।
- সমস্যা সমাধান পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে নানা রকম সমস্যার সাথে পরিচয় ঘটায়। এতে শিক্ষার্থী তার বাস্তব জীবনের সমস্যাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে এবং তা সমাধানের চেষ্টা করতে পারে।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ

- এই পদ্ধতির একটি বড় অসুবিধা হল, শিক্ষার্থীরা পুঁথিগত বা তত্ত্বগত শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে শ্রেণিকক্ষে বক্তৃতা শোনা বা বই পড়ার আগ্রহ কমে যায়।
- এই পদ্ধতিতে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের সকল বিষয়বস্তু পাঠদান করা যায় না।
- সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে পাঠদান করলে সময়ের বেশি প্রয়োজন হয়।
- এই পদ্ধতিতে পাঠদানে দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষকের প্রয়োজন হয়।

প্রকল্প পদ্ধতি (Project Method)

প্রকল্প পদ্ধতি কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাদান ও শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তি প্রয়োগ করে বাস্তব পরিবেশে কর্ম সম্পাদন করে। মূলত: জন ডিউইর প্রয়োগবাদের উপর ভিত্তি করেই প্রকল্প পদ্ধতির উদ্ভব। আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থায় ডিউইর সমস্যা সমাধান পদ্ধতি রূপান্তরিত হয়েছে প্রকল্প পদ্ধতিতে। ডিউইর শিষ্য উইলিয়াম হার্ড কিলপ্যাট্রিক প্রকল্প পদ্ধতির একটি বাস্তবরূপ দেন। ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা কোন বিষয়ের সত্যতা নির্ণয় করা এই পদ্ধতির মূল সূত্র।

শিখণ-শেখানো প্রক্রিয়ায় প্রকল্প পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নের চারটি স্তর অনুসরণ করতে হবে-

- উদ্দেশ্য (Purpose)
- পরিচালনা (Planning)
- কার্যসম্পাদন (Execution)
- মূল্যায়ন (Evaluation)

উদ্দেশ্য (Purpose) :এক বা একাধিক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কোন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। তাই শিক্ষার্থীরা কোন কার্য সম্পাদনের জন্য প্রজেক্ট বা প্রকল্প গ্রহণ করার পর তার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। কী উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রকল্পটি গৃহীত হলো তা বিশদভাবে এ স্তরে নির্ধারণ করতে হবে।

পরিচালনা (Planning) : শিক্ষকের সহায়তায় শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রকল্পটি পরিচালনার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ও ধারাবাহিক পরিবল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। অর্থাৎ গৃহীত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ধাপ চিহ্নিত করতে হবে।

কার্যসম্পাদন (Execution) : কার্যসম্পাদন স্তরকে প্রকল্প পদ্ধতির বাস্তবায়ন স্তরও বলা যায়। এই স্তরে শিক্ষার্থীরা পূর্বস্তরে গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যসম্পাদন করার প্রয়াস চালায়। এই স্তরে শিক্ষকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কার্যসম্পাদনে কোন অসুবিধা দেখা দিলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। এই স্তরে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর উপর যথাযথ জ্ঞান অর্জন করে।

মূল্যায়ন(Evaluation) : এ স্তরের উদ্দেশ্য হলো কার্যসম্পাদন স্তরে প্রাপ্ত জ্ঞানকে মূল্যায়ন করা। অর্থাৎ উদ্দেশ্য স্তরে গৃহীত উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হলো অথবা উদ্দেশ্য অর্জনে কী কী অসুবিধা বা সমস্যা চিহ্নিত হলো তা মূল্যায়ন করা।

প্রকল্প পদ্ধতি প্রয়োগ কৌশল (কারখানা পরিদর্শন)

সাধারণত এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাহিরে ব্যবসা বা শিল্প বা কলকারখানা পরিদর্শন করে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করানো হয়। কারখানা পরিদর্শনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকে প্রকল্প পদ্ধতিতে নিম্নলিখিতভাবে কাজ করানো হয়-

- শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করতে হবে এবং দলভিত্তিক কাজ দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে সংগঠিত করতে হবে।
- শিক্ষকের পরামর্শ অনুযায়ী শিক্ষার্থী কর্তৃক নির্দিষ্ট প্রকল্প নির্বাচন করে প্রতি দলে শিক্ষার্থীরা কী কাজ করবে তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে।
- নির্বাচিত প্রকল্পের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকের সহায়তায় কার্য সম্পাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। শিক্ষার্থীদেরকে স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য শিক্ষক তাদেরকে উৎসাহিত করবেন যেন তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করে কাজে অগ্রসর হয়।
- গৃহীত পরিকল্পনা মোতাবেক কার্যসম্পাদনের প্রয়াস চালাতে হবে।
- কার্যসম্পাদনের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত ফলাফল মূল্যায়ন করতে হবে।

এসব কাজশেষে প্রকল্পের উদ্দেশ্য যাচাই করতে হবে।

প্রকল্প পদ্ধতির উপযোগিতা

- প্রথমত: প্রকল্প পদ্ধতি শিখন বা শিক্ষালাভের সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকল্পের মধ্যে আছে প্রস্তুতির সূত্র, অনুশীলনের সূত্র এবং ফললাভের সূত্র। প্রকল্প পদ্ধতিতে তাই শিক্ষার্থীরা আগ্রহ সহকারে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। বারবার চেষ্টার মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করে এবং সাফল্য থেকে পরিতৃপ্তি লাভ করে।
- দ্বিতীয়ত: প্রকল্পের তিনটি ধাপে শিক্ষার্থীর মনন, চিন্তন, কর্ম সম্পাদন ও অনুধাবন শক্তির বিকাশ সাধিত হয়। প্রকল্প নির্বাচন, উদ্দেশ্য নির্ধারণ, কর্ম সম্পাদন, সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে যথেষ্ট চিন্তাশীল হতে হয়।
- তৃতীয়ত: প্রকল্প পদ্ধতিতে একটি সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গণতান্ত্রিক উপায়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষামূলক কর্মসম্পাদনার জন্য দল ও উপদল নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়।
- চতুর্থত: এই পদ্ধতিতে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীরা শ্রেণি পাঠের একঘেয়েমী থেকে রেহাই পায়, তেমনি গ্রন্থভুক্ত নির্জীব বিষয়ের সঙ্গে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারে। এজন্য পাঠ্য বিষয় সহজে জীবন ও কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে।

প্রকল্প ও সমস্যা সমাধান পদ্ধতির পার্থক্য

প্রকল্প ও সমস্যা সমাধান পদ্ধতির ক্ষেত্রে শরীর ও মনের ক্রিয়াশীলতার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। প্রকল্প পদ্ধতির ক্ষেত্রে শারীরিক শক্তির প্রাধান্য অধিক লক্ষ্য করা যায়। যদিও এই পদ্ধতিতে মানসিক শক্তিও ক্রিয়াশীল থাকে। সমস্যা সমাধান পদ্ধতির ক্ষেত্রে সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন, মৌলিক উপকরণাদি সংগ্রহ, বিষয়বস্তুর সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং এর পুনর্বিবেচনা ইত্যাদি ধাপগুলো নিছকই মানসিক প্রক্রিয়া। এই দুইটি পদ্ধতির মৌলিক পার্থক্য প্রসঙ্গে বলা যায়, প্রকল্প হল ব্যবহারিক আর সমস্যা সমাধান পদ্ধতি হল মানসিক সমাধান।

৪.৩ :অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি

শিক্ষকের অন্যতম কাজ হল শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা। এসব কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে শিক্ষক বিভিন্ন রকমের পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করে থাকেন। এসব পদ্ধতি বা কৌশলগুলোকে প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়।

ক.শিক্ষককেন্দ্রিক বা গতানুগতিক পদ্ধতি বা কৌশল

খ. শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক বা আধুনিক পদ্ধতি বা কৌশল

শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক বা আধুনিক পদ্ধতি বা কৌশলগুলোকে অংশগ্রহণ মূলক পদ্ধতি বা কৌশল বলা হয়। অংশ গ্রহণমূলক পদ্ধতি বা কৌশল হল পাঠদান-গ্রহণের একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। শিক্ষক পাঠদান-গ্রহণ কার্যক্রম পরিচালনার সময় প্রত্যেক শিক্ষার্থী একক অথবা দলগতভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া সৃষ্টি, পরস্পর মতবিনিময়, সহযোগিতা প্রদান ও আলাপ অলোচনায় অংশগ্রহণ করে। শিক্ষনীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পাঠ আয়ত্ত করার এরূপ পদ্ধতিকে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক বা আধুনিক পদ্ধতি বা কৌশল বলা হয়।

হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি বলতে শ্রেণি শিক্ষণের এমন কতকগুলো পদ্ধতিকে বোঝায়, যে সমস্ত পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রেণিতে সকল শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণের মাধ্যমে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট সমস্যা সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা, মত বিনিময়, আলাপ-আলোচনা এবং পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতার মাধ্যমে পাঠে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

শ্রেণিতে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে পাঠদানের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাইয়ের মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম শুরু করবেন এবং পাঠদানের সাথে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে সরাসরি পাঠের সাথে সম্পৃক্ত করে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন ও বিষয়বস্তুর বাস্তব ভিত্তিক ধারণা দেবেন। এটিই এই পদ্ধতির মূল কথা। একাধিক পদ্ধতির সংমিশ্রনে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির সৃষ্টি। এই সকল পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন কাজে বা আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেমন- একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ,মাথা খাটানো,মাইন্ড ম্যাপিং, দলগত আলোচনা, সতীর্থ শিক্ষণ, তুষার বল, মাছবাটি, আটার রোলে বাদাম সাজানো, পোস্ট বক্স ইত্যাদি ।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের কাজ শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে পাঠে অংশগ্রহণের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করা। শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের কাজ দিয়ে সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য ইতিবাচক ইঙ্গিত প্রদান, শিক্ষার্থীদের কাজে বা আলোচনায় ধরে রাখা, প্রশংসা বা উৎসাহমূলক উক্তির মাধ্যমে তাদের উদ্দীপনা দান করা। অতএব আমরা বলতে পারি, যে সকল পদ্ধতির মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর পাঠে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় তাকেই অংশগ্রহণমুলক শিখন-শেখানো পদ্ধতি বলে।

একক কাজ (Individual work) : শিক্ষক শ্রেণি পাঠদানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নির্দেশনা দিয়ে এককভাবে চিন্তা, অনুভুতি, কথাবলা ও কাজ করার সুযোগ করে দিয়ে থাকেন একেই বলে একক কাজ। হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট সমস্যা যখন প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজে নিজে করেন তখন তাকে একক কাজ বলে। নির্দিষ্ট সমস্যার আলোকে শিক্ষার্থীর চিন্তার বিকাশ সাধন, মাথা খাটানো, ব্যক্তিগত দক্ষতার উন্নয়ন ইত্যাদি হল একক কাজের ফলাফল। হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষার্থীই আলাদা-আলাদাভাবে অংক কষা বা হিসাববিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানে কাজ করে। এটাই একক কাজের উদাহরণ।

জোড়ায় কাজ (Pair work) : যে কোন সমস্যা চিহ্নিত করে প্রশ্নের ধারণা স্পষ্ট করার জন্য দু'জন করে শিক্ষার্থীর দল গঠন করে চিন্তা ভাবনা করা কিংবা মত বিনিময় করে সঠিক উত্তর বের করার কৌশলকে জোড়ায় কাজ বলে। তবে কার সাথে কে জোড়া বাঁধবে তার জন্য নিম্নোক্ত কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে-

- পাশাপাশি বসা দু'জন শিক্ষার্থীর জোড়া
- ছোট ছোট কাগজে ফুল বা ফলের নাম লিখে পরিকল্পিতভাবে একই ফুল বা ফলের নাম সরবরাহ করে লটারীর মাধ্যমে একই ফুলের নাম বিশিষ্ট বা একই ফলের নাম বিশিষ্ট দুই জন শিক্ষার্থীর জোড়া হতে পারে।
- রোল নম্বর অনুযায়ী ১ এবং ২ জোড়া, ৩ এবং ৪ জোড়া, এভাবে জোড়া হতে পারে।
- রোল নম্বর অনুযায়ী ১ এবং ৩ জোড়া, ২ এবং ৪ জোড়া, এভাবে জোড়া হতে পারে।
- পোশাকের বৈশিষ্ট্য দেখে জোড়া হতে পারে।

দলগত কাজ (Group Work) : পাঠদানের যে কোন বিষয়বস্তু থেকে অনেকগুলো প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে একত্রে বসিয়ে প্রত্যেক দলে এক বা একাধিক প্রশ্ন অথবা পরীক্ষা নিরীক্ষা কিংবা পর্যবেক্ষণের কাজ সরবরাহ করে দলগত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রশ্নের সঠিক উত্তর বের করার কৌশলকে দলগত কাজ বলে। যেমন: হিসাববিজ্ঞানে দলগত কাজ হিসেবে একটি অশুদ্ধ রেওয়ামিলে কী কী ভুল আছে তা চিহ্নিত করতে বলা। তবে দল গঠনে কিছু শর্ত থাকে। যেমন-

- নির্দেশনার মাধ্যমে মেধাবী-স্বল্পমেধাবী, অগ্রসর-অনগ্রসর, পুরুষ-মহিল ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে দল গঠন করা যেতে পারে।
- নামের আদ্যাক্ষর একই দেখে ৫/৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে একই দলের সদস্য বানানো যেতে পারে।
- বিভিন্ন রং-এর কাগজের টুকরা করে বাক্সে ফেলে লটারীর মাধ্যমে একই রং-এর কাগজ উত্তোলনকারীগণ একই দলের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবে।
- টুকরো কাগজে নদী, মাছ, পাখি, ফুল, ফল ইত্যাদির নাম লিখে পরিকল্পিতভাবে লটারী করে একই নাম বিশিষ্ট শিক্ষার্থীদের একই দলের সদস্য বানানো যেতে পারে।

দলগত কাজের সুবিধাসমূহ

- দলীয় আলোচনায় কোন সমস্যার সঠিক এবং উত্তম সমাধান পাওয়া যেতে পারে।
- শিক্ষার্থীরা আলোচনার মাধ্যমে অধিক তথ্যের আদান প্রদান করতে পারে।
- শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে মতামত প্রদানের সুযোগ পায় বলে তাদের চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটে।
- সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।
- অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ, সহনশীলতা,সহমর্মিতা, সহযোগিতা, গণতান্ত্রিক, সহানুভুতি এবং নেতৃত্বের গুণাবলী বিকশিত হয়।

দলগত কাজের অসুবিধা

- দলের মধ্যে অধিক মত সৃষ্টির ফলে গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে দলের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে।
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দলগত কাজ শেষ নাও হতে পাারে।
- মত ভিন্নতার কারণে আলোচনার গতিপথ পরিবর্তন হতে পারে।
- দলের সকলের সমানভারে অংশগ্রহণ নিশ্চিত নাও হতে পারে।
- পারস্পরিক প্রভাব বিস্তার নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হতে পারে।

মাথা খাটানো (Brain Storming) : বিষয়বস্তু সংক্রান্ত কোন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদেরকে গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান বের করার চিন্তামূলক পদ্ধতির নাম "মাথা খাটানো" বা Brain Storming . মাথা খাটানো বা চিন্তামূলক পদ্ধতি বলতে শ্রেণি শিক্ষণের এমন একটি পদ্ধতিকে বোঝায়, যে পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদেরকে ব্যক্তিগত কিংবা দলগতভাবে বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট কোন নির্দিষ্ট সমস্যা সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে সমাধান খুঁজে বের করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। শিখনকে দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকরী করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধান বের করার কাজে ব্যস্ত রেখে শ্রেণিকে কর্মতৎপর রাখে।

এ পদ্ধতিতে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর মাঝে একত্রে, দলীয়, জোড়ায় জোড়ায় এককভাবে প্রয়োগ করা যায়। শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদেরকে অত্যন্ত সফলভাবে কর্মতৎপর রাখার জন্য মাথা খাটানো পদ্ধতি খুবই কার্যকর। এ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্নমুখী চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পায়। ফলে তাদের চিন্তা ও কল্পনা শক্তি বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আর শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে কার্যকরভাবে সক্রিয় থাকে।

প্রয়োগ কৌশল : এ পদ্ধতিতে পাঠদানের জন্য শিক্ষককে নির্ধারিত বিষয়বস্তু থেকে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি ছোট ছোট সমস্যাপ্রয়োগ বা উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নে বিন্যাস করে শিক্ষার্থীদেরকে এককভাবে, জোড়ায়, দলগতভাবে কিংবা সকল শিক্ষার্থীকে একত্র করে এক সাথে মাথা খাটানো কাজে প্রয়োগ করতে হয়। শিক্ষার্থীরা তখন সমস্যা কিংবা প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর বের করার জন্য গভীর চিন্তায় মগ্ন হয় এবং পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় করে সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান বের করে। শিক্ষক তখন শ্রেণিতে ঘুরে ঘুরে সমস্যা সমাধানের প্রতি ইঙ্গিত ও উৎসাহ প্রদান করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর আদায় করার চেষ্ট করেন।

মাথা খাটানো পদ্ধতির সুবিধা

- সকলের অংশগ্রহণ ও মুক্ত চিন্তার সুযোগ সৃষ্টি করে।
- কম সময়ে অধিক ফলাফল পাওয়া যায়।
- অংশগ্রহণকারীদের সৃষ্টিশীল চিন্তায় অনুপ্রাণিত করে।
- পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া ঘটে এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ ঘটে।
- আলোচনা প্রাণবন্ত ও ফলপ্রসূ হয়।
- অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শিক্ষক অবহিত হতে পারে এবং সে অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

মাথা খাটানো পদ্ধতির অসুবিধা

- নির্দিষ্ট সময়ে বিষয়বস্তু শেষ নাও হতে পারে।
- বিষয়বস্তু সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের স্পষ্ট ধারণা না থাকলে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যাবে না।
- আলোচনা নির্দিষ্ট বিষয়ের বাইরে চলে যেতে পারে।
- অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা অধিক হলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।
- অংশগ্রহণকারীদের ধারণা সংরক্ষণের জন্য শিক্ষককে যথেষ্ট সক্রিয় হতে হয়। তা না হলে কোন মতামত বাদ পড়ে যেতে পারে।

মাইন্ড ম্যাপিং (Mind Mapping)

আমাদের চিন্তার সমন্বিত সংরক্ষণ ও পরবর্তীতে তার দর্শনযোগ্য প্রতিফলনই হলো মাইন্ড ম্যাপিং বা মানসিক মানচিত্র। অন্যভাবে বলা যায় যে, মাইন্ড ম্যাপিং হলো আমরা স্বাধীন ও বিক্ষিপ্তভাবে যা চিন্তা করি সে সব তথ্যকে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে একীভূত করার প্রক্রিয়া।

বিষয়বস্তু থেকে পূর্ব ধারণাগুলো যখন কোন ভূচিত্র বা ছক আকারে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে আমরা মানসিক মানচিত্র বা মাইন্ড ম্যাপিং বলতে পারি। অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষার্থীরা কোন কিছু অধ্যয়ন শেষে অধীত জ্ঞান ভূচিত্র বা ছক আকারে উপস্থাপন করতে পারে তাকে মাইন্ড ম্যাপিং বা ধারণা মানচিত্র বলে। একে আবার ধারণা মানচিত্র বা Concept Mapও বলা হয়। যেমন-বোর্ডে একমালিকানা ব্যবসায়ের ছবি টাঙিয়ে দিয়ে এ ব্যবসায়ের সুবিধা লিখতে বলাকেই মাইন্ড ম্যাপিং করা বুঝায়।

মাইন্ড ম্যাপিং এর প্রকারভেদ

মাইন্ড ম্যাপিং বা ধারণা মানচিত্র সাধারণত তিন প্রকার। যথা-

- পিকটোরিয়াল বা চিত্রে প্রকাশিত ধারণা মানচিত্র
- স্পাইডার বা সুক্ষ্ম ও দীর্ঘ রেখা সমন্বলিত ধারণা মানচিত্র
- চেইন বা শিকলের ন্যায় ধারণা মানচিত্র

মাইন্ড ম্যাপিং এর সুবিধাসমূহ

- শিখন স্থায়ী হয়
- বিষয়বস্তুর ধারণা স্পষ্ট হয়
- বিষয়বস্তু বিমূর্ত থেকে মূর্ত রূপ পায়
- সকল শিক্ষার্থী এতে সক্রিয় থাকে
- সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা যায়
- পাঠদান আকর্ষণীয় হয়
- অনেক বড় শিক্ষণীয় বিষয়কে সার সংক্ষেপে নিয়ে আসা যায়
- শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিতে প্রাণবন্ত রাখা যায়

মাইন্ড ম্যাপিং এর অসুবিধাসমূহ

- দুর্বল শিক্ষার্থীদেরকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা যায় না
- অনেক তথ্য বাদ পড়ার সম্ভাবনা থাকে
- শিখন পূর্ণাঙ্গ হয় না
- ভুল তথ্য আসতে পারে
- এ পদ্ধতিতে সকল শিক্ষণীয় বিষয় পাঠদান করা যায় না
- অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর ক্লাশে এ পদ্ধতি তেমন ফলপ্রসূ হয় না

৪.৪ : অনুশিক্ষণ, সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

অনুশিক্ষণ

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অণুশিক্ষণ বা Micro-Teaching একটি দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি। 'Micro' শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'Mikors'থেকে । এর অর্থ হল খুব ছোট এবং Teaching অর্থ শিক্ষাদান। পাঠের ক্ষুদ্রতম বা মৌলিক বিষয় নিয়ে চর্চা করা বা Practice করাই হচ্ছে Micro-Teaching । একটি পাঠকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে ভুল সংশোধনের মাধ্যমে পাঠদান পরিচালনাকে অনুশিক্ষণ বা Micro-Teaching বলা হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষণের সবগুলো কৌশল এক সংগে আয়ত্ত্ব না করে অনুশীলনের মাধ্যমে একটি করে কৌশল একবারে আয়ত্ত্ব করতে হয়। সুতরাং অনুশিক্ষণ এমন এক ধরনের নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থা যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট শিক্ষণ দক্ষতা বারবার অনুশীলন করে আয়ত্ত্ব করতে হয়। এ প্রসঙ্গে এ্যালেনওইভ বলেছেন"A system of controlled practice that makes it possible to be concentrated on teaching behavior and to practice teaching controlled conditions".

Mc Knight এর মতে, "মাইক্রোটিচিং হচ্ছে এমন একটি শিক্ষণ কৌশল যার মাধ্যমে বার বার অনুশীলনের দ্বারা নতুন শিক্ষণ-দক্ষতা আয়ত্ত্ব এবং পুনরায় দক্ষতাকে উন্নততর করা হয়"।

মাইক্রোটিচিং আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের একটা উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। শিক্ষাদান বিশেষ করে প্রশিক্ষণরত ভবিষ্যৎ শিক্ষকদের শ্রেণি শিক্ষাদানে বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য এ কৌশল একটা সাফল্যজনক উপায়।

'প্রচেষ্টা ও ভুল' এই পদ্ধতির অবলম্বনে এক একটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের শিক্ষা দেওয়াই হল মাইক্রোটিচিং এর প্রধান কাজ। আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীরা যেমন আচরণকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে তার ক্ষুদ্রতম অংশগুলো ধরে ধরে সমগ্র আচরণ বিশ্লেষণ করেন তেমনি শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকেও আচরণবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র পাঠদানকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে বিশ্লেষণ করে শিক্ষা দেওয়াই হল মাইক্রোটিচিং বা অনুশিক্ষণ।

অনুশিক্ষণের সুবিধাসমূহ

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অণুশিক্ষণ পদ্ধতি একটি জনপ্রিয় শিক্ষা পদ্ধতি। অনুশিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষাকে আয়ত্ত্ব করার এক সহজ পদ্ধতি। এ পদ্ধতি ব্যবহারের নিম্নোক্ত অর্জনগুলো সম্ভব হয় বিধায় এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

- অনুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠদানে ভুল সংশোধন সহজ হয়।
- সমগ্র পাঠদানকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে বিশ্লেষণ করে শিক্ষা দেয়া হয়।
- শিক্ষকের ত্রুটিগুলো সহজেই ধরা পড়ে।
- অনুশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠদানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা বেশি থাকে।
- যে কোন শিক্ষকই এই পদ্ধতি অবলম্বন করে সাফল্য ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে।
- পাঠদান ও দক্ষতা অর্জন উভয় ক্ষেত্রে সাফল্য আসে।
- অনুশিক্ষণ একটি স্বশিক্ষণ কৌশল। ফলে শিক্ষা স্থায়ী হয়।

অনুশিক্ষণের অসুবিধাসমূহ

আধুনিক যুগে অনুশিক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহারিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলেও এর কিছু অসুবিধা রয়েছে। যেমন-

- অনুশিক্ষণ পদ্ধতিটি তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।
- স্বল্প সময়ে সকল কাজ শেষ করা যায় না।
- অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ পদ্ধতি কার্যকর হয় না।
- অনুশিক্ষণ পদ্ধতি কার্যকর করতে হলে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন হয় যা অনেক ক্ষেত্রেই থাকে না।
- এ পদ্ধতিতে পাঠদানে অনেক উপকরণের প্রয়োজন হয়, যা অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি করে।

৪.৫ : অনুশিক্ষণ কৌশল বা দক্ষতাসমূহ প্রদর্শন

স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত অনুশিক্ষণের ১৪টি কৌশলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো-

- **উদ্দীপনার তারতম্য (Stimulus Variation of a lesson) :** পাঠে একঘেয়েমি ও ক্লান্তিকর অবস্থা এড়িয়ে পূর্ণ মনোযোগ লাভের জন্য বৈচিত্র্যময় উদ্দীপক ব্যবহার করতে হবে।
- **পাঠ উপস্থাপন (Presentation) :** সুন্দরভাবে পাঠ উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন।
- হিসাববিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের নিকট তাদের তাদের সামর্থ্য, রুচি, আগ্রহ, অনুযায়ী তুলে ধরাই হল পাঠ উপস্থাপন।
- **বলবৃদ্ধিকরণ বা সুদৃঢ়করণ (Reinforcement) :** শিক্ষার্থীর কাজের স্বীকৃতি দেয়া, উৎসাহ দেয়া বা পুরষ্কৃত করা এবং শিক্ষার্থীর কাজের প্রতি অসচেতন ভাব হলেও বিরূপ মন্তব্য, শাস্তি না দেয়ার প্রশিক্ষণ দেয়াই হল বল বৃদ্ধিকরণ।
- **অনুসন্ধান বা পরীক্ষামূলক প্রশ্ন উত্থাপন(Investigative Question) :** বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্ক রেখে সহজ থেকে ক্রমান্বয়ে কঠিন ও অনুসন্ধিৎসু প্রশ্ন করা।
- প্রশ্নকরণের দ্রুততা (**Fluency in Questioning) :** শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহ বাড়াতে ও পাঠের গভীরতা যাচাই করতে উচ্চ মানের প্রশ্ন করতে হবে।
- **উচ্চ মানের প্রশ্ন (Use of higher order question) :** শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহ বাড়াতে ও পাঠের গভীরতা যাচাই করতে দ্রুত প্রশ্ন করতে হবে।
- **বিভিন্নধর্মী প্রশ্ন (Different type of Question) :** চিন্তামূলক, দক্ষতামূলক, সৃজনশীলমূলক প্রশ্ন করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীর বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটে।

- **পাঠ সমাপ্তিকরণ পদ্ধতি (Closure) :** পাঠদানে শিখনফল অর্জিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করা হয় সমাপ্তিকরণ পর্বে। তাছাড়া একটি সুন্দর পরিসমাপ্তি কাজটির সাফল্য অনেকাংশে নিশ্চিত করে।
- **শিক্ষকের নিরবতা ও ভাষাহীন ইঙ্গিত (Teachers silence and non-verbal clues)** : শিক্ষক মাঝে মাঝে নিরব থেকে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুর উপর অনুভূতি ব্যক্ত করতে বলবেন।
- **মনোযোগী আচরণে স্বীকৃতি (Recognizing attending behavior)** : শিক্ষার্থীকে অবশ্যই তাদের কাজের স্বীকৃতি দিতে হবে। ভাল উত্তর বা ভাল করলে তাকে বাহবা দিয়ে উৎসাহিত করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।
- **বিশদকরণ ও উদাহরণের ব্যবহার (Illustrating and use of examples) :** পাঠের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের বোধগম্য করার জন্য বিশদ ব্যাখ্যা করতে হবে এবং প্রয়োজনে উদাহরণ ও উদ্ধৃতির ব্যবহার করতে হবে।
- **বক্তৃতা দেয়ার ভঙ্গি (Lecturing)** : শিক্ষকের বাচনভঙ্গি হবে আকর্ষণীয়। প্রয়োজনে কণ্ঠস্বর উঠা নামা করে, আবেগ মিশিয়ে পাঠ উপস্থাপন করতে হবে।
- পরিকল্পিত পুনরুক্তি(Planned Repitition) **:** পাঠের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বা উত্তরগুলো প্রয়োজনে বার বার পড়তে হবে।
- **সংযোগের সম্পূর্ণতাসাধন (Complements of communication)** : পাঠ সমাপ্তির পর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আলোচনা দ্বারা পুরো পাঠের মধ্যে একটি সংযোগ সাধন করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীর সমগ্র পাঠ সম্পর্কে ধারণা মজবুত হবে।

এর পর ক্যালিফোর্নিয়ার ফার ওয়েস্ট লাইব্রেরীতে আরও চারটি দক্ষতাসহ মোট ১৮টি দক্ষতা তালিকাভুক্ত করা হয়। সেগুলো হল-

- **শ্রবণ দর্শন উপকরণ ব্যবহার (Using Audio Visual aids) :** উপকরণের ব্যবহার পাঠকে প্রাণবন্ত করে। তাই শ্রেণি কক্ষে শ্রবণ-দর্শন উপকরণ যেমন- টিভি, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।
- **শ্রেণি কক্ষে শিক্ষকের প্রাণবন্ততা(Teacher liveliness in the classroom) :** শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে হাসি মুখে পাঠদান করবেন।
- **দলগত আলোচনায় উৎসাহব্যঞ্জক ইঙ্গিত (Prompting group discussion) :** দলগত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক ধারনা লাভ করে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের কাজ হল দলগত আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং তাদের কাজে উৎসাহ প্রদান করা।
- **শিক্ষকের ব্যাখ্যা (Teachers Explain) :** কোন কোন পাঠ শিক্ষার্থীদের নিকট জটিল বলে প্রতীয়মান হয়, তাই এ পাঠগুলো শিক্ষক সহজ ও সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করলে শিক্ষার্থীরা বেশি উপকৃত হবে।

অনুশিক্ষণ দক্ষতা আয়ত্তের কৌশল

- **প্রশ্নকরার কৌশল :** সাধারণত মুখস্থ ধরনের প্রশ্ন দ্রুততার সাথে করা যায়। কিন্তু কঠিন প্রশ্ন করতে হলে প্রথমে একটু বিরতি দিয়ে ধীরে ধীরে স্পষ্ট স্বরে প্রশ্নটি করে শিক্ষার্থীদের চিন্তা করার সুযোগ দিতে হবে।সব শিক্ষার্থীদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন উপস্থাপন করতে হবে। প্রশ্নের ভাষা হবে সহজ।

- **পাঠ ঘোষণার কৌশল :** শ্রেণিকক্ষে ঢুকেই শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন না। প্রথমে উৎসাহ সঞ্চারের চেষ্টা করবেন, তারপর জানা থেকে অজানা জ্ঞানের সূত্র ধরে পাঠ ঘোষণা করবেন।
- **উপকরণ ব্যবহারের কৌশল :** শিক্ষক উপকরণগুলো টেবিলের উপর রেখে দিবেন না। উপকরণগুলো টেবিলের ড্রয়ারে অথবা একটু আড়ালে রেখে দেবেন। শিক্ষণের সময় যখন যেটি প্রয়োজন হয় সেটি প্রদর্শন করবেন, কাজ শেষ হলে ড্রয়ারে রেখে দিবেন। একটি ক্লাসে অহেতুক অনেকগুলো উপকরণ প্রদর্শন করা যাবে না। পাঠের সাথে সম্পর্কহীন উপকরণ প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই।
- **সঠিক উত্তরদাতাকে উৎসাহ দানের কৌশল :** সঠিক উত্তর প্রদানকারীকে উৎসাহিত করতে হবে। ভুল উত্তর প্রদানকারীকে উৎসাহিত না করে সহজ ভঙ্গিতে সঠিক উত্তরটি জানিয়ে দিতে হবে। তারপর তাকে একটি সহজ প্রশ্ন করুন। এবার উত্তর সঠিক হলে তাকে দু'একটি কথা বলে উৎসাহিত করুন। উত্তর ভুল হলে বা উত্তর দিতে না পারলে কখনো নিরুৎসাহিত করবেন না।

- **বোর্ড ব্যবহারের কৌশল :** পাঠদানের সময় ব্ল্যাকবোর্ড বা হোয়াইট বোর্ডে লিখলেই বোর্ড ব্যবহার হয় না। বোর্ড ব্যবহারেরও নিয়ম আছে। যেমন বোর্ডে লিখতে হবে বড় করে যাতে শেষ বেঞ্চের শিক্ষার্থীরা পর্যন্ত তা দেখতে পায়। বোর্ডে লেখার সময় শিক্ষককে এক সাইড হয়ে অর্থাৎ ৪৫ ডিগ্রী কোণে লিখতে হবে। প্রতিটি শব্দ লেখার সাথে সাথে সুউচ্চ কণ্ঠে তা বলতে হবে।
- **উদ্দীপকের তারতম্য :** পাঠদানের সময় উদ্দীপকের তারতম্য ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বা দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। যেমন-কণ্ঠস্বরের উঠা নামা। একটা শব্দ বা লাইন জোর দিয়ে বলা, বোর্ডে যেয়ে একটা শব্দ বা লাইনের নীচে আন্ডার লাইন করে উদ্দীপকের তারতম্য ঘটানো যায়। তবে One technique cannot be isolated from other. একটা দক্ষতা বা কৌশল অন্য কৌশল থেকে আলাদা করা যায় না।

৪.৬ : সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণ/ছদ্ম শিক্ষণ(Simulation) সুবিধা ও অসুবিধা

সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণ/ছদ্ম শিক্ষণ (Simulation)

সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণ আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণের ইংরেজি নাম Simulation. ইংরেজি Simulation শব্দটি দ্বারা বুঝানো হয় Mock-up বা ভান করা। এই শিক্ষণ পদ্ধতিটি অভিনয় করার মত। শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় জন্য এটি একটি কৌশল বা পদ্ধতি। পাঠদান অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত শ্রেণির প্রকৃত শিক্ষার্থী ও প্রকৃত শ্রেণিকক্ষের পরিবর্তে কৃত্রিম শিক্ষার্থী সম্বলিত কৃত্রিম শ্রেণিকক্ষে, কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে যখন পাঠদান কার্য পরিচালনা করা হয় তখন সে পদ্ধতির নাম সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণ পদ্ধতি বা ছদ্মশিক্ষণ পদ্ধতি। যেমন-টিচার্স ট্রেনিং কলেজে পাঠদান অনুশীলন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাধ্যমিক স্কুল যখন বন্ধ থাকে অর্থাৎ স্কুলে যখন পাঠদান অনুশীলনের সুযোগ থাকে না তখন টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শ্রেণিকক্ষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থী সাজিয়ে একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে অনুশীলনী পাঠদান করেন। এ পদ্ধতির নাম সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণ পদ্ধতি বা ছদ্ম শিক্ষণ পদ্ধতি। সুতরাং ছদ্ম শিক্ষণ হচ্ছে এমন একটি সংক্ষিপ্ত কাঠামোগত ক্রিয়া যা কোন বাস্তব ঘটনাকে দুই বা ততোধিক অংশগ্রহণকারী অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করে। এতে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি ও অভিজ্ঞতা ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে এবং তাদের বাস্তবভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানের দক্ষতা উন্নয়ন হয়।

সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণের সুবিধাসমূহ

- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষার্থীদের জড়তা দূর হয়।
- বিষয়টি অনেক দিন পর্যন্ত প্রশিক্ষণার্থীদের মনে থাকে।
- এতে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষার্থীদের উপলব্ধি করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- এ পদ্ধতিতে পাঠদানে সহজে ভুল ত্রুটি ধরা পড়ে এবং তা সংশোধনের সুযোগ থাকে।
- সাদৃশ্য শিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি, যা প্রশিক্ষণার্থীদের পেশাগত প্রশিক্ষণের জন্য খুবই প্রয়োজন।
- সাদৃশ্য শিক্ষণ কৌশলটি একটি গ্রুপে সম্পন্ন হয়। একটি গ্রুপে একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের ভূমিকায় এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীরা শিক্ষার্থী ও পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালন করে। ফলে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীই পর্যায়ক্রমে পাঠদানের সকল কৌশল আয়ত্ব করতে পারে।
- পর্যবেক্ষক দল প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের সবল ও দুর্বল দিক রেকর্ড করেন এবং শ্রেণিকক্ষে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের কাছে তা বিভিন্ন উপায়ে ব্যক্ত করেন, যা তার কার্যক্রম সম্পর্কে সঠিক ফলাফল লাভ করা যায়।
- সাদৃশ্য শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষণের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকের সমন্বয় হওয়াতে প্রশিক্ষণার্থীর শিক্ষণ দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন বা উন্নয়ন ঘটানো যায়।
- নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষণ সম্পন্ন করায় প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক একদিকে যেমন শিক্ষণের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তেমনি অন্যদিকে গঠনমূলক সমালোচকের অভিজ্ঞতাও অর্জন করেন।

সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণের অসুবিধাসমূহ

- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষার্থীদের মধ্যে জড়তা কাজ করে।
- পাঠদানের ক্ষেত্রে এটি একটি কৃত্রিম পদ্ধতিবিধায় বিষয়বস্তুকে অনেক সময় বাস্তবসম্মত করে উপস্থাপন করা অত্যন্ত জটিল।
- এতে সব সময় বিষয়টিকে পরিপূর্ণভবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয় না।
- এতে ঝুঁকি থেকে যায়, কেননা পরিবেশ অনুকূল না হলে উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পরিণত হয়।
- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষার্থীদের মনোভাব পজিটিভ না হলে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক কিভাবে অংশগ্রহণমূলক শিখন-শেখানো কৌশল আয়ত্ব করার জন্য ছদ্ম শিক্ষণের কৌশল আয়ত্ত করবেন তার কিছু নির্দেশনা নিচে দেওয়া হলো-

- শ্রেণি পাঠদানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- অংশগ্রহণমূলক যে কোন কৌশলের দক্ষতা আয়ত্ত্ব করার জন্য একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। ২/৩ জন প্রশিক্ষণার্থী পর্যবেক্ষক হয়ে মূল্যায়ন ছকের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কাজটি মূল্যায়ন করবেন।
- অন্য প্রশিক্ষণার্থীগণ বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট শ্রেণির শিক্ষার্থীরূপে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- একই প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী একবার শিক্ষক সেজে, একবার পর্যবেক্ষক সেজে এবং একবার প্রশিক্ষণার্থী সেজে অংশগ্রহণমূলক শিখন-শেখানো কৌশলগুলো আয়ত্ত্ব করতে শিখবেন।
- অধিবেশন শেষে সবার মূল্যায়ন ছকসহ দলগত আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের সবল দুর্বল দিক চিহ্নিত করবেন।

৪.৭ : ফলাবর্তন, ফলাবর্তন কার্যকর করার কৌশল, ফলাবর্তনের সুবিধাসমূহ

ফলাবর্তন

শিক্ষার্থীকে তার শিখন প্রক্রিয়ায় সাহায্যকারী তথ্য প্রদান বা পরামর্শ দেওয়াকে ফলাবর্তন (Feedback)বলে। গৃহীত পরিকল্পনা কতটুকু কার্যকর ও কতটুকু লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হলো তা নিরূপণের জন্য ফলাবর্তন প্রয়োজন। এতে করে শিক্ষার্থীর সমস্যা এবং শিক্ষকের পাঠ অগ্রগতির ধারা ও সমস্যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। শিখনকে গতিশীল, আনন্দ মুখর, বাস্তবমুখী করতে ফলাবর্তন জরুরী।

শিক্ষার্থীকে তার শিখন প্রক্রিয়ায় সাহয্যকারী তথ্য প্রদান বা পরামর্শ দেয়াকে ফলাবর্তন বা Feedback বলে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সবল ও দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করে কীভাবে দুর্বলতাসমূহ দূর করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দেয়া এবং সে আলোকে ব্যবস্থা নেয়াকে ফলাবর্তন বলা হয়। ফলাবর্তন লিখিত বা মৌখিক দু'ভাবেই হতে পারে।

ফলাবর্তন কার্যকর করার কৌশল

ফলাবর্তনকে কার্যকর করতে হলে নিম্নোক্ত কৌশল অবলম্বন করতে হবে-

ক.ফলাবর্তন অবশ্যই গঠনমূলক হবে।

খ. ফলাবর্তনের বিষয় নির্ধারণ করতে হবে।

গ. প্রশিক্ষণার্থীদের ছোট ছোট দলে (৬/৮জন) ভাগ করে ফলাবর্তন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।

ঘ. প্রত্যেক দলে প্রয়োজনীয় কাগজ, কলম ইত্যাদি দিবেন যাতে ফলাবর্তন লিখে রাখতে পারে।

ঙ. গঠনমূলক ফলাবর্তনে কী কী করণীয় তার একটি তালিকা তৈরি করতে হবে।

ফলাবর্তন দেওয়ার জন্য শিক্ষককে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে

- শিক্ষার্থীর দুর্বলতাগুলোর উপর গুরুত্ব না দিয়ে তার সবল দিকগুলো উপস্থাপন করে তার প্রশংসা করা।
- দুর্বল দিকগুলো আস্তে আস্তে নিরুৎসাহিত করা।
- শিক্ষকের মন্তব্য হবে সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট ও বোধগম্য।
- শিক্ষার্থীকে এমনভাবে ফিডব্যাক দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর প্রেষণা, আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং যার ফলে ভুল ধারণা সম্পর্কে তার উপলব্ধি জন্মে এবং সে তা শুধরে নিতে পারে।
- শিক্ষার্থীকে সরাসরি আঘাত দিয়ে ফিডব্যাক দেওয়া যাবে না।
- শিক্ষকের মন্তব্যগুলো শিক্ষার্থীর খাতায় বা উত্তরপত্রে লেখা হলে শিক্ষার্থী সহজেই তা দেখতে পাবে এবং শিখন প্রক্রিয়ায় সে নিজেকে সেভাবে পরিচালিত করতে পারবে।
- সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ফিডব্যাক প্রদানের জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পৃথক পৃথকভাবে তাদের কাজ নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং পরামর্শ দিতে হবে।
- কখনই কম পারদর্শিতার জন্য শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বে আঘাত দিয়ে কোন মন্তব্য করা যাবে না।

ফলাবর্তনের সুবিধাসমূহ

যে কোন প্রশিক্ষণার্থীর পাঠ উপস্থাপনে কিছু না কিছু সমস্যা থাকতে পারে। এ সকল সমস্যা কটিয়ে ওঠার জন্য স্ব-মূল্যায়ন, সতীর্থ ফলাবর্তন অথবা পর্যবেক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত ফলাবর্তন বা মতামত প্রয়োজন। উক্ত মতামত বা ফলাফলের উপর ভিত্তি করে উপস্থাপনকারী শ্রেণিকক্ষের যাবতীয় কার্যাবলীর উন্নয়ন এবং তার নিজের পাঠদান উন্নয়ন করার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ নিবেন। অনেক সময় শিক্ষক তার নিজের ভুল-ভ্রান্তি বুঝতে পারেন না। তাই ফলাবর্তন একজন নতুন শিক্ষকের জন্য অতীব প্রয়োজন। ফলাবর্তনের সুবিধাসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল-

- ফলাবর্তন প্রশিক্ষণের একটি জরুরী বিষয়। ফলাবর্তন নিয়ে প্রশিক্ষক নিজেকে উন্নত করতে পারেন, প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উন্নয়ন করা সম্ভব হয় ঠিক তেমনি প্রশিক্ষণার্থীগণও তাঁদেরকে পরিবর্তন করার সুযোগ পায়। তাই প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী ও কর্মসূচির উন্নয়ন ঘটাতে হলে ফলাবর্তনের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।
- এটি একটি চলমান এবং দ্বিমুখী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষক তাঁর পাঠদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নে ক্রমাগত ভূমিকা রাখতে পারেন।
- ফলাবর্তন দেয়া যেমন সহজ, গ্রহণ করা তেমন সহজ ব্যাপার নয় এবং গ্রহণ করার মানসিকতা আমাদের অনেকেরই নেই। তাই ফলাবর্তনের মাধ্যমে নিজেকে সংশোধনের মানসিকতা সৃষ্টি হয়।
- ফলাবর্তনের মাধ্যমে পাঠ অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।
- পাঠদানের ত্রুটি/অসুবিধা সম্পর্কে জানা যায়।
- শিক্ষার্থীদের মাঝে জানার আগ্রহ ও দলগত চেতনা বৃদ্ধি পায়।
- প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় ও আন্তরিক হয়।
- আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ফলাবর্তন অত্যন্ত জরুরী। এর মাধ্যমে প্রশিক্ষক শিক্ষাদানের অর্জিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারেন।
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে কার্যকর করার জন্য ফলাবর্তনের গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোন প্রশিক্ষণার্থীর জন্যই ফলাবর্তন গুরুত্বপূর্ণ যদি তিনি ফলাবর্তনকে পজিটিভভাবে নেন।

ফলাবর্তনের অসুবিধাসমূহ

- শিক্ষককে পরিশ্রমী, দক্ষ ও অভিজ্ঞ হতে হবে।
- শিক্ষককে প্রযোজনীয় পূর্ব প্রস্তুতি নিতে হবে।
- বিচ্ছিন্ন ও অনিয়মিত অনুশীলনের ফলেফলাবর্তন ব্যাহত হয়।
- দুর্বল ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপে থাকে।

প্রশ্নমালা

১. শিক্ষণ পদ্ধতি কী?
২. শিক্ষক কেন্দ্রিক ও শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পাঠদান পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করুন।
৩. বক্তৃতা পদ্ধতি কী? বক্তৃতা পদ্ধতিতে পাঠদানের জন্য শিক্ষক হিসেবে আপনি কোন কোন কৌশল অবলম্বন করবেন?
৪. বক্তৃতা পদ্ধতি কার্যকর করার উপায়সমূহ কী?
৫. অলোচনা পদ্ধতি কত প্রকার ও কী কী?
৬. আলোচনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।
৭. কোন দার্শনিক সমস্যা সমাধান পদ্ধতির সূচনা করেন?
৮. কোন দার্শনিক সমস্যা সমাধান পদ্ধতির বিজ্ঞানসম্মতরূপ দেন?
৯. সমস্যা সমাধান পদ্ধতি কী ও এর স্তরগুলো বর্ণনা করুন।
১০. সমস্যা সমাধান পদ্ধতি বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ চিহ্নিত করুন।
১১. প্রকল্প পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কয়টি স্তর থাকে? স্তরগুলির নাম লিখুন।
১২. অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি কী? হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে পাঠ দানের জন্য কী কী অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি আছে তার বর্ণনা দিন।
১৩. হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে মাইন্ড ম্যাপিং এ পাঠদানের জন্য একটি বিষয়বস্তুর নাম লিখুন।
১৪. স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত অনুশিক্ষণের ১৪টি কৌশল উল্লেখ করুন।
১৫. অনুশিক্ষণ কী? অনুশিক্ষণের উপযোগিতাগুলো আলোচনা করুন।
১৬. অনুশিক্ষণ দক্ষতা আয়ত্তের কৌশলসমূহ বর্ণনা করুন।
১৭. সাদৃশ্যমূলক/ ছদ্ম শিক্ষণ কী? এ শিক্ষণের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা করুন।
১৮. ফলাবর্তন কী? একজন শিক্ষক হিসেবে ফলাবর্তন কার্যকর করার জন্য কোন কোন কৌশল অবলম্বন করবেন?
১৯. ফলাবর্তনের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা করুন

ইউনিট ৫ : হিসাববিজ্ঞান শিখন-শেখানো সামগ্রী /উপকরণ সংগ্রহ ও এর উন্নয়ন (Teaching Aids)

শিখনের যে কোন স্তরে পৌঁছানোর জন্য শিক্ষার্থী তার ইন্দ্রিয়ানুভূতি ব্যবহার করে। শিখনের জন্য ইন্দ্রিয়ানুভূতি ওআবেগ এই দুটি বিষয় মৌলিক। ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে জ্ঞানের প্রবেশদ্বার বলা হয়। শিক্ষার্থীর এই ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে শিক্ষা উপকরণের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যখন কোন মূর্ত বস্তু উপস্থাপন করেন তখন শিক্ষার্থীর সংগে ঐ বিষয়বস্তুর একটি মিথস্ক্রিয়া হয়। শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করে। মূর্ত বস্তুটি ভাল, মন্দ,সুন্দর, কুৎসিত, পূর্ণ, অপূর্ণ যাই হোক না কেন সে বিষয়টিকে উপলব্ধি করতে পারে। কোন শিক্ষণীয় বিষয়কে সহজে বোঝানোর জন্য উপকরণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এতে শ্রেণির কার্যক্রম সহজ হয় অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর শিখনে গতি সঞ্চার করার জন্য শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা হয়। চীনে একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে, দশ হাজার শব্দ ব্যবহার করে যা বোঝানো যায় না একটি মাত্র ভাল ছবির সাহায্যে তা বোঝানো যায়(A picture is worth than ten thousand words) ।একটি ভাল মানের ছবি অনেকবেশি কথা বলে। শিক্ষা দেয়া এবং নেয়ার কাজকে শিখন সামগ্রী অনেক বেশি সহজ করে দেয়।

এই ইউনিটের আলোচ্য বিষয়সমূহ হল-

৫.১ : শিক্ষা উপকরণ, গুরুত্ব ও ব্যবহারের নীতিমালা

৫.২ : শিক্ষা উপকরণের শ্রেণিবিভাগ, দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী ও অপ্রতুল সামগ্রী ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ, বিনামূল্যের ও স্বল্পমূল্যের শিক্ষা উপকরণ।

৫.৩ : হিসাববিজ্ঞান শিক্ষার শিক্ষা উপকরণের তালিকা প্রস্তুতকরণ ও শিক্ষা উপকরণ তৈরি

৫.৪ : অন্যান্য পাঠ্যপুস্তক, ICT উপকরণ-ভিডিও,টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ল্যাপটপ,মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর

৫.১ : শিক্ষা উপকরণ, গুরুত্ব ও ব্যবহারের নীতিমালা

শিক্ষা উপকরণ (Teaching aids)

উপকরণের চিত্র

শ্রেণিকক্ষে যে সকল সরঞ্জাম,যন্ত্রপাতি বাজিনিসপত্র ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তিকে জাগিয়ে তোলা যায়, শিখনকে আনন্দদায়ক, সহজবোধ্য, ফলপ্রসূ এবং দীর্ঘস্থায়ী করা যায় তাকে শিক্ষা উপকরণ বলে ।H.N Saunders বলেছেন,No wise man refuses help and no wise teacher ignores aid.একজন জ্ঞানীমানুষ বা বিচক্ষণ শিক্ষক কখনই শিক্ষা উপকরণের সুবিধা হাতছাড়া করবেন না ।ডা. হার্স এন্ড ড. কেকারস বলেছেন মানুষ চোখে দেখে এবং কানে শুনে শতকরা ৮৫ ভাগ শিক্ষা

গ্রহণ করে, বাকি শতকরা ১৫ ভাগ শিক্ষা গ্রহণ করে অন্য তিনটি ইন্দ্রিয়দ্বারা। শিক্ষা উপকরণের সবচেয়ে পরিচিত ও উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক,সহায়ক পুস্তকইত্যাদি।অন্যদিকে শ্রেণিতে চকবোর্ড, ডাস্টার, মডেল, নকশা, জার্নাল, গবেষণা পত্র, ম্যাগাজিনগুলোও শিক্ষা দানের কাজে সহযোগিতা করে।শিক্ষা উপকরণ শিক্ষার্থীকে কোন বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা, ধারণা বা আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। পরিশেষেশিক্ষক শিক্ষাদান কার্যক্রমকে সজীব,সুন্দর,সহজ ও স্থায়ী করার জন্য এমন কতগুলো মূর্ত জিনিস ব্যবহার করেনযা শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়সমূহকে উপযুক্তভাবে সঞ্চালিত ও সক্রিয় করতে সক্ষম হয় তাকেই শিক্ষা উপকরণ বলে।

শিক্ষা উপকরণের গুরুত্ব (Importance of Teaching aids)

শিক্ষা উপকরণের গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। শিক্ষা উপকরণ ছাড়া কখনই ফলপ্রসূ পাঠদান করা সম্ভব নয়। কারণ মুখস্থবিদ্যা বেশি দিন টিকে না। মাত্র ১৫% শিখন সম্ভব মুখস্তবিদ্যা দ্বারা, বাকিটা অসমাপ্তই থেকে যায়। এজন্য আমাদের দেশের শিক্ষার গুণগত মান অনেকটা নিচে। তাই প্রয়োজন শিক্ষাকে বাস্তবমুখী করা। এ জ্ঞান শিক্ষার্থী কখনও ভোলে না। শিক্ষকের মুখের কথার চেয়ে একটি ছবি অনেক বেশি কথা বলে, যা শিক্ষার্থী অনেক দিন পর্যন্ত মনে রাখতে পারে। আবার অনেক বিষয় আছে যা শিক্ষক ভাষা দিয়ে বোঝাতে অক্ষম, সেখানে উপকরণ অত্যন্ত প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর পঞ্চইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার পাথেয় রূপে কাজ করে। এতে শিক্ষার্থীর পাঠ গ্রহণের আগ্রহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষকের কাজেও অণুপ্রেরণা আসে। শিক্ষা উপকরণের কতিপয়উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হল-

১। **শিখন সহজ হয় (Learning is easy) :** শিক্ষা উপকরণ দ্বারা যে কোন বিষয়বস্তুকে সহজেই শিক্ষার্থীকে বোঝানো যায়।অনেক জটিল বিষয়কে শিক্ষক অতি সহজে শিক্ষা উপকরণ দ্বারা বোঝাতে পারেন যা বক্তৃতা দিয়ে সম্ভব নয়। যেমন- জাবেদা, নগদান বহি,খতিয়ান,রেওয়ামিলের ছকের বর্ণনা না দিয়ে যদি ছকগুলো উপকরণ হিসেবে দেখানো হয় তাহলে শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝতে পারবে।

২। **শিখন আনন্দদায়ক হয় (Learning is pleasant) :** যে কোন শিক্ষকের কাজ হবে শিখনে আনন্দ সৃষ্টি করা।শিক্ষার্থীরা যখন কোন বিষয় আনন্দের সাথে শেখে তারা তা কখনও ভোলে না । যথার্থ শিক্ষা উপকরণ শিক্ষার্থীকে আনন্দ দিতে সক্ষম।তাই উচিৎ শ্রেণিতে শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরী করে পাঠদান করা।

৩। **কল্পনা শক্তিকে জাগিয়ে তোলা (To raise thinking power) :** শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তিকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব। অর্থাৎ বিমূর্ত কোন জিনিসকে মূর্তরূপে দেখে বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে পারে। ফলে তার কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পায়।

৪। **শিখন স্থায়ী হয় (Learning is permanent):** বাস্তব যে কোন শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী যদি তার পঞ্চইন্দ্রিয় ব্যবহার করার সুযোগ পায় তবে শিক্ষার্থী সেই শিক্ষা কখনো ভোলে না,শিখন ফলপ্রসূ ও স্থায়ী হয়।

৫। **পাঠের প্রতি মনোযোগী করা যায় (To be attentive in lesson):** শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বৃদ্ধি করা যায়। শুধু বক্তৃতার মাধ্যমে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীরা একঘেয়েমিতে ভোগে,ঘুম আসে,শ্রেণি নিষ্ক্রিয় হবার সম্ভাবনা থাকে।কিন্তু একটি শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের কৌতুহলী করা যায়। এর ফলে তারা বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগী হয়।

৬। **বিষয়বস্তুর প্রতি স্পষ্ট ধারণা জন্মে (To grow clear conception about subject matter):** হিসাববিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে সঠিক ভাবে বোঝানোর জন্য শিক্ষা উপকরণের গুরুত্ব অপরিসীম।শিক্ষা উপকরণ একজন শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তুর প্রতি সঠিক ধারণা জন্মাতে সহযোগিতা করে।

৭। **ব্যবহারিক ফলপ্রসূতা আনে (To bring practical outcomes) :** আমরা যা শিখি বা অভিজ্ঞতা অর্জন করি তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করি। আজকের ধারনাকে আমাদের জীবনে কাজে লাগিয়ে ফলপ্রসূতা আনয়নের জন্য দরকার বিষয়বস্তুগত পরিচ্ছন্ন জ্ঞান। আর শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার আমাদের অর্জিত জ্ঞানের ব্যবহারিক ফলপ্রসূতা আনে।

৮। **শ্রেণি সক্রিয় থাকে (Class remains active):** যে শিক্ষক সর্বদা শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে ক্লাশ নেয় সেই ক্লাশের শিক্ষার্থীরা সর্বদা অপেক্ষায় থাকে শিক্ষক আজ না জানি কি উপকরণ দেখায়।অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা সব সময় কৌতুহল নিয়ে অপেক্ষায় থাকে।যার ফলে শ্রেণি সক্রিয় থাকে।

৯। **শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে (To increase inner talent of learners):** শিক্ষা উপকরণ দেখে এবং হাতে কলমে করার ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে।বিষয়বস্তু সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে।

১০। **বিমূর্তকে মূর্ত করণ (To make the abstract into the real) :** যে কোন বিমূর্ত ধারনাকে মূর্তকরণে শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারণ মূর্ত বিষয়কে দেখে শিক্ষার্থী বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে।ফলে বিষয়বস্তু শিখতে সুবিধা হয়।

১১। **অধিক শিক্ষার্থীর ক্লাশে বেশী ফলপ্রসূ হয় (To be effective in the more learners' class) :** আমাদের দেশের অধিকাংশ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশী,তাই এখানে বক্তৃতা দিয়ে বোঝান কঠিন।সুতরাং এসব ক্ষেত্রে শিক্ষক যদি উপকরণ দেখিয়ে ক্লাশ নেন শিক্ষার্থীরা উপকৃত হয় এবং শ্রেণিও সক্রিয় থাকে।

১২। **শিক্ষকের পরিশ্রম কম হয় (To less in teacher's labour) :** উপকরণ প্রদর্শন করে সহজেই শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকৃষ্ট করা যায়.যা কখনই বক্তৃতার মাধ্যমে সম্ভব নয়। এতে শিক্ষকের পরিশ্রম কম করতে হয়।

১৩। **শ্রেণির দুর্বল শিক্ষার্থীরা সবল হয় (To improve slow learners of the class) :** শ্রেণির পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা উপকরণের প্রতি বেশী আকৃষ্ট থাকে,তাই তারাওশেখার প্রতি উৎসাহী থাকে।ফলে শ্রেণি সক্রিয় রাখা সম্ভব হয়।

১৪। **সময় বাঁচে (To save time) :** শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের ফলে শিক্ষক অতি অল্প সময়েয় মধ্যে অধিক তথ্য দিতে পারেন, ফলে শিক্ষকের সময় বেঁচে যায়। তিনি সময় মত তাঁর শ্রেণির কার্য শেষ করতে পারেন। যেমন- তিনি যদি জাবেদা,খতিয়ান,রেওয়ামিল ইত্যাদির ছকগুলো উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেন তবে তাঁর অনেক সময় বেঁচে যাবে।

১৫। **শ্রেণিতে শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরি হয় (To make learning relating environment) :** শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করার ফলে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী কৌতুহলী মন নিয়ে অপেক্ষায় থাকে।যার ফলে শ্রেণিতে এক ধরনের শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরি হয়।শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষকের একটি ভাল ইমেজ সৃষ্টি হয়।ফলে পাঠদান কাজ ফলপ্রসূ হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে,শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কাজকে কার্যকর করার জন্য শিখন সামগ্রীরপ্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।শিক্ষার্থী এর দ্বারা তার পঞ্চইন্দ্রিয় ব্যবহারের সুযোগ পায়। ফলে শিখন কাজ সহজ হয় এবং স্থায়ী হয়। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ই উপকৃত হয়।তাই হিসাববিজ্ঞান শিক্ষণে শিক্ষা সামগ্রীর বাশিখন সামগ্রীরব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ।

শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের নীতিমালা (Principles of using Teaching aids)

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা উপকরণ অত্যন্ত কার্যকর একটি ব্যবস্থা। তবে এই উপকরণ ব্যবহারের কতকগুলো নিয়ম নীতি রয়েছে। এক কথায় বলা যায়,নিয়ম বহির্ভূতভাবে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করলে শ্রেণিতে নেতিবাচক ফল আসতে পারে।তাই শিক্ষকের উচিত নিয়ম মেনে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা।নিম্নে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের কতগুলো নিয়ম তুলে ধরা হল-

১। বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য রেখে সঠিক উপকরণ নির্বাচন করতে হবে।
২। উপকরণ অবশ্যই শ্রেণিসম্মত হতে হবে। অর্থাৎ শ্রেণির সবশেষ বেঞ্চের শিক্ষার্থীরাও যেন দেখতে পায়।
৩। শিক্ষক সর্বদা মনে রাখবেন উপকরণ শিক্ষার্থীর জন্য,শিক্ষকের জন্য নয়।তাই শিক্ষার্থীর কথা মাথায় রেখেই উপকরণবানাতে হবে।
৪। উপকরণ এমন হবে যাতে শিক্ষার্থীর চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি পায়।অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে চিন্তাশীল করে তোলে।
৫। উপকরণটি এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে পাঠের উদ্দেশ্য ও শিখনফল অর্জিত হয়।
৬। উপকরণের ভাষা নির্ভুল, সহজ এবং স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।
৭। উপকরণ হাতে তৈরি করতে গেলে কালার কম্বিনেশন ঠিক করে নিতে হবে।
৮। সঠিক সময়ে সঠিক উপকরণ প্রদর্শন করতে হবে।তা না হলে উপকরণ ব্যবহারের উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যাবে।
৯। বাস্তব উপকরণ দেখাতে পারলে বেশি ভাল হয় , দেখাতে না পারলে হাতে এঁকেও দেখানো যেতে পারে।যেমন-ব্যাংকে হিসাব খোলার পর প্রয়োজন হয় চেক বইয়ের।এই চেক বই যদি পাওয়া না যায় সে ক্ষেত্রে হাতেএঁকেও দেখানো যেতে পারে।
১০। উপকরণ ব্যবহার করার পর তা যথা স্থানে নামিয়ে রাখতে হবে।তা না হলে শিক্ষার্থীর মনোযোগ উপকরণেরদিকে চলে যাবে।
১১। শিক্ষককে উপকরণ ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ত্ব করে নিতে হবে।
১২। উপকরণ ব্যবহারের পর শিক্ষককে এর যথার্থতা ও কার্যকারিতা যাচাই করতে হবে।

শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে আগ্রহী ও কুশলী হতে হবে। একজন আদর্শ শিক্ষকের জ্ঞান,দক্ষতা ও কর্ম তৎপরতার মাধ্যমেই শিক্ষা উপকরণের ফলপ্রসূ ও কার্যকর ব্যবহার সম্ভব। এ জন্য শিক্ষকশিক্ষার্থী উভয়কেই অনেক বেশি আন্তরিক হতে হবে।

৫.২ : শিক্ষা উপকরণের শ্রেণিবিভাগ, দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী ও অপ্রতুল সামগ্রী ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ, বিনামূল্যের ও স্বল্পমূল্যের শিক্ষা উপকরণ

শিক্ষা উপকরণের শ্রেণিবিভাগ (Classifiction of Teaching aids)

শিক্ষা উপকরণের শ্রেণিবিভাগকে দুটি দিক থেকে বিবেচনা করা হয়।

১। ব্যবহার বৃত্তির দিক থেকে

২। প্রাপ্যতার দিক থেকে

১। ব্যবহার বৃত্তির দিক থেকে

ব্যবহার বৃত্তির দিক থেকে উপকরণকে আবার ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক) **শ্রবণযোগ্য উপকরণ(Audio Aids) :** যে সকল উপকরণ শুধুমাত্র শ্রবণ করা যায় তাকে শ্রবণযোগ্য উপকরণ বলে।শ্রবণযোগ্য উপকরণ ব্যবহার করে বিষয়বস্তুকে আরও বেশি প্রাণবন্ত করা যায়। যেমন-রেডিও,টেপরেকর্ডার, সাউন্ড বক্স,গ্রামোফোন ইত্যাদি।

খ) **দর্শনযোগ্য উপকরণ(Visual Aids) :** যে সকল উপকরণ শুধুমাত্র দেখা যায় তাকে দর্শনযোগ্য উপকরণ বলে। দর্শনযোগ্য উপকরণের মাধ্যমে পাঠ অনেক বেশী ফলপ্রসূ হয়। যেমন-ছবি, চার্ট, মানচিত্র,মডেল,বই,বুলেটিন বোর্ড,চকবোর্ড, গ্রাফবোর্ড ইত্যাদি

গ) **শ্রবণ ও দর্শনযোগ্য উপকরণ (Audio-Visual Aids) :** যে সকল উপকরণ শ্রবণ ও দর্শন করা যায় তাকে শ্রবণ ও দর্শনযোগ্য উপকরণ বলে। এই উপকরণের ফলে শিক্ষার্থীর শ্রবণ ও দর্শন ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করা যায়, ফলে শিখন আরও বেশি আকর্ষণীয় এবং স্থায়ী হয়। যেমন- টেলিভিশন, ভিসিআর, সিনেমা, ভিডিও, মোবাইল, কম্পিউটার ওভারহেড প্রজেক্টর ইত্যাদি।

ঘ) **কার্যসম্পাদনযোগ্য উপকরণ(Work oriented Aids) :** যে সকল উপকরণ শিক্ষার্থী তার কাজের মধ্য দিয়ে বা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জন করে তাকে কার্যসম্পাদনমূলক শিক্ষা উপকরণ বলে।যেমন-বিভিন্ন খামার পরিদর্শন, খামার তৈরী করা, বাণিজ্য মেলা, বিজ্ঞানাগারের কার্যাবলি ,বিভিন্ন উৎপাদনমূখী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ইত্যাদি।

ঙ) **আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবনসমূহ(Modern technology) :** বর্তমান সময়ে যে সব আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে সেগুলোও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচুর অবদান রাখছে। যেমন-কম্পিউটার , ল্যাপটপ, ইন্টারনেট,ইমেইল,স্মার্ট ফোন,ফ্যাক্স,ই-কমার্স ইত্যাদি।একটি চিত্রেরমাধ্যমেশিক্ষা উপকরণের শ্রেণিবিভাগ দেখানো হল-

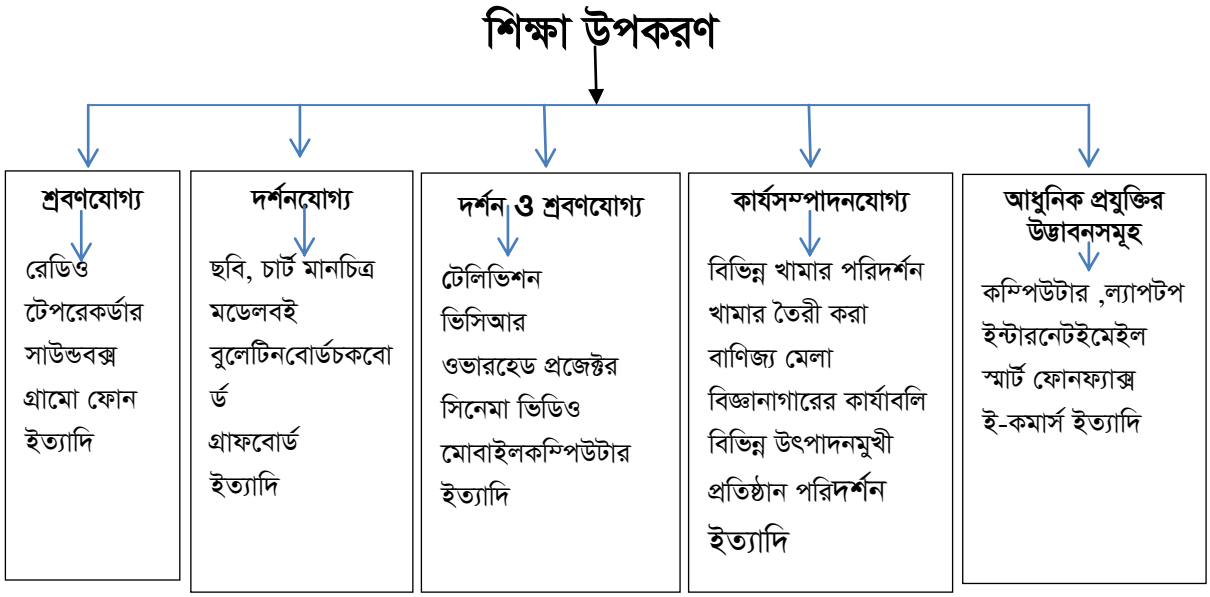

২। প্রাপ্যতার দিক থেকে :

প্রাপ্যতার দিক থেকে শিক্ষা উপকরণকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক) **স্বল্পমূল্যের শিক্ষা উপকরণ (Low cost Teaching aids) :** যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করতে অপেক্ষাকৃত স্বল্প অর্থ খরচ করতে হয়। তাকে স্বল্প মূল্যের শিক্ষা উপকরণ বলে। যেমন-বিভিন্ন লেখা সম্বলিত পোস্টার পেপার,ছোট ছোট শিল্পজাত পণ্য (চকলেট, টুথপেস্ট,কলম), মাটির তৈরি বিভিন্ন পণ্য দ্রব্য।

খ) **বিনামূল্যের শিক্ষা উপকরণ (No cost Teaching aids) :** যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করতে অর্থ খরচ করতে হয় না তাকে বিনামূল্যের শিক্ষাউপকরণ বলে। যেমন-ক্যাশ মেমো,ভাউচার,রশিদ,চেক বই, ব্যাংক জমার রশিদ। তাছাড়া বাড়িতে ব্যবহার্য বিভিন্ন খুচরা দোকানের জিনিসপত্রাদি।

গ) **সহজলভ্য শিক্ষা উপকরণ (Easily available Teaching aids) :** যে সকল উপকরণ আমরা খুব সহজে হাতের কাছে পেতে পারি তাকে সহজলভ্য শিক্ষাউপকরণ বলে। যেমন-বই, খাতা, কলম, ক্যালেন্ডার, বিভিন্ন খামারের বা নার্সারির ছবি,চার্ট,ছক,চিত্র ইত্যাদি।

ঘ) **দুস্প্রাপ্য শিক্ষা উপকরণ (Rare Teaching Aids) :** যে সকল উপকরণ খুব সহজে হাতের কাছে পাওয়া যায়না বা যা অনেক দামী তাকে দুস্প্রাপ্য শিক্ষা উপকরণ বলে। যেমন-কম্পিউটার,ওভারহেড প্রজেক্টর,মাল্টিমিডিয়া,প্রাচীন মুদ্রা ইত্যাদি।

শিক্ষাউপকরণ ব্যবস্থাপনা (Management of Teaching aids)

ব্যবস্থাপনা কথাটি দ্বারা আমরা বুঝি কোন কাজ সঠিক ভাবে করতে পারা।সফলতার সাথে কোন কাজ করতে হলে যেমন লাগে সঠিক পরিকল্পনা, তেমনি সুন্দর ব্যবস্থাপনা দ্বারাও কার্যক্রমকে সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করা যায়।তাই শিক্ষা কার্যক্রমকে সফলতার সঙ্গে শেষ করতে হলে বিষয়বস্তুর জ্ঞানের পাশাপাশি যথাযথ শিখন সামগ্রী ব্যবস্থাপনারও জ্ঞান থাকা জরুরী। উপকরণ ব্যবস্থাপনা যথাযথ না হলে শিখন -শেখানো কার্যক্রমের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।আমরা জেনেছি শিক্ষা উপকরণ শিখন-শেখানো কাজকে সহজ ,আকর্ষণীয়, প্রাণবন্ত ,বাস্তবমুখী ও প্রয়োগমুখী করে।সুতরাং এই সব সফলতা নির্ভর করে শিখন সামগ্রীর সঠিক পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার উপর। নিম্নে শিখন সামগ্রীর সঠিক ব্যবহারের কিছু কৌশল উল্লেখ করা হল-

১) **ভৌত অবকাঠামো :** শ্রেণির কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করার জন্য ভৌত অবকাঠামোগত পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন। হিসাববিজ্ঞান শিক্ষার জন্য একটি উপযুক্ত অবকাঠামোযুক্ত শ্রেণিকক্ষ থাকতে হবে।আসন ব্যবস্থা,দরজা,জানালা,হোয়াইট বোর্ড, প্রয়োজনীয় আলো ও বাতাস প্রবেশের সুযোগ থাকতে হবে।

২) **শ্রেণিকক্ষের অন্যান্য পরিবেশ :** শ্রেণিকক্ষ একটি শিখনকে সফল করতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।শ্রেণিতে নানা ধরনের উপকরণ ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় সুব্যবস্থা থাকতে হবে।যেমন-চার্ট জাতীয় উপকরণ ব্যবহার করার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা থাকতে হবে।মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে ক্লাশ নিতে হলে বিদ্যুতের সংযোগ,মাল্টিমিডিয়া, স্ক্রিন,ল্যাপটপ ইত্যাদি থাকতে হবে।

৩) **উপকরণ নির্বাচন :** শ্রেণিতে প্রবেশের আগে শিক্ষক ঠিক করে নিবেন কোন উপকরণ বিষয়বস্তুকে সহজ করে তুলতে পারবে। সেদিকে খেয়াল রেখে তিনি উপকরণ নির্বাচন করবেন।উপকরণ যথাযথ না হলে শিখন কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তাই সঠিক উপকরণ নির্বাচন করা জরুরি।

৪) **উপকরণ তৈরি :** উপকরণ তৈরি করা হয় শিক্ষার্থীর জন্য,তাই খেয়াল রাখতে হবে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী যেন দেখতে পায়। চার্ট জাতীয় উপকরণ তৈরি করার সময় দেখতে হবে যেন বানান ঠিক হয়, কালার কম্বিনেশন ও উপকরণের সাইজ শ্রেণিসম্মত হয়।

৫) **উপকরণ ব্যবহার কৌশল :** শিক্ষককে উপকরণ ব্যবহারের কৌশল জানতে হবে।কোন সময় কোন উপকরণ ব্যবহার করবেন তা শিক্ষক ঠিক করে নিবেন।ঠিক সময়ে সঠিক উপকরণ ব্যবহার করতে না পারলেউপকরণ ব্যবহারের সুফল নষ্ট হতে পারে। কতক্ষণ ব্যবহার করবেন তাও ঠিক করে নিবেন।উপকরণ ব্যবহারের পর নামিয়ে রাখতে হবে।

৬) **উপকরণ সংরক্ষণ কৌশল :** উপকরণ কেবল একবার ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত করা হয়না।দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করা হবে এটা চিন্তা করেই বানাতে হবে। তাছাড়া অনেক উপকরণ আছে যা সব সময় পাওয়া যায় না, ব্যয়বহুলও। সে সব ক্ষেত্রে উপকরণগুলি সংরক্ষণ করা দরকার।

শিখন সামগ্রীর সুব্যবস্থাপনার কারণে শিক্ষার্থীরা তার সুফল পেতে পারে। শিক্ষণ সামগ্রী প্রস্তুত,সংগ্রহ,ব্যবহার সংরক্ষণ সব কিছুই শ্রেণি ব্যবস্থাপনার কাজে শিক্ষকের যেমন কর্ম দক্ষতা বাড়ে তেমনি আত্মবিশ্বাসও বাড়ে।

উপকরণ সংরক্ষণ পদ্ধতি (System of Teaching aids Preservation)

শিক্ষকতা একটি মহান পেশা,এটি একটি ব্রত ও বটে।শিক্ষকতা সফলতার সঙ্গে পরিচালনা করতে গেলে একজন শিক্ষককে সর্বদা পড়াশুনা করতে হয়। কারণA teacher is a student ,a good student and always a good student.শ্রেণির কাজে যে সব শিক্ষণ সামগী ব্যবহার করেন সেগুলিকে সংরক্ষণ করা জরুরি। শিখনসামগ্রীকে সংরক্ষণ করার জন্য যে সকল কতিপয় কৌশল অবলম্বন করা যায় তা নিম্নে তুলে ধরা হল-

১)উপকরণ সংরক্ষণের জন্য একটি উপকরণ কক্ষ থাকা প্রয়োজন।
২)কক্ষটিতে উপযুক্ত দরজা, জানালা,প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, আলো-বাতাস প্রবেশের সুযোগ থাকতে হবে।
৩)প্রয়োজনীয় তাক,আলমিরা থাকতে হবে।
৪)কক্ষটি অবশ্যই পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে।
৫)তাকে বা আলমিরায় উপকরণগুলি বিষয়ভিত্তিক সাজিয়ে রাখতে হবে।
৬) উপকরণের জন্য একটি স্টক রেজিস্টার রাখতে হবে। রেজিস্টারে প্রতিটি উপকরণের নাম লিখে রাখতে হবে।
৭) পচনশীল কোন উপকরণ থাকলে সেটিকে আলাদা করে ফরমালিন দিয়ে রাখতে হবে।
৮) প্রতিটি উপকরণের নাম লিখে সংরক্ষণের তারিখ ও সংরক্ষণের স্থানসহ লেবেল লাগিয়ে রাখতে হবে।
৯) তিন মাস,ছয় মাস বা বাৎসরিক ভিত্তিতে স্টক রেজিস্টার হালনাগাদ করতে হবে।।
১০)উপকরণ যাতে পোকামাকড়ে না কাটে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
১১) শিক্ষার্থীদের উপকরণ কক্ষ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীরা উদ্বুদ্ধ হবে।
১২) উপকরণ কক্ষটিতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
১৩) কিছুদিন পরপর উপকরণগুলি মুছতে হবে যাতে ধূলো-বালি পড়ে নষ্টনা হয়।

শ্রেণিতে উপকরণ ব্যবহার করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি তা ব্যবহারের পর সংরক্ষণ করাও প্রয়োজন। এমনিভাবে উপকরণ সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকলে ধীরে ধীরে সংগ্রহ কক্ষে অনেক উপকরণ সংগৃহীত হবে। এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই উপকৃত হবে। তাই উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা শিক্ষক তথা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য জরুরি।

৫.৩ : হিসাববিজ্ঞান শিক্ষার শিক্ষা উপকরণের তালিকা প্রস্তুতকরণ ও শিক্ষা উপকরণ তৈরি

হিসাববিজ্ঞান শিক্ষার শিক্ষা উপকরণের তালিকা প্রস্তুতকরণ

শ্রেণিকক্ষে হিসাববিজ্ঞান পাঠদানের সময় নানাবিধ উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।নিম্নেতার একটি তালিকা প্রস্তুত করা হল-

১. চালান
২. বিল
৩. ভাউচার
৪. ক্যাশ মেমো
৫. ডেবিট নোট
৬. ক্রেডিট নোট
৭. ব্যাংকে হিসাব খোলার ফরম
৮. চেক বই
৯. খামার/নার্সারির ছবি
১০ বিভিন্ন ধরনের চার্ট (ধারনা, বৈশিষ্ট্য,সুবিধা,গুরুত্বের চার্ট)
১১. ছক(জাবেদা,খতিয়ান,নগদান বহি)
১২. বিভিন্ন মুদ্রা
১৩. বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র
১৪. খুচরা দোকানের পণ্য, দোকানের ছবি
১৫. বিজ্ঞাপনের ছবি
১৬. পণ্যের মোড়ক
১৭. হিসাব সমীকরণ মডেল
১৮. হিসাব চক্রের মডেল
১৯. পণ্য উৎপাদিত স্থানের ছবি

বিনামূল্যের শিক্ষাউপকরণ (No cost Teaching Aids)

আমাদের চার পাশে নানা ধরনের উপকরণ রয়েছে। কোনটি অর্থের বিনিময়ে কিনতে হয় আবার কোনটি বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। সাধারণত যে উপকরণ সংগ্রহ করতে কোন অর্থ ব্যয় করতে হয় না তাকে বিনামূল্যের শিক্ষা উপকরণ বলা হয়। এই ধরনের উপকরণ ব্যবহার করে আমরা আমাদের শ্রেণির কার্যক্রমকে বেগবান করতে পারি। আমাদের দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়গুলি গ্রামে অবস্থিত। সেখানে রয়েছে নানা ধরনের অর্থের সীমাবদ্ধতা।বিনামূল্যের শিক্ষাউপকরণসমূহ আমরা আমাদের পরিবার কিংবা আশে-পাশে থেকে সংগ্রহ করতে পারি,আবার শিক্ষার্থীর মাধ্যমেও সংগ্রহ করতে পারি এবং শ্রেণিকক্ষে এগুলো ব্যবহার করে শিখন-শেখানোকার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করতে পারি। নিম্নে বিনামূল্যের শিক্ষা উপকরণের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হল-

১.চালান
২.বিল
৩.ক্যাশমেমো
৪.ভাউচার
৫.ডেবিট নোট
৬.ক্রেডিট নোট
৭.পণ্য সামগ্রীর মোড়ক
৮.ব্যাংকে হিসাব খোলারবিভিন্ন ফরম
৯.নার্সারি,হাঁস-মুরগী,মৎস কৃষিখামারের ছবি
১০.নগদান বহি,জাবেদা,খতিয়ান,রেওয়ামিল,বিশদ আয় বিবরণীর ছক
১১.বিভিন্ন ধারনা,সুবিধা,অসুবিধা, বৈশিষ্ট্য,গুরুত্বের চার্ট
১২.ঘরে ব্যবহার্য সাবান,শ্যাম্পু,পেস্ট,ব্রাশ,খাতা,কলম
১৩.ঘরে ব্যবহার্য বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্যসমূহ
১৪.ঘরে ব্যবহার্য বিভিন্ন শিল্পজাত পণ্যসমূহ
১৫.মাটির তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র
১৬.ব্যবহৃত নকশি করা কাপড়
১৭.কুটির শিল্পের অন্যান্য জিনিসপত্র
১৮.খুচরা দোকানের ছবি

বিনামূল্যের ও স্বল্পমূল্যের উপকরণ ব্যবহারের উপকারিতা(Necessity of no cost & low cost Teaching aids)

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অর্থের বরাদ্দ খুব বেশী নয়।তাই সাধ থাকলেও সাধ্যমত শিক্ষা উপকরণ নিয়ে শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে যেতে পারে না। যে কারণে শিক্ষার গুণগত মানে অনেক ঘাটতি দেখা যায়। আমরা যদি আন্তরিক হই তবে বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ দিয়েও ফলপ্রসূ ক্লাশ পরিচালনা করা সম্ভব। তাছাড়া এই সব উপকরণ ব্যবহার করার ফলে পরিবেশেরও অনেক উপকার হয়। নিম্নেএই সকল উপকরণ ব্যবহারের উপকারিতা উল্লেখ করা হল-

১) অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবহার করা যায়।
২) শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস বাড়ে।
৩) শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়।
৪) উপকরণ তৈরির দক্ষতা বাড়ে।
৫) শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।
৬) উপকরণ ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
৭) শিখনবাস্তবধর্মী হয়, শ্রেণি সক্রিয় থাকে।

৮) শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।
৯) শিক্ষক -শিক্ষার্থী উভয়ের সৃজনশীল গুণাবলীর বিকাশ ঘটে।
১০) বিনা খরচে লাভের পরিমাণ বেশি।
১১) বিষয়বস্তু সহজে বুঝতে পারে।

স্বল্পমূল্যের শিক্ষা উপকরণ (Low cost Teaching aids)

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা উপকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। একমাত্র উপকরণই পারে শ্রেণি আকর্ষণীয় করতে।আমরা শ্রেণিতে নানা ধরনের উপকরণ ব্যবহার করে থাকি। যে সকল উপকরণ কম দামী বা সহজেই হাতের কাছে পাওয়া যায় তাকে স্বল্পমূল্যের শিক্ষা উপকরণ বলে। নিম্নে স্বল্পমূল্যের শিক্ষা উপকরণের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হল-

১. কুটির শিল্পের বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী। যেমন- পুতুল, ফুলদানি
২. OHP সীট
৩. মিনিসাবান, শ্যাম্পু, কলম, খাতা
৪. লিখিত পোস্টার পেপার
৫. পূরনো ক্যালেন্ডারের পিছনের সাদা পৃষ্ঠা যা ছক বা চার্ট তৈরির কাজে ব্যবহার করা যায়।
৬. আর্ট পেপারে তৈরি বিভিন্ন ছক বা চার্ট
৭. ডিজিটাল ব্যানার

পোস্টার পেপার তৈরির কৌশল

আমরা জানি পোস্টার পেপারকে শ্রেণির কাজে ব্যবহার করা হয়। তবে একে ব্যবহার করে সুফল পেতে হলে কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হয়। নিম্নে পোস্টার তৈরির কিছু কৌশল তুলে ধরা হল-

১) সুন্দর রং এর পোস্টার পেপার সংগ্রহ করতে হবে যাতে দেখতে অসুবিধা না হয়।
২) পোস্টার পেপারের চারপাশে এক ইঞ্চি চওড়া বর্ডার দিতে হবে।
৩) পোস্টারের একটি শিরোনাম থাকতে হবে।
৪) পয়েন্ট লিখতে হলে ৮-১০ পয়েন্টের বেশি লেখা উচিত নয়।
৫) একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে একটি বক্তব্য উপস্থাপন করা উচিত, একাধিক নয়। এতে তথ্য ভারাক্রান্ত হয়ে যাবে।
৬) পোস্টারের সাইজ শ্রেণিসম্মত হতে হবে।
৭) লেখা শ্রেণির সব শিক্ষার্থী যেন দেখতে পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
৮) পোস্টারের রং এবং কালির রং এর মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে।
৯) পোস্টার মার্কার (Art line) কলম দিয়ে লিখতে হবে।
১০) লেখা নির্ভুল , সুন্দর এবং স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।
১১) শ্রেণির বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে পোস্টার তৈরি করতে হবে।

৫.৪ : অন্যান্য পাঠ্যপুস্তক, ICT উপকরণ-ভিডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর

অন্যান্য পাঠ্যপুস্তক (Other Textbook)

শ্রেণির কার্য পরিচালনা করতে পাঠ্যপুস্তক গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা জানি ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীদের আবশ্যিক বিষয়ের পাশাপাশি হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় পরিচিতি, ব্যবসায় উদ্যোগ, বাণিজ্যিক ভূগোল ইত্যাদি বিষয়গুলিও অধ্যয়ন করতে হয়। পাঠ্যপুস্তক একজন শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষকের মত। পাঠ্যপুস্তকের সহযোগিতায় একজন শিক্ষক নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারে। তাই ছাত্র -শিক্ষক উভয়ের কাছে পাঠ্যপুস্তক খুবই গুরুত্বপুর্ণ।

একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডে দেশের সরকার কর্তৃক নির্দেশিত NCTB কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষাক্রমকে সামনে রেখে নির্দিষ্ট শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মেধা, আগ্রহ, রুচি, পছন্দ, বয়স ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে যে পঠন- পাঠন সামগ্রী ব্যবহার করেন তাকে পাঠ্যপুস্তক বলে।

উপকরণ হিসাবে পাঠ্যপুস্তক

উপকরণ হিসাবে পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া পাঠদান করা যায় না। একজন শিক্ষককে পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান আগে আহরণ করতে হয় এবং সেই অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করতে হয়। নিম্নে উপকরণ হিসাবে পাঠ্যপুস্তককী ভূমিকা পালন করে তা উল্লেখ করা হল-

১) পাঠ্যপুস্তকের সহযোগিতায় শিক্ষক বিষয়বস্তুর জ্ঞান আত্মস্থ করতে পারেন।
২) শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তকের সহযোগিতায় বিষয়বস্তু বুঝতে পারে। বিভিন্ন অনুশীলন চর্চা করে জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে পারে।
৩) অভিভাবকেরা পাঠ্যপুস্তকের সহোযোগিতায় নিজেদের ছেলেমেয়েদের বাড়িতে পড়াতে পারেন।
৪) পাঠ্যপুস্তকের সহযোগিতায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার মূল্যায়ন করতে পারেন।
৫) বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিগণ তাদের মেধাকে পাঠ্যপুস্তকের লেখনীতে প্রকাশ করতে পারেন। আর শিক্ষক শিক্ষার্থীরা সেই জ্ঞানকে আহরণ করেন পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে।
৬) গবেষণার কাজে ও পাঠ্যপুস্তকব্যবহৃত হয়।

পরিশেষে বলা যায় পৃথিবীর প্রায় সব দেশের শ্রেণিকক্ষে আজও পাঠ্যপুস্তকগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আছে। শ্রেণির শিখন-শেখানোর কাজে পাঠ্যপুস্তকবহুল ব্যবহৃত একটি উপকরণ। আমাদের দেশের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্য পুস্তক একজন শিক্ষকের মত। সুতরাং উপকরণ হিসাবে পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকা অতুলনীয়।

পাঠ্যপুস্তকের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সহযোগিতাপূর্ণ পুস্তকগুলি হল-

১) হিসাববিজ্ঞান রেফারেন্স বই
২) প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল
৩) শিক্ষক নির্দেশিকা
৪) অর্থ ও বাণিজ্য শব্দ কোষ
৫) ভূচিত্রাবলী
৬) জার্নাল
৭) ম্যাগাজিন
৭) খবরের কাগজ ইতাদি

ICT উপকরণ

ICT এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Information and Communication Technology.এর বাংলা প্রতিরূপ হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। বর্তমান যুগ হচ্ছে তথ্য ও প্রযুক্তির যুগ। শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে। তথ্য ও প্রযুক্তির সহযোগিতায় শ্রেণির শিখন-শেখানো কার্য আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা যায়। অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের অধিক তথ্য দেওয়া যায়। এসব উপস্থাপনায় লেখার রং, ডিজাইন, ছবি, ভিডিও, এনিমেশন ইত্যাদি ব্যবহার করে কঠিন বিষয়কে সহজে উপস্থাপন করা যায়। ফলে শিখন-শেখানো কাজ পূর্বের তুলনায় আরও বেশি কার্যকরী, আকর্ষণীয় ,আনন্দদায়ক, সহজবোধ্য ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। বক্তৃতার মাধ্যমে অনেক বিষয় ভাল ভাবে বুঝানো যায় না, কিন্তু তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজেই বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপন করা যায়। এতে শিক্ষকেরও পরিশ্রম লাঘব হয়। উন্নত বিশ্বে শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা ছোট নোট বুক ব্যবহার করে। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে বর্তমান পৃথিবী একটি গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ ও এর ছোঁয়া থেকে বাদ যায়নি। আজ আমাদের দেশের গ্রাম-গঞ্জের বিদ্যালয়গুলিতেও ICT-এর ছোঁয়া পৌঁছে গেছে। সেখানে শিক্ষকরা মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে শ্রেণির কাজ পরিচালনা করছেন। ঝকঝকে ছবি , এনিমেশন , ভিডিও ব্যবহার করে বিষয়বস্তুকে প্রাণবন্ত করে উপস্থাপন করছে। এতে শিক্ষার্থীরা খুবই কৌতুহলী হচ্ছে যা শ্রেণির জন্য কাম্য।তথ্য ও প্রযুক্তির সুফল পৌঁছে দেয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপকরণ সামগ্রী প্রয়োজন,যেমন- রেডিও, টেলিভিশন, ভিডিও, টেপরেকর্ডার, সিডি, ডিভিডি, টেলিফোন, কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া, প্রজেক্টর, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট সিস্টেম ইত্যাদি ব্যবহার করে শ্রেণির কাজ পরিচালনা করছেন ।

ভিডিও (Video)

আধুনিক শিক্ষা উপকরণের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হল ভিডিও। এর চৌম্বক ফিতায় দূরদর্শনের জন্য ছবি শব্দসহ রেকর্ড করা হয়। পরে সিডি ভিসিআর যন্ত্রে দেখানো হয়। বর্তমানে ভিডিও করা খুবই সহজ হয়ে গেছে। সাধারণ মোবাইলে ভিডিও করে আমরা আমাদের শ্রেণির কাজে ব্যবহার করতে পারি। শিক্ষায় এর প্রয়োগ এখন বেড়েই চলছে। শ্রেণির কার্যপরিচালনায় শিখন সামগ্রী হিসাবে ভিডিওর ভূমিকা-

১. ভিডিওর মাধ্যমে বাস্তব বিষয়কে তুলে ধরা হয় ফলে শিখন বাস্তবমুখী হয়।
২. বক্তৃতা দিয়ে যা না বোঝানো যায় তা ভিডিওর মাধ্যমে সরাসরি দেখানো যায়।
৩. এতে শিখন আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত হয়।
৪. শিক্ষার্থীর মধ্যে কৌতুহল সৃষ্টি হয়।
৫. এতে সব শ্রেণির শিক্ষার্থীরা উপকৃত হয় এবং শ্রেণি সক্রিয় থাকে যা কাম্য।
৬. বার বার দেখার সুগোগ থাকে বলে শিক্ষার্থী প্রয়োজনে বার বার দেখতে পারে।
৭. হাতে কলমে শিখতে পারে।
৮. শ্রেণির একঘেয়েমী দূর হয়।
৯. একটি আকর্ষণীয় ভিডিও বার বার দেখলেও পুরণো হয় না ।
১০. নিজেদের মোবাইলে শিক্ষার্থীরা Bluetooth, shareit এর মাধ্যমে video transfer করে পছন্দমত সময়ে তারা দেখতে পারে। ফলে বিষয়বস্তুর উপর আগ্রহ তৈরি হয়।

সুতরাংশ্রেণির কার্য পরিচালনায় ভিডিও একটি গুরুত্বপুর্ণ মাধ্যম। এর সাহায্যে শিখন আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয়, সহজ ও দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভব। তাই শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কাজকে ফলপ্রসূ করার জন্য ভিডিওর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

টেলিভিশন (Television)

টেলিভিশন আমাদের দেশের একটি দর্শক নন্দিত বিনোদন সামগ্রী। অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আমরা টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাই। আমাদের দেশে বর্তমানে অনেকগুলো বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল রয়েছে যা বিনোদনের পাশাপাশি নানা শিক্ষণীয় বিষয় উপস্থাপন করে।যেমন -কৃষি,স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, নাচ, গান, কবিতা ইত্যাদি। এইসব চ্যানেল দর্শকের চিত্ত বিনোদনের পাশাপাশি নানা জ্ঞানমূলক অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে থাকে। বর্তমান সরকার কিছু মডেল ক্লাশ আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য প্রচারের কাজ করছে যা একটি ভাল উদ্যোগ। এর ফলে শিক্ষকবৃন্দ নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে পারছে এবং শিক্ষার্থীরাও উপকৃত হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অনেক আগে থেকেই তাদের নানা বিষয়ের কোর্সসমূহ টেলিভিশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করছে। শিখন সহায়ক সামগ্রী হিসাবে টেলিভিশন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নেটেলিভিশনের কিছু সুবিধা উল্লেখ করা হল-

১। শিক্ষার্থীর দর্শন ইন্দ্রিয়ের বিকাশ ঘটে, শিখন স্থায়ী হয়।
২। এতে শিখন আনন্দদায়ক হয়।
৩। বাস্তব জ্ঞান অর্জিত হয়।
৪। অনেক অজানা বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে।
৫। কঠিন ও জটিল বিষয়গুলিকে সহজে বোঝানো যায়, ফলে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হয়।
৬। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় শুধুমাত্র ঐ অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হয় কিন্তু টেলিভিশনের মাধ্যমে সারাদেশ তথা বিশ্বের মানুষ দেখতে পারে।

৭। টেলিভিশন অজানাকে জানা ও অদেখাকে দেখার সুযোগ করে দেয়।

৮। এই উপকরণটি দ্বারা শুধুমাত্র শিক্ষক শিক্ষার্থী নয়, অভিভাবক-শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ ও নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকে।

সুতরাং উপকরণ হিসেবে টেলিভিশনের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু এর এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কিছু অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়। নিম্নেকয়েকটি অসুবিধার কথা উল্লেখ করা হল-

- বিদ্যুৎ না থাকলে দেখানো সম্ভব নয়।
- উপকরণটি ব্যয়বহুল।
- শিক্ষক -শিক্ষার্থীর মিথস্ক্রিয়া সম্ভব হয় না।
- শিক্ষার্থীরা হাতে- কলমে শিখতে পারে না।
- পুনরায় দেখার সুযোগ থাকে না।
- প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে না।

এত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও উপকরণ হিসাবে টেলিভিশনের গুরুত্ব অপরিসীম।

ইন্টারনেট (Internet)

ইন্টারনেট হচ্ছে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকা অসংখ্য কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য কম্পিউটারের মধ্যে যে আন্ত:সম্পর্ক বা যোগাযোগ ব্যবস্থা সেটি ইন্টারনেট নামে পরিচিত। বর্তমান বিশ্বের কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং প্রক্রিয়া ইন্টারনেট এক যুগান্তকারী আবিস্কার। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীগণ একে অন্যের সাথে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। অর্থাৎ ইন্টারনেট একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তেতথ্য আদান-প্রদান করা যায়। এর জন্য প্রয়োজন একটি কম্পিউটার বা ল্যাপটপ, মডেম, নেটওয়ার্কিং সিস্টেম, টেলিফোন লাইন, প্রিন্টার এবং বিদ্যুৎ সংযোগ।

শিখন সহায়ক সামগ্রী হিসাবে ইন্টারনেটের ভূমিকা

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইন্টারনেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। যে কোন সমস্যার সমাধান মূহুর্তেই করা যায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে। নিম্নেইন্টারনেটের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা তুলে ধরা হল-

১। খুব সহজে তথ্য আদান প্রদান করা যায়।

২। পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় বসে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়।

৩। প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

৪। দ্রুত তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।

৫। শিক্ষামূলক সব ধরনের সুবিধা পাওয়া যায়।

৬। গোপনীয়তা বজায় থাকে।

৭। যে কোন সময় ব্যবহার করা যায়।

৮। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী যে কোন সময় এটি ব্যবহার করতে পারে।
৯। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।
১০। উন্নততর সেবা পাওয়া যায়।
১২। সারা পৃথিবীর তথ্যাদি সংরক্ষণ করা যায়।
১৩। একজন শিক্ষাথী ইন্টারনাটের বিশাল জ্ঞান-ভান্ডার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ সংগ্রহ করে নিজের কাছে রেখে দিতে পারে।

উপরের আলোচনায় আমরা বলতে পারি যে, উপকরণ হিসাবে ইন্টারনেটের ভূমিকা অপরিসীম।বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট পৃথিবীটাকে মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছেন। ঘরে বসেই মানুষ আজ প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সেরে ফেলতে পারছে ইন্টারনেটের সাহায্যে।শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানোর কাজেও পিছিয়ে নেই ইন্টারনেটের ব্যবহার। ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েই উপকৃত হচ্ছে। শ্রেণিতে একটি শিখন-বান্ধব পরিবেশ তৈরী হচ্ছে। যে কারণে শিখন আনন্দদায়ক, চিত্তাকর্ষক ও সহজবোধ্য হচ্ছে। ইন্টারনেটের বহুবিধ সুবিধা থাকা সত্বেও এর কতকগুলি অসুবিধা রয়েছে। নিম্নেঅসুবিধাগুলি তুলে ধরা হল-

১। বিদ্যুৎ না থাকলে ব্যবহার করা যায় না ।
২। ব্যয়বহুল।
৩। উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা ইন্টারনেটের ক্ষতিকর দিকের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ছে।
৪। Facebook এ তারা অনেক সময় ব্যয় করছে।
৫। আপত্তিকর ছবি, ভিডিও দেখছে, যার ফলে তারা সমাজে অশালীন আচরণ করছে।
৬। লেখাপড়ার প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়ছে।

ল্যাপটপ (Laptop)

Desktop এর ক্ষুদ্র সংস্করণ হল Laptop। ল্যাপ (lap) কোলের উপর রেখে ব্যবহার করা যায় বলে একে Laptop বলে। এটি সহজে বহনযোগ্য। এডাপ্টরের মাধ্যমে বিদ্যুতের সাহায্যে এবং রিচার্জেবল ব্যাটারী সম্বলিত হওয়ায় বিদ্যুৎ ছাড়াও দীর্ঘ সময় চালানো যায়। ল্যাপটপ কম্পিউটারের কার্যক্ষমতা পারসোনাল কম্পিউটার বা ডেস্কটপ কম্পিউটারের সমতুল্য। ল্যাপটপ ব্যবহার করার পূর্বে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ইনস্টল করে নিতে হয়।

শিক্ষা উপকরণ হিসাবে ল্যাপটপ

ল্যাপটপে নানা ধরনের প্রোগ্রামভিত্তিক কাজ করা যায়। শ্রেণিকক্ষে সাধারণত: ক্লাশ পরিচালনার জন্য content প্রদর্শন করতে হয় বলে পাওয়ার পয়েন্টে ক্লাশ তৈরি করতে হয়। এর জন্য প্রয়োজন একটি ল্যাপটপ, বিদ্যুতের সংযোগ এবং ইন্টারনেট ব্যবস্থা। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পূর্বে content তৈরি করে নিবেন। শ্রেণিকক্ষে এই উপকরণটি ব্যবহারের ফলে যে সুবিধাগুলি পাওয়া যায় তা নিম্নেউল্লেখ করা হল-

১। বোর্ডে লেখার কোন কাজ আগেই লিখে রাখা যায়, ফলে সময় বেঁচে যায়।
২। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়।
৩। নানা ধরনের ছবি , ভিডিও প্রদর্শন করা যায়, ফলে শিক্ষার্থীরা আনন্দঘন পরিবেশে শিখতে পারে।
৪। একঘেয়েমি দূর হয়।
৫। লেখাকে ছোট, বড়, রঙিন ইত্যাদি করা যায়, যা বোর্ডে সম্ভব হয় না।

৬। ইন্টারনেটে ঢুকে সরাসরি কোন ছবি ,ভিডিও, কোন তথ্য দেখানো যায়।
৭। শ্রেণির দুর্বল শিক্ষার্থীরাও মনোযোগী থাকে।
৮। শিখন সহজ হয় এবং দীর্ঘদিন মনে থাকে।
৯। ল্যাপটপ ব্যবহার করে ছবি তোলা যায়।
১০।পেনড্রাইভ ব্যবহার করে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।
১১। ভিডিও,অডিও চালান যায়।
১২। তথ্যাদি দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।
তথ্যপ্রযুক্তির যুগে ল্যাপটপের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষক পূর্বেই যদি তাঁর content তৈরি করে রাখেন, তবে পাঠ পরিকল্পনার কাজটি আগেই হয়ে যাবে। ফলে বিষয় জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে। বক্তৃতার মাধ্যমে যা বোঝানো যায় না, ল্যাপটপ ব্যবহার করে শিক্ষক সেই সুবিধা নিতে পারেন। তাই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা উপকরণ হিসাবে ল্যাপটপ ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম।

মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর

শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর এখন একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা উপকরণ।শিক্ষক মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করে ল্যাপটপে তৈরি content বা অন্য কোন তথ্য সরাসরি শিক্ষার্থীদের দেখাতে পারেন। তার জন্য প্রয়োজন একটি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর,স্ক্রিন ও বিদ্যুৎ সংযোগ।

মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর চালু করার উপায়

সাধারণত প্রজেক্টরের সাথে একটি ডিসপ্লে কেবল এবং একটি পাওয়ার কেবল আলাদাভাবে দেওয়া থাকে।পাওয়ার কেবলের সাহায্যে প্রজেক্টরটিতে পাওয়ার দেওয়া হয় এবং ডিসপ্লে কেবলের সাহায্যে ল্যাপটপ থেকে প্রয়োজনমত তথ্য প্রজেক্টরের স্ক্রিনে দেখান হয়।পাওয়ার কেবলের একটি মাথা মাল্টিপ্লাগে দিয়ে আর একটি প্রজেক্টরের কানেকশন পোর্টে লাগাতে হয়।
প্রজেক্টটরের পাওয়ার সুইচ অন করলে প্রজেক্টটরের একটি লাল বাতি জ্বলবে।কোন কোন প্রজেক্টরে সুইচ থাকেনা । পাওয়ার কেব্‌ল লাগালেই লাল বাতি জ্বলে।এরপর পাওয়ার বাটনে চাপ দিলে সবুজ বাতি জ্বলবে এবং প্রজেক্টরটি চালু হবে। ডিসপ্লে কেবলের একটি অংশ ল্যাপটপের কানেকশন মাউথের অর্থাৎ ভিজিএ পোর্টের সাথে এবং অপর অংশ প্রজেক্টরের কানেকশন পোর্টে লাগাতে হবে।কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে এবং আপনা আপনি প্রজেক্টরটি চালু হবে।প্রথমে প্রজেক্টরের স্ক্রিনে একটি নীল পর্দা আসবে।

মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহারের সুবিধা

মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহারের নানাবিধ সুবিধা রয়েছে। আমদের দেশের শ্রেণিকক্ষগুলিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি।শিক্ষকের পক্ষে অনেক সময় শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর কাছে যাওয়া সম্ভব হয়না। ফলে-

- প্রজেক্টর ব্যবহার করে তাদের সবার মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়।
- নানা ধরনের ছবি,ভিডিও বা তথ্য সরাসরি শ্রেণিতে দেখানো যায়।.শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে উজ্জীবিত রাখা যায়।
- একঘেয়েমী দূর হয়।ছবি,ভিডিও দেখিয়ে একক, জোড়ায় বা দলগত কাজ দেওয়া যায়।
- শিক্ষকের পরিশ্রম কম হয়।
- শ্রেণিতে একটি শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরি হয়।

আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা সাধারণত বক্তৃতা পদ্ধতিতে পাঠ শুনতে অভ্যস্ত। তাই এ ধরনের প্রযুক্তির মাধ্যমে শ্রেণির কার্য পরিচালনা করতে পারলে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশী প্রাণবন্ত ও উজ্জীবিত হবে।

প্রশ্নমালা

১। শিখন শেখানোসামগ্রী / শিক্ষা উপকরণবলতে কী বোঝায়?
২। শিক্ষা উপকরণের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করুন।
৩। বিনামূল্যের ও স্বল্পমূল্যের শিক্ষা উপকরণের তালিকা প্রস্তুত করুন।
৪। হিসাববিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর উপর ১৫টি শিক্ষা উপকরণের তালিকা তৈরি করুন।
৫। শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত ও সংরক্ষণের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করুন।
৬। ICTশিক্ষা উপকরণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৭। শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ল্যাপটপ,ইন্টারনেটের ভূমিকা আলোচনা করুন।

ইউনিট ৬ : ৯ম-১০ম শ্রেণির হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের আলোচ্য বিষয়

সময়ের পরিবর্তন, মানুষের চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ফলে উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়ায় যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়। ব্যবসায়ের কাঠামোগত পরিবর্তন ও পরিধির বিস্তৃতি লাভ করার কারণেই সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর সূত্র ধরেই ইতালির জেনেভা শহরে Luca Pacioli ১৪৯৪ সালে তাঁর 'Summa deArithmetica, Geometria, Proportione et Proportionalite' নামক গ্রন্থে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তা ক্রমেই হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে মূল ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

যে পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনকে দুইবার লিপিবদ্ধ করা হয়, একবার একটি হিসাবের ডেবিট দিকে এবং আরেকবার অন্য একটি হিসাবের ক্রেডিট দিকে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাকে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির মাধ্যমে লেনদেনের দুটি পক্ষ অর্থাৎ ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ লিপিবদ্ধ করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি ডেবিট লিখনের জন্য সমান অর্থের ক্রেডিট লিখন হবে। ফলে বৎসরের যে কোনো সময় হিসাবের মোট ডেবিট টাকার অঙ্ক মোট ক্রেডিট টাকার অঙ্কের সমান হয়। সঠিকভাবে হিসাব প্রণয়নের জন্য যে ব্যবস্থায় লেনদেনসমূহের দ্বৈতস্বত্বা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাকে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।

এই ইউনিটের আলোচ্য বিষয়সমূহ হল-

৬.১ : দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতি বা বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা

৬.২ : ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়ের নিয়মাবলী

৬.৩ : হিসাবচক্র, মূলধন ও মুনাফা জাতীয় দেনদেনের পার্থক্য

৬.৪ : আর্থিক বিবরণী,একমালিকানা ব্যবসায়ের আর্থিক বিবরণী

৬.৫ : আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের বিবেচ্য বিষয়

৬.৬ : আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণে হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালার প্রয়োগ

৬.৭ : পণ্যের ক্রয়মূল্য, উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য

৬.১ : দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতি বা বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা

হিসাববিজ্ঞানের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বিজ্ঞানসম্মত,পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসাব সংরক্ষণের পদ্ধতিই হচ্ছে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে অর্থ বা আর্থিকমূল্যে পরিমাপযোগ্য প্রতিটি লেনদেনকে দ্বৈতস্বত্বায় প্রকাশ করা হয়। এর ফলে একটি হিসাবখাতকে প্রাপ্ত সুবিধার জন্য ডেবিট এবং অপর হিসাবখাতকে প্রদত্ত সুবিধার জন্য ক্রেডিট করা হয়। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি কতকগুলো মূলনীতি বা বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিম্নে এ পদ্ধতির মূলনীতি বা বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরা হলো -

* **দ্বৈতস্বত্বা (Two Parties) :** দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিটি লেনদেনের অবশ্যই দুটি পক্ষ থাকবে। যার একটি ডেবিট এবং অন্যটি ক্রেডিট পক্ষ। এ দুটি পক্ষকে লেনদেনের দ্বৈতস্বত্বাবলে। এর একটি পক্ষ সুবিধা গ্রহণ করে এবং বিপরীত পক্ষ সমপরিমাণ সুবিধা প্রদান করে।
* **দাতা-গ্রহীতা (Debtor-Creditor) :** প্রতিটি লেনদেনে স্বতঃসিদ্ধভাবে একজন দাতা এবং একজন গ্রহীতা থাকে। দাতা পক্ষ সুবিধা প্রদান করে, গ্রহীতা পক্ষ সমপরিমাণ সুবিধা গ্রহণ করে। অর্থাৎ যিনি বা যে পক্ষ সুবিধা প্রদান করে তাকে দাতা আর যে পক্ষ সুবিধা গ্রহণ করে তাকে গ্রহীতা বলে।
* **ডেবিট ও ক্রেডিট (Debit & Credit) :** দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির দুটি পক্ষ থাকবে। একটি পক্ষ ডেবিট, অপর পক্ষ ক্রেডিট।
* **পৃথক স্বত্বা (Separate Entity) :** দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে মালিককে ব্যবসায় হতে পৃথক স্বত্বা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।
* **সমান অঙ্কের আদান-প্রদান(Equivalent Transaction) :** প্রতিটি লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট টাকার পরিমাণ সমান হবে।
* **পূর্ণাঙ্গ হিসাব ব্যবস্থা(Complete Account System) :** এ পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণে হিসাব চক্রের ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা হয়। তাই দুতরফা দাখিলা একটি পূর্ণাঙ্গ হিসাব ব্যবস্থা।
* **সামগ্রিক ফলাফল (Total Result) :** যেহেতু দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে ডেবিট-ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে সমপরিমাণ টাকার অঙ্ক দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয়, তাই সামগ্রিক ফলাফল নির্ণয় সহজ হয়। মোট লেনদেনের ডেবিট দিকের যোগফল

ক্রেডিট দিকের যোগফলের সমান হয়। এর ফলে কোনো নির্দিষ্ট সময় শেষে সহজেই হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায়।

* **বিজ্ঞানসম্মত (Scientific) :** দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিই হচ্ছে একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত হিসাব ব্যবস্থা। যেখানে হিসাব রক্ষণে বৈজ্ঞানিক সূত্রসমূহ (ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের সূত্র, হিসাববিজ্ঞান নীতি, সমীকরণ) যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়।
* **নির্ভরযোগ্য (Reliable) :** এ পদ্ধতিতে ব্যক্তি, সম্পত্তি ও নামিক হিসাবসমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ লিপিবদ্ধ করা হয় বলে প্রয়োজনীয় সকল নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। এর ফলে কর্মচারীদের মালিকের প্রতি জবাবদিহিতা সৃষ্টি হয়।
* **নির্ভুল হিসাব ব্যবস্থা (Accurate Account System) :** দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হিসাব হতে রেওয়ামিল তৈরি করার মাধ্যমে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা প্রমাণ করা যায়।
* **তুলনামূলক বিশ্লেষণ (Comparative Analysis) :** দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ বর্তমান এবং অতীতের সংরক্ষিত হিসাবের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে। ফলে অতীত ও বর্তমানের হিসাব তথ্যের সাথে তুলনা করা যায়, যা ভবিষ্যতে নীতি নির্ধারণে সাহায্য করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি হচ্ছে একটি বিজ্ঞানসম্মত, পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি।

দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ

দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ, নির্ভরযোগ্য, বিজ্ঞানসম্মত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ পদ্ধতি। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির বিভিন্ন সুবিধা রয়েছে। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধার কারণে বড় বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়।

দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে হিসাব রাখা হয়। এ পদ্ধতিতে হিসাব রাখলে যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করে থাকে। নিম্নে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য সুবিধাসমূহ আলোচনা করা হলো-

* **পরিপূর্ণ হিসাব সংরক্ষণ (Complete Account Record) :** এ পদ্ধতিতে যেহেতু প্রতিটি লেনদেনের দুটি পক্ষকে ডেবিট ও ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে সমপরিমাণ টাকার/অর্থের অঙ্কে লিপিবদ্ধ করা হয়। তাই যেকোনো লেনদেনের পূর্ণাঙ্গ হিসাব এ পদ্ধতি হতে জানা যায়।
* **গাণিতিক নির্ভুলতা পরীক্ষা (Verification of Arithmetical Accuracy) :** এই পদ্ধতিতে যেহেতু প্রত্যেকটি ডেবিট দাখিলার জন্য সমমূল্যের একটি ক্রেডিট দাখিলা দেওয়া হয় সেহেতু হিসাবকালের শেষে মোট ডেবিট অবশ্যই মোট ক্রেডিটের সমান হবে। যদি মোট ডেবিট মোট ক্রেডিটের সাথে না মিলে তাহলে বুঝতে হবে হিসাবরক্ষণে নিশ্চয়ই কোথাও কোনো ভুলত্রুটি রয়ে গেছে। এ পদ্ধতিতে রেওয়ামিল (Trial Balance) তৈরি করে হিসাবরক্ষণের গাণিতিক নির্ভুলতা পরীক্ষা করা যায়।
* **লাভ-লোকসান নির্ণয় (Profit-loss Determination) :** দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে আয় ও ব্যয়জাতীয় হিসাবগুলো যথাযথভাবে রাখা হয়। ফলে হিসাব শেষে আয় ও ব্যয়ের হিসাবগুলো একত্রিত করে আয়ওব্যয় হিসাব (Income andExpenditure Account) বা আয় বিবরণী (Income Statement) প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের লাভওলোকসান সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।
* **আর্থিক অবস্থা নির্ণয় (Determination of Financial Condition) :** দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের সকল সম্পত্তি ও দায়ের হিসাব যথাযথভাবে রাখা হয়। ফলে যেকোনো সময় সকল সম্পত্তি ও দায়ের হিসাবগুলো একত্রিত করে আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করা যায় এবং তার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সঠিক আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা যায়।
* **তুলনামূলক বিশ্লেষণ (Comparative Analysis) :** এ পদ্ধতিতে হিসাব রাখলে চলতি হিসাবকালে আয়ওব্যয়, সম্পত্তি, দায় ইত্যাদিকে পূর্ববর্তী এক বা একাধিক হিসাবকালের অনুরূপ বিষয়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে এবং সেগুলোকে বিচারওবিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করা যেতে পারে।
* **মুনাফা বৃদ্ধি (Profit Increase) :** এ পদ্ধতি অনুযায়ী হিসাব রাখার জন্য যাবতীয় আয় ও মুনাফা সংক্রান্ত দফাগুলোর সঠিক হিসাব রাখা সম্ভব হয়। পূর্ববর্তী বছরগুলোর আয় ও মুনাফা সংক্রান্ত দফাগুলোর সাথে চলতি বছরের দফাগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে জানা যায়, কোন কোন দফা ব্যবসায়ের জন্য অধিক লাভজনক। এভাবে ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা সেসব দফাগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করে ব্যবসায়ের মুনাফা বৃদ্ধিকল্পে সচেষ্ট হয়।
* **ব্যয়হ্রাস (Cost Control/Reduction) :** এ ব্যবস্থায় খরচ ও ব্যয় সংক্রান্ত সকল দফাগুলোর সঠিক হিসাব রাখা সম্ভব হয়। বর্তমান বছরের দফাগুলোর সাথে পূর্ববর্তী বছরের দফাগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণে বুঝা যায়, কোন কোন খাতে অধিক ব্যয় নির্বাহ হচ্ছে। এ তথ্য জানার ফলে ব্যবস্থাপনা সেসব খাতে ব্যয়হ্রাসের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে থাকে এবং প্রতিটি

ব্যয়খাতে একটি গড় পরিমাণ নির্ধারণ করে তার সাহায্যে প্রতি বছরের ব্যয়খাতকে নিয়ন্ত্রণ করে।

* **সঠিক আয়কর ও বিক্রয়কর নির্ধারণ (Proper Fixation of Income Tax & Sales Tax) :** এ পদ্ধতিতে হিসাব রাখলে সঠিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখা সম্ভব হয়। এ কারণে কারবারে আয়কর বিবৃতি ও বিক্রয়কর বিবৃতি 'কর কর্তৃপক্ষ' কর্তৃক সহজেই স্বীকৃত ও গৃহীত হয়। এভাবে একটি কারবার অত্যধিক কর প্রদান হতে অব্যাহতি পায়।
* **পণ্য মূল্য নির্ধারণ (Product Price Appraisement) :** এ পদ্ধতিতে শৃঙ্খলার সাথে হিসাব রাখা হয় বলে ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য নির্ধারণও অনেকটা সহজ হয়।
* **পাওনা আদায় এবং দেনা পরিশোধের সুবিধা (Advantage of Due Collection & Due Payment) :** এ পদ্ধতিতে হিসাব রাখলে কোনো ব্যবসায়ী সহজেই বুঝতে পারে তার দেনাদারদের নিকট কত টাকা পাওনা এবং পাওনাদারদের নিকট কত টাকা দেনা আছে। ফলে তার পাওনা আদায় এবং দেনা পরিশোধে সুবিধা হয়।
* **জালিয়াতি প্রতিরোধ (Fraud Prevention) :** এ পদ্ধতি জালিয়াতি প্রতিরোধে যথেষ্ট সহায়ক হয়। কেননা এ পদ্ধতিতে হিসাব রেখে তার রদবদল করা তেমন সহজ কাজ নয়। ফলে হিসাবরক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের উপর নৈতিক চাপ সৃষ্টি হয়।
* **জালিয়াতির অনুসন্ধান (Fraud Investigation) :** এ পদ্ধতিতে শুধু জালিয়াতির সম্ভাবনা হ্রাস পায় তা-ই নয়, কোনো অসৎ কর্মচারী যদি কোনো জালিয়াতি করেও ফেলে তবে তা সহজেই খুঁজে বের করা যায়।
* **ভবিষ্যৎ রেফারেন্স (Future Reference) :** এ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হিসাব ভবিষ্যতে যেকোনো সময় রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে সুবিধা হয়।
* **তথ্যের সরবরাহ (Supply of Information) :** ব্যবসায়িক নীতি নির্ধারণ এবং সেগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও পরিসংখ্যানের সরবরাহ এ পদ্ধতিতে সহজেই পাওয়া যায়। ফলে মালিক অথবা পরিচালকমণ্ডলী নিপুণতার সাথে ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারেন।
* **সহজ প্রয়োগ (Easy Application) :** দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি ছোট, মাঝারি, বড় যেকোনো প্রতিষ্ঠানে পরিপূর্ণ সফলতার সাথে সহজেই প্রয়োগ করা যায়।
* **নীতি নির্ধারণ (Policy Determination) :** দুতরফা দাখিলা হিসাবব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণ ও কর্মপন্থা নিরূপণের জন্য প্রয়োজনীয় ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সহজেই পাওয়া যায়।
* **জবাবদিহিতা সৃষ্টি (Creation of Accountability) :** দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হিসাব নির্ভরযোগ্য হওয়ায় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে জবাবদিহিতা সৃষ্টিতে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।
* **মূলধন ও মুনাফার পৃথকীকরণ (Differentiate Capital and Profit) :** দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করা হলে মূলধন ও রাজস্ব বা মুনাফাজাতীয় লেনদেনের মধ্যে পৃথকীকরণে সুবিধা হয়, যার ফলে মূলধন ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করা যায়।
* **সর্বাধিক জনপ্রিয় হিসাব পদ্ধতি (Most Popular Account System):** উপরিউক্ত সুবিধাগুলোর জন্য এ পদ্ধতি পৃথিবীর সর্বত্র একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করছে।

  পরিশেষে বলা যায়, হিসাবরক্ষণের যেসকল উদ্দেশ্য হিসাব রাখার ক্ষেত্রে রয়েছে তাদের সবগুলোই দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে অর্জন করা সম্ভব। এজন্যই বলা হয়, দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিই হিসাবরক্ষণের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ, নির্ভরযোগ্য এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি।

হিসাব সমীকরণ :

কোন প্রতিষ্ঠানের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মোট সম্পদের পরিমাণ, মালিকানা স্বত্ব ও বহির্দায়ের সমান হবে। যে সমীকরণের মাধ্যমে এই সমতা প্রমাণ করা হয়, তাকেই হিসাব সমীকরণ বলা হয়। হিসাবশাস্ত্রবিদগণ হিসাব সমীকরণ (সম্পদ = দায় + মালিকানা স্বত্ব) - এর উপাদানগুলোর পরিবর্তনকারী ঘটনাকে লেনদেন বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ সম্পদ, দায় এবং মালিকানা স্বত্বে পরিবর্তন আনয়নকারী ঘটনা রেনদেন হিসাবে গণ্য হয়।

সম্পদ : সম্পদ বলতে বুঝায় অর্থনৈতিক পরিসম্পদ, যা কোনো ব্যবসায়ের মালিকানাধীন থাকে এবং যা মুনাফা অর্জনের কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন : ব্যবসায়ের মালিকানাধীন আসবাবপত্র, দালানকোঠা, কলকব্জা ইত্যাদি।

দায় : দায় হচ্ছে ব্যবসায়ের আর্থিক দায়বদ্ধতা, যা ব্যবসায়ের একটি নির্দিষ্ট সময় পরে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে অর্থাৎ ব্যবসায়ের মোট সম্পদের উপর তৃতীয় পক্ষের দাবিই হচ্ছে দায়।

মালিকানা স্বত্ব : ব্যবসায়ের মোট সম্পদ থেকে তৃতীয় পক্ষের দাবি বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তা-ই হচ্ছে মালিকানা স্বত্ব। অর্থাৎ মোট সম্পদের উপর মালিকের যে দাবি, তা-ই হচ্ছে মালিকানা স্বত্ব। মালিকানা স্বত্বকে প্রভাবিত করার চারটি উপাদান রয়েছে। যথা :

- ❖ মালিকের বিনিয়োগ
- ❖ আয়
- ❖ উত্তোলন
- ❖ ব্যয় বা খরচ

৬.২ : ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়ের নিয়মাবলী

ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের সূত্রসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো-

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের পদ্ধতি-

১. ব্যক্তিবাচক হিসাব	⇒ সুবিধা গ্রহণকারী	ডেবিট
	⇒ সুবিধা প্রদানকারী	ক্রেডিট
২. সম্পত্তিবাচক হিসাব	⇒ সম্পত্তি আসলে	ডেবিট
	⇒ সম্পত্তি চলে গেলে	ক্রেডিট
৩. নামিক হিসাব	⇒ সকল প্রকার খরচ ও ক্ষতি	ডেবিট
	⇒ সকল প্রকার আয় ও লাভ	ক্রেডিট

আধুনিক ধারণা/সমীকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের সূত্র নিম্নে আলোচনা করা হলো-

$\Rightarrow$ Assets = Liabilities + Equity

$\Rightarrow A = L + E$

$\Rightarrow A = L + [(C - D) + (R - E)]$

$\Rightarrow A = L + C + R - E - D$

এখানে, A = Assets (সম্পদ), L = Liabilities (দায়), C = Capital (মূলধন), D = Drawings (উত্তোলন), R = Revenues (আয়), E = Expenses (ব্যয়)।

উপর্যুক্ত সমীকরণের মধ্যে হিসাবকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিম্নে এ সকল হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের নীতিমালা আলোচনা করা হলো-

সম্পদ, ব্যয় ও উত্তোলন হিসাবে স্বাভাবিক অবস্থায় ডেবিট ব্যালেন্স প্রকাশ করে। সুতরাং সম্পদ, ব্যয় ও উত্তোলনের পরিমাণ বাড়লে ডেবিট হবে এবং কমলে ক্রেডিট হবে। অন্যদিকে দায়, মূলধন ও আয় হিসাবে স্বাভাবিক অবস্থায় ক্রেডিট ব্যালেন্স প্রকাশ করে। সুতরাং দায়, মূলধন ও আয়ের পরিমাণ বাড়লে ক্রেডিট হবে এবং কমলে ডেবিট হবে।

নিম্নে ছক আকারে এ সূত্রসমূহ দেখানো হলো :

১. সম্পদ	⇒বৃদ্ধি	ডেবিট
	⇒হ্রাস	ক্রেডিট
২. দায়	⇒বৃদ্ধি	ক্রেডিট
	⇒হ্রাস	ডেবিট
৩. মূলধন	⇒বৃদ্ধি	ক্রেডিট
	⇒হ্রাস	ডেবিট
৪. আয়	⇒বৃদ্ধি	ক্রেডিট
	⇒হ্রাস	ডেবিট
৫. ব্যয়	⇒বৃদ্ধি	ডেবিট
	⇒হ্রাস	ক্রেডিট
৬. উত্তোলন	⇒বৃদ্ধি	ডেবিট
	⇒হ্রাস	ক্রেডিট

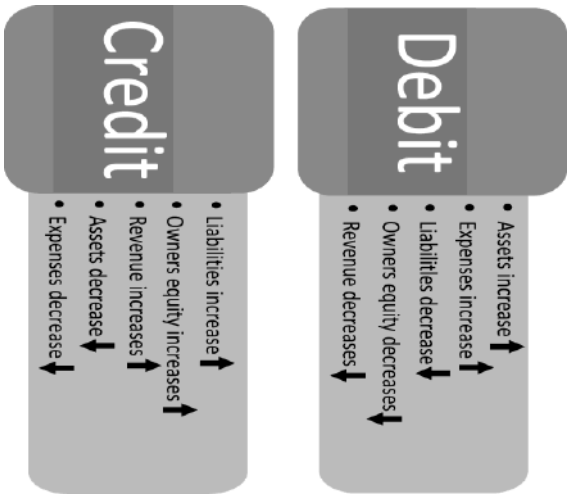

সমীকরণ অনুযায়ী ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের সূত্র সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে প্রকাশ করা হলো-

সম্পদ, ব্যয় এবং উত্তোলন	⇒ বৃদ্ধি	ডেবিট
	⇒হ্রাস	ক্রেডিট
দায়, মূলধন এবং আয়	⇒ বৃদ্ধি	ক্রেডিট
	⇒হ্রাস	ডেবিট

৬.৩ : হিসাবচক্র, মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের পার্থক্য

হিসাবচক্র

হিসাবরক্ষণ প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক আবর্তনকে হিসাব চক্র বলে। হিসাববিজ্ঞানের চলমান ধারণা অনুযায়ী ধরে নেওয়া হয় কারবারের কার্যক্রম অনন্তকাল ধরে অব্যাহত থাকবে। কিন্তু কারবারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষসমূহ একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর কারবারের আর্থিক ফলাফল জানার জন্য আগ্রহী থাকে। এ অবস্থায় অনন্ত হিসাবকালকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিসাবকালে বিভক্ত করে, ক্ষুদ্র হিসাবকালের আর্থিক ফলাফল তথা লাভ-লোকসানের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। ফলে হিসাববিজ্ঞানের কার্যক্রম একটি হিসাবকালকে কেন্দ্র করে ধারাবাহিকভাবে আবর্তিত হতে থাকে। হিসাবরক্ষণের এ আবর্তনকে Accounting Cycle বা হিসাব চক্র বলে। লেনদেন শনাক্তকরণের মাধ্যমে এ আবর্তন শুরু হয় এবং প্রারম্ভিক জাবেদা দাখিলা প্রণয়নের মাধ্যমে এটি আবর্তিত হতে থাকে।

হিসাববিজ্ঞানের কার্যক্রমসমূহের এ আবর্তনকে যদি চিত্রের সাহায্যে দেখানো হয় তবে একটি চক্রের মতো সৃষ্টি হবে। আর এই চক্রকেই হিসাবচক্র (Accounting Cycle) বলে।

হিসাবচক্রের বিভিন্ন ধাপসমূহ

হিসাবচক্র একটি কারবারি প্রতিষ্ঠানের হিসাব বিষয়ক বিভিন্ন কার্যাবলির ধারাবাহিক কার্যক্রমসমূহের পর্যায়ক্রমিক উপস্থাপন। হিসাবচক্র দ্বারা একটি প্রতিষ্ঠানের হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলির বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে হিসাবচক্র উপস্থাপন করে এর উপাদানসমূহ আলোচনা করা হলো-

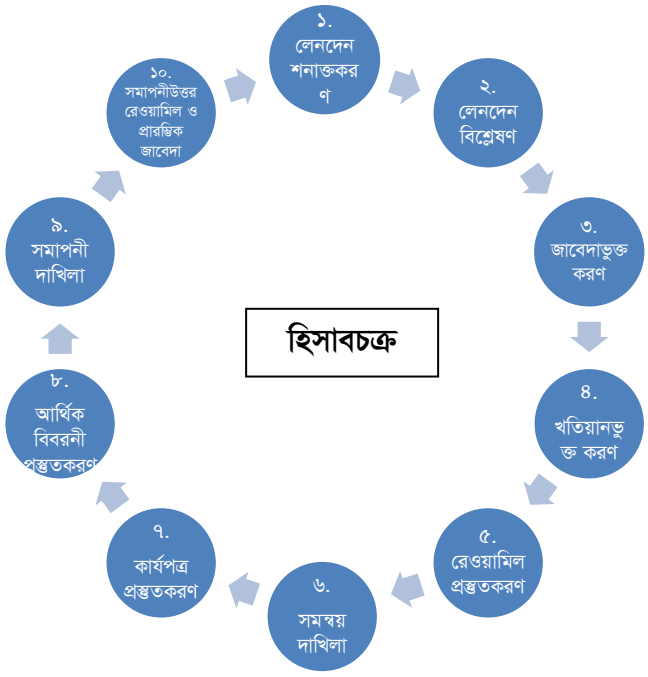

ধাপসমূহ সম্পন্ন হওয়ার পর পরবর্তী হিসাবকালে এর কার্যক্রম আবার ধারাবাহিকভাবে শুরু হবে।

* **লেনদেন শনাক্তকরণ (Identification of Transaction) :** হিসাব চক্রের প্রথম ধাপ হলো লেনদেন শনাক্তকরণ। একটি প্রতিষ্ঠানে একটি হিসাবকালে অসংখ্য ঘটনা সংঘটিত হয়। এসব ঘটনার মধ্যে কিছু ঘটনা আর্থিক এবং কিছু ঘটনা অনার্থিক। আর্থিক ঘটনাকে বলা হয় লেনদেন। এই লেনদেন শনাক্ত করাই হিসাব চক্রের ১ম ধাপের কাজ।
* **লেনদেন বিশ্লেষণ (Analyzing of Transaction) :** প্রতিটি লেনদেন বিশ্লেষন করে সংশ্লিষ্ট হিসাবগুলো চিহ্নিত করা হয় হিসাবচক্রের এই ২য় ধাপে।
* **জাবেদাভুক্তকরণ (Journalisation) :** জাবেদাভুক্তকরণকে হিসাব চক্রের ৩য় ধাপ বলা হয়। লেনদেন শনাক্ত করার পর তা দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী ডেবিট ও ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে তারিখের ক্রমানুসারে ব্যাখ্যাসহ হিসাবের বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়। এই লিপিবদ্ধকরণকে জাবেদাভুক্তকরণ বলে। জাবেদাভুক্তকরণের মাধ্যমে লেনদেনসমূহ হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধকরণের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়।
* **খতিয়ানভুক্তকরণ (Posting to ledger) :** লেনদেন খতিয়ানে স্থানান্তর হিসাব চক্রের ৪র্থ ধাপ। জাবেদায় লিপিবদ্ধকৃত লেনদেনকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে খতিয়ানে স্থানান্তর করা হয়। এখানে লেনদেনকে শ্রেণিবিন্যাস করে সাজিয়ে লেখা হয়। হিসাব চক্রের এ পর্যায়ে জাবেদাভুক্ত লেনদেনসমূহ হতে সমজাতীয় লেনদেনসমূহকে একই শিরোনামের অধীনে সংক্ষিপ্ত আকারে পাকা বইয়ে স্থানান্তর করা হয়। আর হিসাবের এ স্থানান্তরকে খতিয়ানভুক্তকরণ বলে।

* **রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ (Preparation of Trial Balance) :** রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ হিসাব চক্রের ৫ম ধাপ। এ ধাপে খতিয়ানে স্থানান্তরিত লেনদেনসমূহের জের নির্ণয় করা হয়। উক্ত জের যদি ডেবিট দিকে বড় হয় তাকে ডেবিট জের বলে। আর যদি ক্রেডিট দিকে বড় হয় তাকে ক্রেডিট জের বলে। খতিয়ানসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করে ডেবিট জেরগুলো ডেবিট কলামে এবং ক্রেডিট জেরগুলো ক্রেডিট কলামে লিপিবদ্ধকরণকে রেওয়ামিল বলে। এ রেওয়ামিলের সাহায্যে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা হয়।

* **সমন্বয় দাখিলা (Adjusting Entries) :** এটি হলো হিসাব চক্রের ৬ষ্ঠ ধাপ। সংযোগ ধারণা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট হিসাবকালের প্রকৃত আয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হিসাবকালের প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় করে একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল নির্ণয় ও আর্থিক অবস্থা প্রকাশ করা হয়। সংশ্লিষ্ট হিসাবকালের প্রকৃত আয় ও প্রকৃত ব্যয় নিরূপণের জন্য যদি কোনো বকেয়া ও অগ্রিম আয় ও ব্যয়সমূহ অসমন্বয় থাকে উহা সংশ্লিষ্ট দফার সাথে সমন্বয় করার জন্য যে জাবেদা দাখিলা প্রদান করা হয় তাকে সমন্বয় দাখিলা বলে।

* **কার্যপত্র প্রস্তুতকরণ (Preparation of Work Sheet) :** এটি হলো হিসাবচক্রের ৭ম ধাপ। চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতের পূর্বে কার্যপত্র (Work Sheet) প্রস্তুত করা হয়। আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত সহজতর করার উদ্দেশ্যে ঐচ্ছিক কাজ হিসেবে কার্যপত্র প্রস্তুত করা হয়।

* **আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ (Preparation of Financial Statement) :** এটি হিসাব চক্রের ৮ম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এ ধাপে একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল নির্ণয় ও একটি নির্দিষ্ট তারিখে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা প্রকাশের জন্য কতিপয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। এই বিবরণীসমূহকে আর্থিক বিবরণী বলে। আর্থিক বিবরণীর দ্বারা একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা জানা যায়, যা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

* **সমাপনী দাখিলা (Closing Entries) :** আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের পর মুনাফাজাতীয় হিসাবসমূহ অর্থাৎ আয়-ব্যয়ের উদ্বৃত্তসমূহ বন্ধ করার জন্য যে জাবেদা দাখিলা প্রদান করা হয় তাকে সমাপনী দাখিলা বলে। যেহেতু মুনাফাজাতীয় দফাসমূহের প্রভাব পরবর্তী হিসাবকালে থাকে না, সেহেতু এই হিসাবগুলো সংশ্লিষ্ট হিসাবকালে বন্ধ করা হয়ে থাকে। সমাপনী দাখিলা হিসাব চক্রের ৯ম ধাপ।

* **সমাপনী উত্তর রেওয়ামিল ও প্রারম্ভিক জাবেদা (Post Closing Trial Balance & Opening Journal) :** সমাপনী দাখিলার পর সকল প্রকার আয়-ব্যয়বাচক হিসাব বন্ধ হয়ে যায়। ফলে আয়-ব্যয় হিসাব ছাড়া সম্পত্তি, দায়-দেনা ও মূলধনজাতীয় হিসাবের জের দ্বারা সমাপনী উত্তর রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয় এবং পরবর্তী হিসাব বছর শুরু করার জন্য প্রারম্ভিক জাবেদা প্রস্তুত করা হয়। এটি হিসাব চক্রের ১০ম ধাপ।

মূলধন ও মুনাফাজাতীয় লেনদেন

মূলধনজাতীয় লেনদেন (Capital Transaction) : যে সমস্ত লেনদেনসমূহের ফলাফল বা সুবিধা দীর্ঘমেয়াদি অর্থাৎ একটি হিসাবকালের (১ বছরের) অধিক পর্যন্ত বিদ্যমান এবং যা প্রতিষ্ঠানে খুবই অনিয়মিতভাবে সংঘটিত হয় তাই মূলধনজাতীয় লেনদেন। যেমন–যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ক্রয়, প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ ও মূলধন আনয়ন ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠানে এ রকম লেনদেন যেমন- ঘনঘন বা নিয়মিত সংঘটিত হয় না তেমনি এগুলো হতে প্রাপ্ত সুবিধাও দীর্ঘমেয়াদি, তাই এগুলো মূলধনজাতীয় লেনদেন। এ জাতীয় লেনদেনসমূহ দ্বারা উদ্বৃত্তপত্র বা আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রণয়ন করা হয়।

মূলধনজাতীয় লেনদেনের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ

* মূলধনজাতীয় লেনদেন অনিয়মিতভাবে সংঘটিত হয়।
* এ জাতীয় লেনদেনের ফলাফল বা উপযোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়।
* এ জাতীয় লেনদেনগুলো বড় অঙ্কের হয়ে থাকে।
* এ জাতীয় লেনদেনের ফলে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও দায়ের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।
* প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ জাতীয় লেনদেন সংঘটিত হয়।

মুনাফা/রাজস্ব জাতীয় লেনদেন (Revenue Transaction) : যে সমস্ত লেনদেন প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রমের ফলে এবং মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ মুনাফা বা আয় অর্জনের লক্ষ্যে বারবার/ পুণ:পুণ বা নিয়মিতভাবে সংঘটিত হয় তাকে মুনাফাজাতীয় লেনদেন বলে। যেমন- পণ্য ক্রয়, পণ্য বিক্রয়, মজুরি প্রদান, বেতন প্রদান, ভাড়া প্রদান, কমিশন প্রাপ্তি ইত্যাদি লেনদেন। এ মুনাফাজাতীয় লেনদেনসমূহ দ্বারা মুনাফা সংক্রান্ত হিসাব অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় হিসাব ও লাভ-ক্ষতি হিসাব প্রস্তুত করা হয়।

মুনাফাজাতীয় লেনদেনের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ-

* মুনাফাজাতীয় লেনদেন বারবার নিয়মিতভাবে সংঘটিত হয়।

* এ জাতীয় লেনদেনের উপযোগ বা সেবা স্বল্পস্থায়ী হয়। সাধারণত এক বছরের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায়।
* এ জাতীয় লেনদেনগুলো সাধারণত ছোট অঙ্কের হয়ে থাকে।
* এ জাতীয় লেনদেনের ফলে স্বত্বাধিকারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।
* প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে এ জাতীয় লেনদেন সংঘটিত হয়।

মূলধন ও মুনাফাজাতীয় আয় ও ব্যয়ের লেনদেনের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Capital and Revenue Transaction)

হিসাববিজ্ঞানের হিসাবকাল ধারণার (Accounting Period Concept) কারণে একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর (সাধারণত ১ বছর বা তার চেয়ে কম) প্রতিষ্ঠানের লাভ-লোকসান নির্ণয় করতে হয়। আর এই লাভ-লোকসান নির্ণয় করতে গেলে লেনদেন ও হিসাবসমূহকে তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী দুইটি শ্রেণিতে বিভক্ত করতে হয়। যথা-মূলধন ও মুনাফা (রাজস্ব)। কারণ একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের লাভ-লোকসান নির্ণয় করতে হলে অর্জিত শুধু মুনাফাজাতীয় আয় (প্রাপ্ত ও প্রাপ্য যাই হোক)সমূহ হতে ঐ নির্দিষ্ট হিসাবকালের মধ্যে প্রদত্ত ও প্রদেয় মুনাফাজাতীয় ব্যয়সমূহ বাদ দিতে হয়। পক্ষান্তরে, মূলধনজাতীয় আয়/প্রাপ্তি ও ব্যয়/পরিশোধ জাতীয় হিসাবসমূহ দ্বারা উদ্বৃত্তপত্র তৈরি করা হয়। সুতরাং লেনদেনসমূহকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা যায় । যথা- (ক) মূলধনজাতীয় এবং (খ) মুনাফাজাতীয়। এগুলোকে পুনরায় বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় যা নিম্নে দেখানো হলো -

১. মূলধনজাতীয় লেনদেনকে ০৪ (চার) ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-
   (ক) মূলধনজাতীয় পরিশোধ (CapitalPayment)
   (খ) মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি (Capital Receipts)
   (গ) মূলধনজাতীয় আয় (Capital Income)
   (ঘ) মূলধনজাতীয় ব্যয় (Capital Expenditure)

২. মুনাফাজাতীয় লেনদেনকে প্রধানত ০২ (দুই) ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-
   (ক) মুনাফাজাতীয় আয় (Revenue Income)
   (খ) মুনাফাজাতীয় ব্যয় (Revenue Expenditure)

আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি অনুসারে লেনদেনের শ্রেণিবিন্যাস ছকের মাধ্যমে নিচে উপস্থাপিত হলো-

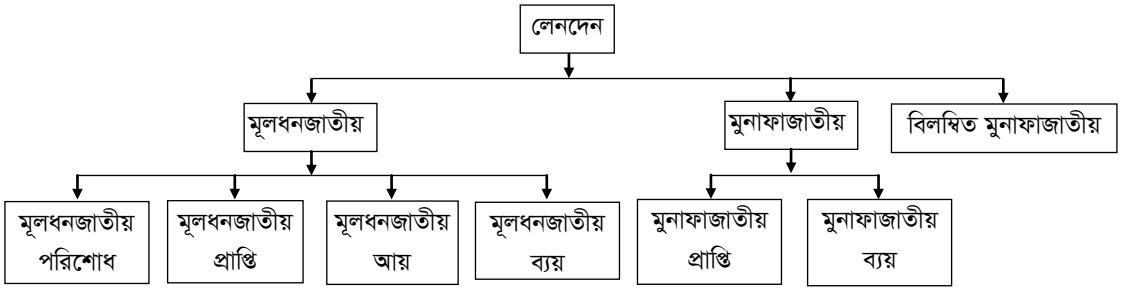

নিম্নে সংক্ষেপে আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি অনুসারে লেনদেনের শ্রেণিবিন্যাস আলোচনা করা হলো-

১. মূলধন জাতীয় (Capital Related)

(ক) মূলধনজাতীয় পরিশোধ (Capital Payment) : কোনো মূলধনজাতীয় প্রাপ্তিকে পরবর্তী সময়ে যখন পরিশোধ করা হয় তখন তাকে মূলধনজাতীয় পরিশোধ বলে। যেমন- বন্ধকি ঋণ বা ঋণপত্র পরিশোধ, মালিক কর্তৃক নগদ ও পণ্য উত্তোলন ইত্যাদি।

(খ) মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি (Capital Receipts) : যেসকল প্রাপ্তি প্রতিষ্ঠানে বারবার সংঘটিত হয় না এবং একবার প্রাপ্তি ঘটলে তাদের ফলাফল বা উপযোগ দীর্ঘদিন ধরে ভোগ করা যায় ঐসকল প্রাপ্তিকে মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি বলে। যেমন- মালিক কর্তৃক ব্যবসায়ে প্রদত্ত মূলধন, ঋণপত্র ইস্যু, বড় অঙ্কের বিভিন্ন অনুদানপ্রাপ্তি ইত্যাদি।

(গ) মূলধনজাতীয় আয় (Capital Income) : যেসকল আয় প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত ও স্বাভাবিক কার্যক্রম হতে অর্জিত না হয়ে অন্যান্য অনিয়মিত ও অস্থায়ী উৎস থেকে অর্জিত হয় ঐ সকল আয়কে মূলধনজাতীয় আয় বলে। যেমন- অধিহারে শেয়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ, স্থায়ী সম্পত্তির বিক্রয়জনিত লাভ ইত্যাদি।

(ঘ) মূলধনজাতীয় ব্যয় (Capital Expenditure) : যেসকল ব্যয় প্রতিষ্ঠানে বারবার ঘটে না এবং একবার ঘটলে তাদের ফলাফল বা উপযোগ দীর্ঘকাল ধরে ভোগ করা যায়, ঐ সকল ব্যয়কে মূলধনজাতীয় ব্যয় বলে। যেমন- জমি, দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও অন্যান্য স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়, সম্পত্তির সংযোজন, সম্প্রসারণ, সংস্থাপন ও পরিবহন ব্যয়, বিনিয়োগ ইত্যাদি।

২. মুনাফাজাতীয় (Revenue Related)

(ক) মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তি বা আয় (Revenue Receipts or Income) : ব্যবসায়ের দৈনন্দিন স্বাভাবিক কার্যাবলি দ্বারা পুণঃপুণ অর্জিত আয়কে মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তি বা আয় বলে। যেমন- পণ্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ, প্রাপ্ত বা প্রাপ্য ভাড়া, কমিশন, বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি ইত্যাদি।

(খ) মুনাফাজাতীয় ব্যয় (Revenue Expenditure) : ব্যবসায়ের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যেসব ব্যয় বারবার সংঘটিত হয় এবং যেসব ব্যয়ের উপযোগ ও কার্যকারিতা স্বল্পসময় তথা একটি আর্থিক বছরের মধ্যে নিঃশেষিত হয় এ জাতীয় ব্যয়কে মুনাফাজাতীয় ব্যয় বলে। যেমন- পণ্য ক্রয়, পণ্য ক্রয়ের পরিবহন, মজুরি, বেতন, অবচয়সমূহ ইত্যাদি।

৩. বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয় (Deferred Revenue Expenditure) : যেসকল মুনাফাজাতীয় ব্যয়ের উপযোগ বা সুবিধা একাধিক হিসাবকাল ধরে চলমান থাকে ঐ সকল মুনাফাজাতীয় ব্যয়ের যে অংশ সমন্বয়পূর্বক পরবর্তী হিসাবকালে স্থানান্তর করা হয় তাকে বিলম্বিত মুনাফাজাতীয় ব্যয় বলে। যেমন- বড় অঙ্কের বিজ্ঞাপন খরচ, নতুন পণ্যের গবেষণা ব্যয়, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর ব্যয় ইত্যাদি।

মূলধনজাতীয় লেনদেন ও মুনাফাজাতীয় লেনদেনের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Capital transaction and Revenue transaction)

যে সমস্ত লেনদেনসমূহের ফলাফল বা সুবিধা দীর্ঘমেয়াদি অর্থাৎ একটি হিসাবকালের অধিক পর্যন্ত বিদ্যমান এবং যা প্রতিষ্ঠানে খুবই অনিয়মিতভাবে সংঘটিত হয়, তাকে মূলধনজাতীয় লেনদেন বলে।

পক্ষান্তরে যে সমস্ত লেনদেন প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কাজকর্মের ফলে এবং মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ মুনাফা বা আয় অর্জনের লক্ষ্যে বার বার / পুণঃপুণ বা নিয়মিতভাবে সংঘটিত হয় তাকে মুনাফা বা রাজস্ব জাতীয় লেনদেন বলে।

মূলধন ও মুনাফা উভয় দফার সাথে লেনদেন যুক্ত থাকলেও এদের ধরণ, পরিমাণ, উদ্দেশ্য, ফলাফল প্রভৃতির আলোকে বেশ কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য বর্ণনা করা হলো–

পার্থক্যের বিষয়	মূলধনজাতীয় লেনদেন	মুনাফা জাতীয় লেনদেন
১. সংজ্ঞা (Definition)	যেসকল লেনদেনের সুবিধা বা উপযোগ একাধিক হিসাবকালব্যাপী চলমান থাকে তাদেরকে মূলধনজাতীয় লেনদেন বলে।	যেসকল লেনদেনের সুবিধা বা উপযোগ একটি হিসাবকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাদেরকে মুনাফাজাতীয় লেনদেন বলে।
২. প্রকৃতি (Nature)	এটি সম্পদ ও দায় হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রান্ত লেনদেন।	এটি প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কাজকর্ম সংক্রান্ত লেনদেন।
৩.লক্ষ্য(Goal/Objective)	এ জাতীয় লেনদেন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংঘটিত হয়।	এ জাতীয় লেনদেন প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনা ও মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে সংঘটিত হয়।
৪. সংঘটন (Occurrence)	এ ধরনের লেনদেন অনিয়মিতভাবে সংঘটিত হয়।	এ ধরনের লেনদেন নিয়মিতভাবে সংঘটিত হয়।
৫. প্রভাব (Impact)	এ জাতীয় লেনদেনের ফলে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও দায়ের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।	এ জাতীয় লেনদেনের ফলে মালিকানাস্বত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।
৬.পৌনঃপুনিকতা (Recurrency)	এ জাতীয় লেনদেন নিয়মিতভাবে পুণঃপুণ সংঘটিত হয় না।	এ জাতীয় লেনদেন নিয়মিতভাবে পুণঃপুণসংঘটিত হয়।
৭.ফলাফল ও সুবিধা (Result & Advantage)	এ ধরনের লেনদেনের ফলাফল বা সুবিধা দীর্ঘমেয়াদি হয়।	এ ধরনের লেনদেনের ফলাফল বা সুবিধা স্বল্পমেয়াদি হয়।
৮. পরিমাণ (Amount)	এ জাতীয় লেনদেন বড় অঙ্কের হয়।	এ জাতীয় লেনদেন ছোট অঙ্কের হয়।

৯.হিসাব লিখন(Recording)	এ ধরনের লেনদেনকে উদ্বৃত্তপত্রে দেখানো হয়।	এ ধরনের লেনদেনকে ক্রয়-বিক্রয় হিসাব ও লাভ-ক্ষতি হিসাবে দেখানো হয়।
১০.পূর্ব অনুমতি(Pre-permission)	এ জাতীয় লেনদেনের পূর্বে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন হয়।	এ জাতীয় লেনদেনের পূর্বে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতির তেমন একটা প্রয়োজন হয় না।

মূলধন ও মুনাফাজাতীয় লেনদেনের পার্থক্যকরণের প্রয়োজনীয়তা : মূলধন ও মুনাফাজাতীয় লেনদেনের প্রভাব শুধুমাত্র মুনাফাজাতীয় আয় ও ব্যয়ের ভিত্তিতে আয় বিবরণী প্রস্তুত করে ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। অপরদিকে শুধুমাত্র মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি ও মূলধনজাতীয় ব্যয়ের ভিত্তিতে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করে সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। এই দুই ধরনের লেনদেন পরস্পর অবস্থান পরিবর্তন করে আর্থিক বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হলে কখনই ব্যবসায়ের প্রকৃত লাভ-ক্ষতি,সম্পদ,দায় ও মালিকানা স্বত্বের প্রকৃত সঠিক পরিমাণ জানা যাবে না।

৬.৪ : আর্থিক বিবরণী, একমালিকানা ব্যবসায়ের আর্থিক বিবরণী

আর্থিক বিবরণী (Financial Statements)

প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে আর্থিক অবস্থা জানার প্রয়োজন হয়। আর্থিক অবস্থার মধ্যে দুটো বিষয় জরুরিভাবে জানার প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে একটি হলো কারবারের লাভ-ক্ষতির পরিমাণ এবং অপরটি হলো কারবারের সম্পদ ও দায়-দেনার পরিমাণ। লাভ-ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য বিশদ আয় বিবরণী বা Comprehensive Income Statement এবং সম্পদ ও দায়-দেনার পরিমাণ নির্ধারণের জন্য আর্থিক অবস্থার বিবরণী বা Statement of Financial Position তৈরি করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য পূর্বে বিশদ আয় বিবরণীর পরিবর্তে লাভ-ক্ষতি হিসাব/আয় বিবরণী (Profit & Loss Account/Income Statement) এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীর পরিবর্তে উদ্বৃত্তপত্র (Balance Sheet) তৈরি করা হতো। এ অধ্যায়ে আর্থিক বিবরণীর বিভিন্ন অংশের প্রস্তুত প্রণালি এবং এর বাস্তব প্রয়োগ আলোচনা করা হয়েছে।

একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা জানার জন্য যেসকল সুশৃঙ্খল বিবরণী তৈরি করা হয় তাকে আর্থিক বিবরণী বলে। আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আর্থিক বিবরণী তৈরির মাধ্যমে একটি কারবারের আর্থিক ফলাফল, আর্থিক অবস্থা এবং নগদ প্রবাহ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় এবং এ সকল বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও সার্বিক অবস্থা মূল্যায়নের অন্যতম ভিত্তি আর্থিক বিবরণী।

আর্থিক বিবরণীর বৈশিষ্ট্য (Features of Financial Statement)

* **মুদ্রামানে প্রকাশ :** আর্থিক বিবরণীতে বর্ণিত যাবতীয় তথ্যসমূহ সংশ্লিষ্ট কোম্পানি যে দেশে অবস্থিত সে দেশের মুদ্রার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। আর্থিক বিবরণীর আয়, ব্যয়, সম্পদ ও দায়সমূহ বিভিন্ন মুদ্রার নামে যেমন- টাকা/রূপি/ডলার/পাউন্ড ইত্যাদির মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়।
* **শিরোনাম :** আর্থিক বিবরণীর বিভিন্ন অংশকে সুনির্দিষ্ট শিরোনামের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। যেমন- আয় বিবরণী, মালিকানা স্বত্ব বিবরণী, সংরক্ষিত আয় বিবরণী, উদ্বর্তপত্র ইত্যাদি।
* **হিসাবকাল :** আর্থিক বিবরণী কোনো নির্দিষ্ট তারিখের জন্য না কি কোনো সুনির্দিষ্ট মেয়াদকালের জন্য তৈরি করা হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়। আয় বিবরণী, মালিকানা স্বত্ব বিবরণী, সংরক্ষিত আয় বিবরণী ইত্যাদি কোন সময়কালের জন্য তৈরি করা হয়েছে তা শিরোনামের নিচে দেখানো হয় এবং সেই সাথে উদ্বর্তপত্র যে তারিখে প্রস্তুত করা হয় তারও উল্লেখ করা হয়।
* **সহজবোধ্য :** আর্থিক বিবরণীগুলো সহজবোধ্য হওয়া প্রয়োজন। আর্থিক বিবরণীগুলো এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে আর্থিক প্রতিবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সেগুলো সহজে বুঝতে পারে।
* **সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য :** আর্থিক বিবরণীগুলো সংক্ষিপ্ত হতে হবে, কিন্তু সেই সাথে তা সহজবোধ্য ও অর্থবহও হতে হবে। যে সকল বিষয় গুণবাচক বা বর্ণনামূলক সে সকল বিষয় আর্থিক বিবরণীর অভ্যন্তরে টাকার মানে প্রকাশ করা সম্ভব না হলে সেগুলোকে বোধগম্য ও পুর্ণাঙ্গ রূপদানের জন্য আর্থিক বিবরণীর সাথে টীকা (Note) সংযুক্ত করে প্রকাশ করতে হবে।
* **সুস্পষ্ট :** আর্থিক বিবরণীতে যেসকল পরিভাষা (Term) ব্যবহার করা হয় সেগুলো সকলের নিকট বোধগম্য হয় এমনভাবে প্রকাশ করা প্রয়োজন। কোনো অবস্থাতে কোনো পরিভাষার একাধিক অর্থ প্রকাশ না পায় সেদিকে খেয়াল রেখে আর্থিক বিবরণী তৈরি করা উচিত।

* **প্রামাণ্য দলিল :** আর্থিক বিবরণীতে লিপিবদ্ধকৃত লেনদেনগুলোর বেশিরভাগই বাস্তবে সংঘটিত ঘটনা যার প্রত্যেকটির প্রামাণ্য দলিল সংরক্ষিত থাকে।
* **সর্বজন স্বীকৃত নীতিমালার অনুসরণ :** আর্থিক বিবরণী তৈরির ক্ষেত্রে হিসাববিজ্ঞানের সর্বজন স্বীকৃত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়।

আর্থিক বিবরণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (Necessity and Importance of Financial Statement)

আর্থিক বিবরণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

* **মোট লাভ/ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় :** বিক্রয় থেকে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বাদ দিয়ে মোট লাভ নির্ণয় করা হয়। মোট লাভের পরিমাণ নির্ণয় করতে হলে বিশদ আয় বিবরণী তৈরি করার প্রয়োজন হয়। সুতরাং মোট লাভের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য আর্থিক বিবরণী তৈরি করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।
* **নিট লাভ/ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় :** মোট লাভ থেকে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ছাড়া কারবারের অন্যান্য খরচ বাদ দিলে নিট লাভ বা ক্ষতি পাওয়া যায়। নিট লাভ নির্ণয়ের জন্য বিশদ আয় বিবরণী তৈরি করার প্রয়োজন হয়। সুতরাং নিট লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য আর্থিক বিবরণী তৈরি করার প্রয়োজন হয়।
* **আর্থিক অবস্থা নির্ণয় :** একটি কারবারের আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করার প্রয়োজন হয়। আর্থিক অবস্থার বিবরণী আর্থিক বিবরণীরই একটি অংশ। সুতরাং আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য আর্থিক বিবরণী তৈরি করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।
* **তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ :** আর্থিক বিবরণী তৈরি করার ফলে এক বছরের লাভ-ক্ষতি, সম্পদ, দায় ও মূলধনের সাথে অন্য বছরের অনুরূপ বিষয়ের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। সুতরাং তুলনামূলক বিচার বিশ্লষণের জন্য আর্থিক বিবরণী তৈরি করা প্রয়োজন।
* **ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা প্রদান :** আর্থিক বিষয়ে ব্যবস্থাপকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কারবারের আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা বিচার বিবেচনা করা খুবই জরুরি। এক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণী তৈরি করার মাধ্যমে আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ধারণ করা যায়। সুতরাং ব্যবস্থাপনার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা প্রদানের জন্য আর্থিক বিবরণী তৈরি করা প্রয়োজন।
* **আর্থিক অবস্থার বিচার বিশ্লেষণ :** কারবারের সচ্ছলতা, তারল্যতা, লাভযোগ্যতা প্রভৃতি বিষয় বিচার বিশ্লেষণের জন্য বিশদ আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করা প্রয়োজন। এগুলোর উপর ভিত্তি করেই কারবারের সচ্ছলতা, তারল্যতা, লাভযোগ্যতা যাচাই করা হয়। সুতরাং আর্থিক অবস্থার বিচার বিশ্লেষণের জন্য আর্থিক বিবরণী তৈরি করা প্রয়োজন।

আর্থিক বিবরণীর ধাপ (Steps of Financial Statement)

আন্তর্জাতিক হিসাব মান-০১ (IAS-০১) অনুযায়ী আর্থিক বিবরণী ৫টি অংশে প্রস্তুত করা হয়। আর্থিক বিবরণীর ৫টি ধাপ হলো-

১. বিশদ আয় বিবরণী (Statement of Comprehensive Income)
২. মালিকানা স্বত্বে পরিবর্তন বিবরণী (Statement of Changes in Equity)
৩. আর্থিক অবস্থার বিবরণী (Statement of Financial Position)
৪. নগদ প্রবাহ বিবরণী (Statement of Cash Flows)
৫. আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় নোট ও গুরুত্বপূর্ণ হিসাবের নীতিমালা (Notes, Comprising a Summary of significant accountingpolicies and other explanatory information).

একমালিকানা কারবারের আর্থিক বিবরণী (Financial Statement of Sole Propritoreship Business)

একমালিকানা কারবারের অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম তিনটি ধাপ অনুসরণ করা হয়। নিম্নে এ তিনটি ধাপ বিষয়ে আলোচনা করা হলো-

বিশদ আয় বিবরণী : একটি ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে যে বিবরণী তৈরি করা হয় তাকে বিশদ আয় বিবরণী বলে। বিশদ আয় বিবরণীতে মুনাফাজাতীয় আয় ও ব্যয় লিপিবদ্ধ করা হয়। সেবা প্রদানকারী ব্যবসায় যারা পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে না বরং সেবা প্রদান করে যেমন-বিজ্ঞাপনী সংস্থা, এ রকম ব্যবসায়ের আয় থেকে সেবা প্রদানের যাবতীয় ব্যয় বাদ দিলে নিট মুনাফা পাওয়া যায়। অপরদিকে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্যবসায়ে পণ্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বাদ দিলে মোট

মুনাফা পাওয়া যায়। আর মোট মুনাফার সাথে অন্যান্য পরোক্ষ আয় যোগ করে, সমষ্টি হতে পরোক্ষ ব্যয় বাদ দিলে নিট মুনাফা পাওয়া যায়।

বিশদ আয় বিবরণীর উদ্দেশ্য/গুরুত্ব (Purposes/Importance of Comprehensive Income Statement)

* **মোট লাভ/ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় :** বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো কারবারের মোট লাভ/মোট ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা।
* **তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ :** বিশদ আয় বিবরণীর মাধ্যমে বর্তমান বছরের সাথে পূর্ববর্তী বছরের ক্রয়, বিক্রয়, প্রারম্ভিক ও সমাপনী মজুদ এবং লাভের পরিমাণের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়।
* **কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ :** বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করার মাধ্যমে কারবারের মোট ক্রয়, নিট ক্রয় এবং মোট বিক্রয়, নিট বিক্রয়ের পরিমাণ জানা যায়, ফলে ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণে কোনো পরিবর্তন হলে তার কারণ উদঘাটন করে ভবিষ্যতের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।
* **আর্থিক বিশ্লেষণ :** বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করার মাধ্যমে বিক্রয়ের সাথে মোট লাভের অনুপাত এবং বিক্রয়ের সাথে ক্রয়ের অনুপাত এবং মজুদ আবর্তন অনুপাত নির্ণয় করে আর্থিক বিচার বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়।
* **দক্ষতা নিরূপণ :** মোট লাভ নির্ণয় করার মাধ্যমে ব্যবস্থাপকদের কারবার পরিচালনার প্রাথমিক দক্ষতা এবং নিট লাভ নির্ণয় করার মাধ্যমে ব্যবস্থাপকদের সার্বিক দক্ষতা নিরূপণ করা যায়।
* **মূলধন অক্ষুন্ন রেখে উত্তোলনের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ :** বিশদ আয় বিবরণীর মাধ্যমে ব্যবসায়ের নিট লাভ বা ক্ষতি জানা যায়। এই আয় বিবরণীর উদ্দেশ্য হলো মালিককে জানিয়ে দেওয়া যে তিনি নিট লাভের অতিরিক্ত দাবি করতে পারেন না। নিট লাভের অতিরিক্ত দাবি করার অর্থ হচ্ছে ব্যবসায়ের মূলধন ভেঙ্গে ফেলা যা ভবিষ্যতের কার্যক্রম ব্যাহত করবে।
* **মুনাফা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা :** বিশদ আয় বিবরণীর বিভিন্ন আয় এবং ব্যয়গুলোর বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতে কীভাবে আয় বাড়িয়ে এবং ব্যয় কমিয়ে নিট মুনাফা বাড়ানো যায় তার ব্যবস্থা করা।
* **আয়কর নিরূপণ :** নিট লাভের উপর ভিত্তি করেই আয়করের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। কাজেই বিশদ আয় বিবরণী আয়কর নিরূপণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

আয় বিবরণীর শ্রেণিবিভাগ (Classification of Income Statement)

আয় বিবরণী দু'ভাবে তৈরি করা যায়। যথা-

১. এক ধাপ আয় বিবরণী (Single Step income Statement) : এক ধাপ আয় বিবরণীতে সকল প্রকার আয় এক ধাপে এবং সকল প্রকার খরচ পৃথক আর এক ধাপে দেখানো হয়। আয়গুলোর সমষ্টি হতে খরচগুলোর সমষ্টি বাদ দিয়ে নিট মুনাফা বা নিট ক্ষতি নির্ণয় করা হয়। এক ধাপ আয় বিবরণী তৈরির প্রধান সুবিধা হলো—এক নজরে সকল প্রকার আয় এবং সকল প্রকার ব্যয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

২. বহু ধাপ আয় বিবরণী (Multiple Step Income Statement) : বহু ধাপ আয় বিবরণীতে আয় ও খরচগুলোর জন্য একাধিক ধাপ খোলা হয়। যেমন-নিট বিক্রয়, বিক্রীত পণ্যের ব্যয়, মোট মুনাফা, পরোক্ষ পরিচালন আয়, পরিচালন ব্যয়, অপরিচালন আয়, অপরিচালন ব্যয় এবং নিট মুনাফা নির্ণয়। এক ধাপ আয় বিবরণীর অসুবিধা দূর করার জন্যই বহু ধাপ আয় বিবরণী তৈরি করা হয়।

সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিশদ আয় বিবরণী (Comprehensive Income Statement of Service Providing Organization)

সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সাধারণত এক ধাপ আয় বিবরণী (Single Step Income Statement) তৈরি করা হয়। এক ধাপ আয়-বিবরণীতে আয় এবং ব্যয়গুলোকে ধাপে ধাপে বিভিন্নভাগে ভাগ না করে একসাথে সকল আয় এবং সকল ব্যয় উপস্থাপন করা হয়। নিম্নে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য এক ধাপ আয় বিবরণীর নমুনা উপস্থাপন করা হলো-

চৌধুরী কনসাল্টিং সার্ভিস
বিশদ আয়-বিবরণী
..... তারিখে সমাপ্ত বছরের/মাসের জন্য

	টাকা	টাকা
আয়সমূহঃ		
সেবা আয়	×××	
সুদ আয়	×××	
লভ্যাংশ আয়	×××	
অন্যান্য আয়	×××	
	_____	
মোট আয়		×××
বাদ : ব্যয়সমূহ :		
বেতন খরচ	×××	
বিজ্ঞাপন খরচ	×××	
ভাড়া খরচ	×××	
সাপ্লাইজ খরচ	×××	
উপযোগ খরচ	×××	
বিমা খরচ	×××	
অবচয় খরচ– অফিস সরঞ্জাম	×××	
সুদ খরচ	×××	
	_____	
মোট ব্যয়		×××
		_____
নিট আয় (মোট আয়– মোট ব্যয়)		×××
		_____
		_____

ক্রয়-বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুতকরণ (Preparing Comprehensive Income Statement of Trading Concern)

বিশদ আয় বিবরণী তৈরি করার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

* **নিট বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় :** ক্রয়-বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের বিশদ আয় বিবরণী তৈরির শুরুতেই বিক্রয় থেকে বিক্রয় ফেরত এবং বিক্রয় বাট্টা বাদ দিয়ে এবং বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সমন্বয় যোগ-বিয়োগ করার মাধ্যমে নিট বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।
* **বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ধারণ :** নিট বিক্রয় থেকে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বাদ দিয়ে মোট লাভ নির্ধারণের জন্য বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করা হয়। প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যের সাথে ক্রয় এবং প্রত্যক্ষ খরচ যোগ করে যোগফল থেকে সমাপনী মজুদ পণ্য বাদ দিয়ে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করা হয়।
* **মোট মুনাফা নির্ণয় :** নিট বিক্রয় থেকে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বাদ দিয়ে মোট মুনাফা নির্ণয় করা হয়।

* **পরিচালন মুনাফা নির্ণয় :** মোট মুনাফার সাথে পরোক্ষ পরিচালন আয় যোগ করে, যোগফল থেকে ব্যবসায় পরিচালন ব্যয় বাদ দিয়ে পরিচালন মুনাফা নির্ণয় করা হয়।

* **নিট মুনাফা নির্ণয় :** পরিচালন মুনাফার সাথে অপরিচালন আয় যোগ করে যোগফল থেকে অপরিচালন ব্যয় বাদ দিয়ে নিট মুনাফা নির্ণয় করা হয়। নিট মুনাফা নির্ণয়ের মাধ্যমে বিশদ আয় বিবরণী তৈরি করার কার্যক্রমের সমাপ্তি হয়।

বিশদ আয় বিবরণীর নমুনা ছক (Format of Comprehensive Income Statement)

পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কারী ব্যবসায়ের নাম

বিশদ আয় বিবরণী

..... সালের..... তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

	টাকা	টাকা	টাকা
বিক্রয়		* * * *	
বাদ : ফেরত		* * *	
		* * * *	
বাদ : বিক্রয় বাট্টা		* * *	
নিট বিক্রয়			* * * * *
বাদ : বিক্রীত পণ্যের ব্যয়			
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য		* * * *	
ক্রয়	* * * *		
বাদ : ফেরত	* * *		
	* * * *		
বাদ : ক্রয় বাট্টা	* * *		
নিট ক্রয়		* * * *	
আন্তঃ পরিবহন		* * *	
মজুরি		* * *	
আমদানি শুল্ক		* * *	
		* * * *	
বাদ : সমাপনী মজুদ পণ্য		* * *	* * * *
মোট মুনাফা			* * * *
যোগ : পরোক্ষ পরিচালন আয়		* * *	
বাট্টা প্রাপ্তি		* * *	
কমিশন প্রাপ্তি		* * *	
চালানি ব্যবসায়ের মুনাফা			* * * *
বাদ : পরিচালন ব্যয়			
বিক্রয় পরিবহন		* * * *	
বেতন		* * * *	
অফিসের ভাড়া		* * * *	
বিদ্যুৎ খরচ		* * * *	

	টাকা	টাকা	টাকা
অফিস খরচ		* * * *	
বাট্টা প্রদান		* * * *	
স্থায়ী সম্পদের মেরামত		* * * *	
ডাক ও তার		* * * *	
বিজ্ঞাপন		* * * *	
মনিহারি		* * * *	
প্যাকিং খরচ		* * * *	
ভ্রমণ খরচ		* * * *	
বিমা খরচ		* * * *	
কমিশন প্রদান (বিক্রয়জনিত)		* * * *	
স্থায়ী সম্পদের অবচয়		* * * *	
ইজারা সম্পদের অবলোপন		* * * *	
সুনামের অবলোপন		* * * *	
অনাদায়ী পাওনা	* * * *		
যোগ : নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	* * * *		
	* * * *		
বাদ : পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি (প্রা. উদ্বৃত্ত)	* * * *	* * * *	
			* * * *
পরিচালন মুনাফা			* * * *
যোগ : অপরিচালন আয়	* * * *		
স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় হতে মুনাফা	* * * *		
বিনিয়োগের সুদ	* * * *		
উত্তোলনের সুদ	* * * *		
প্রদত্ত ঋণের সুদ	* * * *		
ব্যাংক জমার সুদ	* * * *		
শিক্ষানবিশ সেলামি	* * * *		
উপভাড়া	* * * *		
প্রাপ্ত লভ্যাংশ		* * * *	
বাদ : অপরিচালন ব্যয়			
স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়জনিত ক্ষতি	* * * *		
মূলধনের সুদ	* * * *		
ঋণ বা ব্যাংক ঋণের সুদ	* * * *		
ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ	* * * *		
ব্যাংক চার্জ	* * * *		
শিক্ষানবিশ ভাতা	* * * *		
চুরি বা দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি	* * * *	* * * *	
অপরিচালন নিট আয়/ব্যয়			* * * * *
নিট মুনাফা			* * * * *

আর্থিক অবস্থার বিবরণীর নমুনা ছক

পণ্য ক্রয় বিক্রয়কারী ব্যবসায়ের নাম

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

..... সালের..... তারিখের

সম্পদ সমূহ	টাকা	টাকা	টাকা
চলতি সম্পদ :			
নগদ ও ব্যাংক জমা		* * * *	
দেনাদার	* * * *		
বাদ : অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি	* * *		
প্রাপ্য বিল		* * * *	
অব্যবহৃত মনিহারি		* * * *	
প্রাপ্য আয়		* * * *	
অগ্রীম প্রদত্ত খরচ		* * * *	
সমাপনী মজুদ পণ্য		* * * *	* * * *
মোট চলতি সম্পদ			
দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ :			* * * *
বিনিয়োগ		* * * *	
স্থায়ী সম্পদ :			
আসবাবপত্র বাদ পুঞ্জিভূত অবচয়		*** * * ***	
অফিস সরঞ্জাম বাদ পুঞ্জিভূত অবচয়		* * * *	
যন্ত্রপাতি বাদ পুঞ্জিভূত অবচয়		* * * *	
ভূমি ও দালান বাদ পুঞ্জিভূত অবচয়		* * * *	
			* * * *
মোট স্থায়ী সম্পদ			* * * *
মোট সম্পদ			* * * *
দায়সমূহ ও মালিকানা স্বত্ব			
স্বল্পমেয়াদী দায় :			
পাওনাদার/ব্যবসায়িক ঋণ	* * * *		
প্রদেয় বিল	* * * *		
বকেয়া খরচ	* * * *		
অগ্রিম আয়/অনুপার্জিত আয়	* * * *		
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	* * * *		
মোট চলতি দায়			
দীর্ঘমেয়াদী দায় :			
ব্যাংক ঋণ/বন্ধকী ঋণ		* * * *	
মোট দায়			* * * *
মূলধন (সমাপনী উদ্বৃত্ত)			* * * *
মোট দায় ও মালিকানা স্বত্ব			* * * *

৬.৫ : আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের বিবেচ্য বিষয়

যে সময়ের জন্য আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয় সে সময়ের সকল ব্যয় পরিশোধিত এবং অপরিশোধিত উভয়ই আর্থিক বিবরণীতে দেখাতে হবে। তেমনিভাবে আয় যা পাওয়া গেছে এবং পাওনা রয়েছে উভয়ই হিসাবভুক্ত করতে হবে। তবে আগের বছর এবং পরের বছরের কোনো আয়-ব্যয় চলতি বছরের আয় বলে গণ্য করা যাবে না।

আমরা জানি রেওয়ামিলের ব্যালেন্সসমূহ নিয়ে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। তবে বিভিন্ন কারণে কিছু হিসাবখাত সংশ্লিষ্ট বছরের জন্য পূর্ণাঙ্গ (up-to-date) নাও হতে পারে। রেওয়ামিল প্রস্তুত করার পর যখন এই বিষয়গুলো ধরা পড়বে তখন ঐ হিসাবখাতকে পূর্ণাঙ্গ (সংশ্লিষ্ট বছর সংক্রান্ত) করে তোলার জন্য সমন্বয় জাবেদা দেওয়া হয়।

বকেয়া ব্যয়

রেওয়ামিল প্রস্তুত করার পর দেখা গেল যে ১,০০০ টাকা মজুরি বকেয়া আছে। তখন বকেয়া ধারণা অনুযায়ী এই ১,০০০ টাকা বিশদ আয় বিবরণীতে ব্যয় হিসাবে দেখাতে হবে কারণ এটি বর্তমান বছরের খরচ এবং সমপরিমাণ টাকা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে চলতি দায় হিসাবে দেখাতে হবে। কারণ এটি দ্রুত পরিশোধ করতে হবে।

অগ্রিম প্রদত্ত ব্যয়

বছরের শেষে জানা গেল ৫০০ টাকা বাড়ি ভাড়া অগ্রিম দেওয়া হয়েছে। হিসাবকাল ধারণা অনুযায়ী এই ৫০০ টাকা বিশদ আয় বিবরণীতে বাড়ি ভাড়া হিসাবখাত থেকে বাদ হবে। কারণ এটি বর্তমান হিসাব সাল সংক্রান্ত নয় এবং সমপরিমাণ টাকা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে চলতি সম্পদ হিসাবে দেখাতে হবে। কারণ এ টাকা বেশি দেওয়া হয়েছে যা অন্যান্য সম্পত্তির মতো ভবিষ্যতে সুবিধা প্রদান করবে।

প্রাপ্য আয় বা বকেয়া আয়

বছরের শেষে জানা গেল যে বিনিয়োগের উপর সুদ ৮০০ টাকা বর্তমান সালে অর্জিত হয়েছে কিন্তু এখনও পাওয়া যায়নি। তখন হিসাবকাল ধারণা অনুযায়ী এই ৮০০ টাকা বিশদ আয় বিবরণীতে আয় এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে চলতি সম্পদে প্রাপ্য সুদ নামে দেখাতে হবে।

অগ্রিম প্রাপ্ত আয়

ধরা যাক, চলতি বছরের রেওয়ামিলে বাড়ি ভাড়া বাবদ আয় ৫,০০০ টাকা দেওয়া আছে। কিন্তু এর মধ্যে ২,০০০ টাকা পরবর্তী বছর বাবদ অগ্রিম আদায় হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশদ আয় বিবরণীতে ৫,০০০ টাকা থেকে ২,০০০ টাকা বাদ দিয়ে বর্তমান বছরে ৩,০০০ টাকা বাড়ি ভাড়া আয় দেখাতে হবে এবং ২,০০০ টাকা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দায় হিসাবে দেখাতে হবে। কারণ এটি পাওয়া গেছে যার জন্য সেবা প্রদান করতে হবে অথবা পরবর্তী বছরের আয়ের সাথে সমন্বয় হবে।

মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন

বছরের শেষে জানা গেল মালিক তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ১,০০০ টাকার পণ্য ব্যবসায় থেকে ব্যবহার করেছেন। এটি ব্যবসায়ের নয় বরং মালিকের ব্যক্তিগত খরচ। তাই আয় বিবরণীতে পণ্য ক্রয় হিসাব থেকে ২,০০০ টাকা উত্তোলন নামে বাদ যাবে এবং মালিকানা স্বত্বের বিবরণীতে সমপরিমাণ টাকা দিয়ে মালিকের মূলধন কমে যাবে।

অবচয়

ব্যবসায়ে ব্যবহারের ফলে স্থায়ী সম্পদ যেমন- দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয় বা ক্ষতি অবচয় নামে বিশদ আয় বিবরণীতে পরিচালন ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়। ধরা যাক রেওয়ামিলে যন্ত্রপাতি ১,০০,০০০ টাকা। বছরে ১০% হারে যন্ত্রপাতির উপর অবচয় হিসাবভুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে (১,০০,০০০ × ১০%) = ১০,০০০ টাকা অবচয় নামে বিশদ আয় বিবরণীতে ব্যয় হিসাবে দেখাতে হবে। সমপরিমাণ টাকা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে পুঞ্জীভূত অবচয় নামে যন্ত্রপাতি থেকে বাদ দিয়ে দেখাতে হবে।

বিশদ আয় বিবরণী

	টাকা
পরিচালন ব্যয় :	
যন্ত্রপাতির অবচয়	১০,০০০

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

	টাকা	টাকা
স্থায়ী সম্পদ :		
যন্ত্রপাতি	১,০০,০০০	
বাদ : পুঞ্জীভূত অবচয়	১০,০০০	
		৯০,০০০

অনাদায়ী পাওনা

দেনাদারদের মধ্যে কেউ দেউলিয়া হতে পারেন বা অন্য কারণে পাওনা অনাদায়ী থাকতে পারে, ব্যবসায়ের এই ক্ষতিকে অনাদায়ী পাওনা বলে। ধরা যাক, রেওয়ামিলে ৭৫,০০০ টাকা দেনাদার হিসাব। বছরের শেষে জানা গেল যে একজন দেনাদার থেকে ২,৫০০ টাকা আর কখনও পাওয়া যাবে না। তাই এটি ক্ষতি হিসাবে বিশদ আয় বিবরণীতে দেখাতে হবে এবং দু'তরফা দাখিলা অনুযায়ী সমপরিমাণ টাকা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে অনাদায়ী পাওনা নামে দেনাদার থেকে বাদ দিয়ে দেখাতে হবে।

অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি

দেনাদার থেকে নিশ্চিত অনাদায়ী পাওনা বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট দেনাদারদের কিছু অংশ পরবর্তীতে আদায় নাও হতে পারে। এটি সম্ভাব্য ক্ষতি যা বিশদ আয় বিবরণীতে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বা সম্ভাব্য অনাদায়ী পাওনা নামে দেখান হয় এবং রক্ষণশীলতার নীতি অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীতে দেনাদার থেকে বাদ দিয়ে দেখানো হয়।
ধরা যাক, রেওয়ামিলে দেনাদার হিসাব ৭৫,০০০ টাকা এবং অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত ২,৫০০ টাকা। একজন দেনাদার থেকে ১,৫০০ টাকা আদায়যোগ্য নয়। উপরন্তু অবশিষ্ট দেনাদারের ৫% আদায় নাও হতে পারে।
অনাদায়ী পাওনা ও অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি- বিশদ আয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দেখানো হলো-

বিশদ আয় বিবরণীতে :

		টাকা
সমাপনী কুঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি হিসাব		
{(৭৫০০০ - ১৫০০) ×৫%}		৩,৬৭৫
বাদ :প্রারম্ভিক ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতির উদ্বৃত্ত	২,৫০০	
(-) কুঋণ অবলোপন	১,৫০০	
		১,০০০
কুঋণ খরচ		২,৬৭৫

আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে :

দেনাদার	৭৫,০০০
বাদ :কুঋণ অবলোপন	(১,৫০০)
	৭৩,৫০০
বাদ : সমাপনী কৃঋণ ও সন্দেহজনক দেনা সঞ্চিতি	৩,৬৭৫
	৬৯,৮২৫

৬.৬ : আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণে হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালার প্রয়োগ

বিশদ আয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুতকরণে হিসাববিজ্ঞানের কিছু নিয়মনীতি মানা হয়। সঠিকভাবে লাভ-ক্ষতি এবং সম্পদ ও দায়-দেনার পরিমাণ নিরূপণ করতে হলে এই নিয়মনীতি অনুসরণ অবশ্য করণীয়।

১. **ব্যবসায়িক স্বত্বা নীতি (Entity) :** ব্যবসায়ের মালিককে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে পৃথক বিবেচনা করা হয়। তাই মালিকের নামে হিসাব না রেখে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নামে যাবতীয় হিসাব রাখা হয়। এজন্য মালিক কর্তৃক প্রদত্ত মূলধন ব্যবসায়ের একটি দায়। একই কারণে মালিক কর্তৃক উত্তোলন তার নিজস্ব খরচ যা তার মূলধনের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

২. **চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা (Going Concern) :** এ ধারণা অনুযায়ী কিছু নির্দিষ্ট মেয়াদি প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ অনির্দিষ্টকাল ধরে চলমান থাকবে বলে ধরে নেওয়া হয়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটি বছরের পর বছর চলবে এবং ভবিষ্যতে এ ব্যবসা বন্ধ করার কোনো পরিকল্পনা নেই। এই নীতির কারণে আয় ও ব্যয়কে মূলধন ও মুনাফাজাতীয় দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। মূলধন জাতীয় আইটেমসমূহ দ্বারা আমরা আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করি। তাই স্থায়ী সম্পত্তির ক্ষেত্রে তার জীবনকাল পর্যন্ত প্রতি বছর অবচয় ধরতে হয়। এই নীতি না থাকলে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করা সম্ভব হতো না এবং অবচয় ধরারও প্রয়োজন হতো না।

৩. **হিসাবকাল ধারণা (Periodicity) :** চলমান নীতি অনুযায়ী ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট কোনো আয়ুষ্কাল নাই। কিন্তু আর্থিক অবস্থা জানতে অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করা যায় না। তাই প্রতি বছরই আর্থিক অবস্থা জানার জন্য বিশদ আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। প্রতিষ্ঠানের অনন্ত আয়ুষ্কালকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমান অংশে ভাগ করে নেওয়া হয়। এই এক একটি ভাগকে হিসাবকাল বলে। হিসাবকাল সাধারণত এক বছর মেয়াদি হয়।

৪. **বকেয়া ধারণা (Accrual) :** আয় বিবরণী শুধু নগদ প্রাপ্তি ও নগদ প্রদানের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত হয় না। বকেয়া ধারণার উপর ভিত্তি করে বিশদ আয় বিবরণী তৈরি করা হয়। প্রদত্ত খরচের সাথে বকেয়া খরচ এবং প্রাপ্ত আয়ের সাথে প্রাপ্য আয় যোগ করে বিশদ আয় বিবরণীতে দেখানো হয়। পক্ষান্তরে অগ্রিম আয় ও ব্যয়কে সংশ্লিষ্ট হিসাব খাত থেকে বাদ দিয়ে দেখানো হয়। অর্থাৎ হিসাবকালের জন্য আয় বা ব্যয়ের পরিমাণ কত সেটিই মুখ্য ঐ আয় বাবদ কত নগদে পাওয়া গেল বা ঐ ব্যয় বাবদ কত নগদে দেওয়া হলো সেটি মুখ্য নয়।

৫. **রক্ষণশীলতার নীতি (Conservatism) :** এই নীতি অনুযায়ী মুনাফা নির্ণয়ে রক্ষণশীল হতে হবে অর্থাৎ যতদূর সম্ভবমুনাফা কম দেখাতে হবে। তাই ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সকল ব্যয় ও ক্ষতিকে আয় বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু আয়ের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা থাকলে চলবে না বরং নিশ্চিত হতে হবে, নিশ্চিত আয়কেই আয় বিবরণীতে দেখানো হবে। সম্ভাব্য আয়েরউপর ভিত্তি করে যদি মালিক নিট লাভের অংশ নিয়ে যান এবং ঐ সম্ভাব্য আয় যদি আসলে না ঘটে তবে মালিক প্রকৃতপক্ষে মূলধনই ভেঙ্গে ফেললেন, যা ব্যবসায়ের জন্য ক্ষতিকর। রক্ষণশীল নীতির জন্য সম্ভাব্য আনাদায়ী পাওনা ক্ষতি হিসাবে দেখানো হয়। আর সমাপনী মজুদের বাজার মূল্য ক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি হলেও সেটি দেখানো হয় না বরং যেটি কম সেই মূল্যই দেখানো হয়।

৬. **ক্রয়মূল্য নীতি (Cost Price) :** এই নীতি অনুযায়ী স্থায়ী সম্পদসমূহ যে মূল্যে ক্রয় করা হয়েছিল সেই মূল্যেই প্রতি বছরআর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দেখানো হয়। বাজারমূল্যে দেখানো হয় না কারণ স্থায়ী সম্পদ বিক্রির জন্য নয় বরং দীর্ঘকালব্যবসায়ে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা হয়। ক্রয়মূল্য বলতে সম্পত্তি অর্জনে প্রদত্ত অর্থ ও ব্যবহার উপযোগী করার জন্য আনুষঙ্গিক খরচ উভয়কে বুঝায়।

৭. **সামঞ্জস্যতা নীতি (Consistency) :**এই নীতি অনুসারে হিসাববিজ্ঞানের হিসাবসমূহ প্রত্যেক বছরে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হয়। এই বছর এক পদ্ধতি এবং আরেক বছর অন্য পদ্ধতি এই নীতি অনুসরণ করলে বিভিন্ন বছরে হিসাবসমূহের সঠিক তুলনা করা যায় না। ফলে ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না।

৮. **বস্তুনিষ্ঠতা ধারণা (Materiality) :** হিসাববিজ্ঞানে বস্তুনিষ্ঠতা প্রথা বলতে হিসাবরক্ষকের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা লেনদেনসমূহ হিসাবভুক্তকরণকে বুঝায়। হিসাবরক্ষককে প্রাসঙ্গিকতা ও অপ্রাসঙ্গিকতা বিচার করে হিসাবের বইতে লেনদেন লিপিবদ্ধ করতে হয়। উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝানো যেতে পারে- প্রতিষ্ঠান কোনো স্থায়ী সম্পদ যা দীর্ঘদিন ব্যবহার হবে স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করল। হিসাবরক্ষক উক্ত ক্রয়কে সম্পদ হিসাবে লিপিবদ্ধ না করে খরচস্বরূপ লিপিবদ্ধ করবেন। যেমন- ঘড়ি, স্ট্যাপলার, পাঞ্চিং মেশিন, ক্যালকুলেটর প্রভৃতি ব্যবসায়ে দীর্ঘদিন ব্যবহার হয় কিন্তু এদের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় সম্পদের অন্তর্ভুক্ত না করে সংশ্লিষ্ট হিসাব বছরের খরচ হিসাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৯. **দ্বৈতস্বত্বা ধারণা (Dual Aspect Concept) :** প্রতিটি লেনদেনে দুটি পক্ষ থাকে এবং হিসাবের বইতে উভয় পক্ষকেই লিপিবদ্ধ করা হয়- এ হলো দ্বৈতসত্তা ধারণা। লেনদেনের দুটি স্বত্বাকেই সমান গুরুত্বে হিসাবের বইতে লেখা হয় বিধায় হিসাব সমীকরণে সর্বদাই সাম্য অবস্থা বিরাজ করে। যেমন- মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন ক্রয় থেকে বিয়োগ করে উত্তোলনের সাথে যোগ করা হলো। এখানে উত্তোলন হিসাব ডেবিট হয়ে ক্রয় হিসাব ক্রেডিট হলো। অনুরূপভাবে স্ট্যাপলার ক্রয়কে অফিস খরচে ডেবিট করে যন্ত্রপাতি হিসাবে ক্রেডিট করা হলো, অগ্রিম প্রদত্ত বাড়ি ভাড়া হিসাব ডেবিট করে বাড়িভাড়া হিসাব ক্রেডিট করা হলো। ফলে হিসাব সমীকরণেও ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে না।

১০. **পূর্ণ প্রকাশকরণ নীতি (Full Disclosure) :** যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই সম্পূর্ণ গুরুত্বসহকারে হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শন করা উচিত। এছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতিমালাগুলোও সম্পূর্ণ প্রদান করা উচিত। যেমন- বড় ধরনের কোনো চুক্তির স্বাক্ষর, সম্পত্তির মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি। মনে করি, প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্টমূল্যে ভূমি ক্রয় করেছেন। এক্ষেত্রে ভূমির ক্রয়মূল্যে প্রদর্শন করা হয়েছে। তাই মূল্যায়ন প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই পূর্ণরূপে প্রকাশ করা উচিত।

৬.৭ : পণ্যের ক্রয়মূল্য, উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য

পণ্যের ক্রয়মূল্য

ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে যে সমস্ত পণ্য সামগ্রী উৎপাদন, ক্রয় এবং বিক্রয় করা হয় সে সমস্ত পণ্যদ্রব্যের যথাযথ মূল্য নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরি। সঠিকভাবে মূল্য নির্ধারণ করতে না পারলে ব্যবসায়ের ব্যবসায়িক ক্ষতির পাশাপাশি পারস্পরিক আরও নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হবে। ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রতিটি পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় বা পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে সঠিক ক্রয়মূল্য এবং সর্বোপরি সঠিকভাবে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে ক্রেতা এবং বিক্রেতার উভয়েরই স্বার্থ সংরক্ষণ করতে হয়।

চিত্র : উৎপাদনকৃত পণ্য বিক্রয়কেন্দ্র

ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ

প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেরই হিসাবরক্ষণের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো প্রকৃত লাভ-লোকসান নির্ণয় করা। প্রকৃত লাভ-লোকসান নির্ণয় তখনই সম্ভব হবে যদি পণ্যের সঠিক ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা যায়। সাধারণত ক্রয়কৃত পণ্যের দামের সাথে যে সমস্ত খরচসমূহ সরাসরি জড়িত সে সমস্ত খরচসমূহ যোগ করে ক্রয়মূল্য নিরূপণ করা হয়। পাশাপাশি ক্রয়মূল্যের সাথে পণ্যকে বিক্রয় উপযোগী করা পর্যন্ত যে সমস্ত খরচগুলো সংঘটিত হয় সেগুলোকে যোগ করে তার সাথে প্রত্যাশিত মুনাফার পরিমাণ যোগ করে পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

ক্রয়মূল্য নিরূপণ

সাধারণভাবে ক্রয়মূল্য বলতে বুঝায় পণ্য ক্রয়ের সময় বিক্রেতাকে যে মূল্য প্রদান করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে বিক্রেতাকে দেওয়া প্রদত্ত অর্থের সাথে ক্রেতার গুদাম পর্যন্ত পণ্য পৌঁছানো বাবদ যে সমস্ত আনুষঙ্গিক খরচ সংঘটিত হয়ে থাকে তার যোগফলের সমষ্টিই হচ্ছে ক্রয়মূল্য। ক্রেতার দোকান বা গুদামে পৌঁছানো পর্যন্ত যে সমস্ত খরচগুলো সংঘটিত হয় তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ খরচ। যেমন- জাহাজ বা রেল ভাড়া, প্যাকিং খরচ, আমদানি শুল্ক, ডক চার্জ, বিমা খরচ, কুলি খরচ ইত্যাদি।
উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো হলো-

মুন্সিগঞ্জের ব্যবসায়ী জনাব আহাদ এন্ড সন্স-এর নামে খুলনা থেকে ১০,০০০ লিটার সরিষার তৈল ১৫০ টাকা লিটার দরে ক্রয় করা হলো। ট্রাক ভাড়া ১০,০০০ টাকা, কুলি খরচ ১,০০০ টাকা, টোল খরচ ২,৫০০ টাকা। গুদামে পণ্য খালাস মজুরি ২,৫০০ টাকা পরিশোধ করা হলো। এক্ষেত্রে প্রতি লিটার তৈলের ক্রয়মূল্য দাঁড়াবে–

	টাকা	টাকা
সরিষার তৈল ক্রয় (১০,০০০ লিটার × ১৫০ টাকা)		১৫,০০,০০০
যোগ : প্রত্যক্ষ খরচ :		
ট্রাক ভাড়া	১০,০০০	
কুলি খরচ	১,০০০	
টোল খরচ	২,৫০০	
পণ্য খালাস মজুরি	২,৫০০	
		১৬,০০০
মোট ক্রয়মূল্য		১৫,১৬,০০০

প্রতি লিটার তৈলের ক্রয়মূল্য (১৫,১৬,০০০ ÷ ১০,০০০) = ১৫১.৬০ টাকা।

নিম্নের ছকে ক্রয়মূল্য, ক্রীত পণ্যের মোট ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য দেখানো হলো-

প্রতিষ্ঠানের নাম

..... সালের.....তারিখের

বিবরণ	টাকা	টাকা
পণ্য ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত অর্থ		* * *
যোগ : প্রত্যক্ষ খরচসমূহ		
● পরিবহন	* * * *	
● মজুরি	* * * *	
● শুল্ক	* * * *	
● কর	* * * *	
ক্রয়মূল্য		* * * *
		* * * *
যোগ : পরোক্ষ খরচসমূহ		
● ভাড়া	* * * *	
● বেতন	* * * *	
● বিজ্ঞাপন	* * * *	
		* * * *
ক্রীত পণ্যের মোট ব্যয়		* * * *
যোগ : প্রত্যাশিত মুনাফা		* * * *
বিক্রয়মূল্য		* * * *

বিক্রয়মূল্য নিরূপণ

ক্রয়কৃত পণ্য বা উৎপাদিত পণ্যকে বিক্রয় উপযোগী করে তোলার জন্য অর্থাৎ ভোক্তার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত ক্রয়মূল্যের সাথে অন্যান্য পরোক্ষ খরচ যেমন- দোকান ভাড়া, কর্মচারীদের বেতন, বিদ্যুৎ, বিজ্ঞাপন, পরিবহন খরচ ইত্যাদি যোগ করে মোট ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। এই মোট ব্যয়ের সাথে প্রত্যাশিত মুনাফা যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো হলো। যেমন- পূর্বের ক্রয়কৃত পণ্যের মোট ক্রয়মূল্য ছিল ১৫,১৬,০০০ টাকা, এর সাথে পণ্য বিক্রয় বাবদ কর্মচারীদের বেতন ১০,০০০, বিদ্যুৎ বিল ১,০০০, বিজ্ঞাপন খরচ ৩,০০০ ও যাতায়াত খরচ ২,০০০ টাকা ব্যয় হয়। মোট ব্যয়ের ১০% মুনাফা ধরে বিক্রয়মূল্য হবে–

বিবরণ	টাকা	টাকা
মোট ক্রয়মূল্য		১৫,১৬,০০০
যোগ : পরোক্ষ খরচ		
কর্মচারীদের বেতন	১০,০০০	
বিদ্যুৎ বিল	১,০০০	
বিজ্ঞাপন খরচ	৩,০০০	
যাতায়াত খরচ	২,০০০	
		১৬,০০০
মোট ব্যয়		১৫,৩২,০০০
যোগ : প্রত্যাশিত মুনাফা (১৫,৩২,০০০ × ১০%)		১,৫৩,২০০
		১৬,৮৫,২০০
প্রতি লিটার তৈলের বিক্রয়মূল্য (১৬,৮৫,২০০ ÷ ১০,০০০) = ১৬৮.৫২		

উৎপাদন ব্যয় হিসাব ও এর উদ্দেশ্য (Cost Accounting and Its Objective)

উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মের একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ করার লক্ষ্য সামনে রেখে উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের উন্মেষ ঘটেছিল। আধুনিককালে উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানে কেবল পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মের একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ করার কাজে সীমাবদ্ধ নয়। এর উদ্দেশ্য ব্যাপক এবং বিস্তৃত। নিম্নে উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করা হলো-

১. **ব্যয় তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Cost Information) :** ব্যয় খরচের অংশগুলো সংগ্রহ করে এদের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। শ্রেণিবিন্যাসকরণ দ্বারাই ব্যয় তথ্যগুলোকে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

২. **ব্যয় তথ্য লিপিবদ্ধকরণ (Recording of Cost Information) :** উৎপাদিত পণ্য বা প্রদানকৃত সেবার সঙ্গে জড়িত ব্যয় তথ্যগুলো বিভিন্ন ফরম, দলিল, নথিপত্র, চালান ও মেমো থেকে সংগ্রহ করে ব্যয় হিসাবচক্র অনুযায়ী বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

৩. **উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ (Cost Determination) :** উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ করা উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। প্রত্যেক প্রকার কার্যের উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতি, প্রক্রিয়ায় বা চুক্তির জন্য মোট কত ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ মোট কী পরিমাণ কাঁচামাল, শ্রম এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খরচ ব্যয়িত হয়েছে তা পৃথকভাবে নির্ণয় করা যায়।

৪. **উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ (Cost Control) :** কেবলমাত্র উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণই যথেষ্ট নয় বরং ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করাই উৎপাদন ব্যয়ের মূল উদ্দেশ্য। ব্যয় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে মান, ব্যয় হিসাব ও বাজেটকে সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। প্রকৃত ব্যয়কে মান, ব্যয় বা বাজেটের সাথে তুলনা করে প্রভেদ নির্ধারণ করা হয় এবং প্রভেদের কারণ উদঘাটনপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

৫. **দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ (Determination of ProductSelling Price) :** ব্যয়ের সঙ্গে মুনাফার সামঞ্জস্য বিধান করে সঠিক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে প্রয়োজনীয় ও প্রত্যাশিত মুনাফা সংযুক্ত করে দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

৬. **মুনাফা নির্ণয় (Profit Ascertainment) :** একটি নির্দিষ্ট সময়ে কী পরিমাণ মুনাফা অর্জিত হবে তা নির্ণয় করা উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। পণ্যের একক ভিত্তিতে, প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে, মোট ভিত্তিতে এবং সময়ের ভিত্তিতে এ মুনাফা নির্ধারণ করা হয়।

৭. **বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়ন (Budgeting and Planning) :** ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নে সহায়তা করা উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের একটি উদ্দেশ্য। নগদ বাজেট, বিক্রয় বাজেট, উৎপাদন বাজেট ও সামগ্রিক বাজেট প্রণয়ন করে প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর স্বার্থে পরিকল্পনা প্রণয়নে এটা সহায়তা করে।

৮. **ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা(Helps in Management Decision Taking) :** শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপনাকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ, বিশেষ দ্রব্যের উৎপাদন লাভজনক কি না তা নির্ধারণ করে লাভজনক প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতির অধিক ব্যবহার বা নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজন এর মধ্যে কোনটি লাভজনক হবে তা নির্ধারণে ব্যবস্থাপনাকে সহায়তা করা এর উদ্দেশ্য।

৯. **ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ (Collecting &Analysis of Cost related Information) :** বিভিন্ন প্রকার ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তৈরি করা এবং তাদের যথাযথভাবে বিশ্লেষণ, শ্রেণিবদ্ধকরণ ও হিসাবে লিপিবদ্ধকরণ উৎপাদন ব্যয় হিসাবের উদ্দেশ্য।

১০. **প্রকল্প মূল্যায়ন (Project Evaluation) :** কোনো সরকারি বা আধা-সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে প্রকল্পটি মুনাফাজনক হবে কি না তা মূল্যায়ন করা একান্ত প্রয়োজন। কাজেই উক্ত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, বাস্তব মূল্যায়ন ও সাফল্য কার্যকরণে উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায় যে, বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিতে প্রতিষ্ঠানের অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান শিল্প প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক-কর্মী, বিনিয়োগকারী ও দেশের সাধারণ মানুষের অশেষ উপকার সাধন করে থাকে।

উৎপাদন ব্যয় ও উৎপাদন ব্যয়ের উপাদান

চিত্র : একটি বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান

উৎপাদন ব্যয়ের ধারণা ও তাৎপর্য

স্বাভাবিকভাবে কোনো পণ্য উৎপাদন বা অর্জন করতে যে ব্যয় হয় তার সমষ্টিই হচ্ছে উৎপাদন ব্যয়। কোনো অর্থনৈতিক সম্পদ অর্জনের জন্য যে মূল্য ত্যাগ করা হয় তাকে ব্যয় (cost) বলে। সংক্ষেপে বলা যায়, ব্যয় হচ্ছে মূল্য হিসাবে কিছু দেওয়া বা ত্যাগ করা, সুতরাং সহজ ভাষায় বলা যায় কোনো পণ্য বা সেবা সৃষ্টি বা উৎপাদন করতে যে মূল্য ত্যাগ করতে হয় বা খরচ হয় তাকেই উৎপাদন ব্যয় বলা হয়। কোনো দ্রব্য কারখানায় উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল ক্রয় থেকে শুরু করে দ্রব্যটি ব্যবহার উপযোগী বা সমাপ্ত পণ্যে (Finished goods) পরিণত করার জন্য যাবতীয় খরচের সমষ্টিই হলো ঐ দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়। যেমন-ফার্নিচারের কারখানায় ফার্নিচার তৈরির জন্য ব্যবহৃত কাঠ, রং, বার্নিশ এবং শ্রমের জন্য প্রদত্ত মজুরি, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ব্যয় এবং অন্যান্য সকল ব্যয়ের সমষ্টিকে বলা হবে ফার্নিচারের উৎপাদন ব্যয়। তেমনি ইট তৈরির কারখানায় বালু, মাটি, শ্রমিক এবং পোড়ানোর খরচের সমষ্টিই হলো ইটের উৎপাদন ব্যয়।

কোনো কারবারি প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন করা। শিল্পকারখানার উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার নীতি নির্ধারণমূলক কাজে উৎপাদন ব্যয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত দ্রব্যের মোট খরচ এবং একক প্রতি উৎপাদন খরচ নির্ণয় করা অতি জরুরি। কারণ কোনো দ্রব্য বা সেবার মোট ব্যয় এবং একক ব্যয় সঠিকভাবে নির্ণয় করা না হলে সঠিক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা যায় না।

মোট উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের সাথে যে সমস্ত উপাদানগুলো জড়িত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খরচের হিসাবগুলো সঠিকভাবে প্রয়োগ এবং সংরক্ষণের মাধ্যমে একদিকে যেমন- উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের খরচ সম্পর্কে জানা যায়,অন্যদিকে অপচয় ও অপব্যবহার রোধ করে মোট উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করে প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে পৌঁছানো যায়।

উৎপাদন ব্যয়ের উপাদান

কোনো পণ্য বা সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করাই শেষ কথা নয়। যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যয় উপাদানগুলোর বিশ্লেষণ ও শ্রেণিবিভাগ করা প্রয়োজন। এজন্য মোট ব্যয়কে উপাদান অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা হয়। যে সকল উপকরণ ব্যয় এবং আনুষঙ্গিক উপরিখরচ নিয়ে পণ্যের বা সেবা কর্মের মোট উৎপাদন ব্যয় গঠিত হয় তাদের প্রত্যেকটিকে ব্যয়ের উপাদান বলা হয়। সামগ্রিকভাবে ব্যয়ের উপাদান তিনটি।

নিম্নে উৎপাদন ব্যয়ের উপাদানের শ্রেণিবিভাগ ছকের সাহায্যে উপস্থাপন করা হলো-

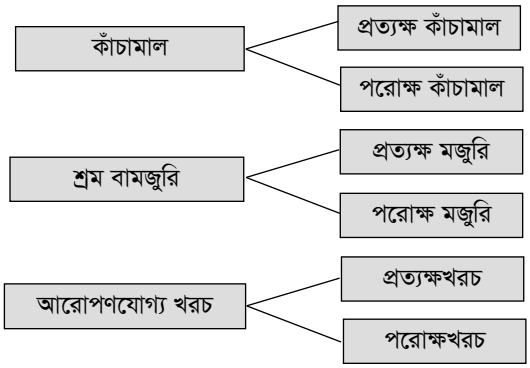

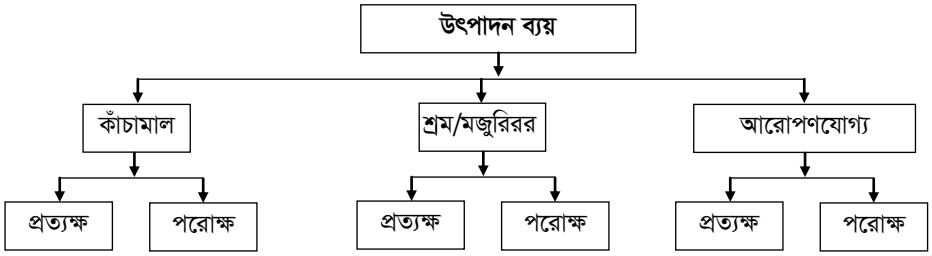

উপরিউক্ত ব্যয় উপাদানের মাধ্যমে মোট ব্যয় (Total cost) নির্ধারিত হয়।

এক নজরে উৎপাদনের মোট ব্যয়কে নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করা যায় -

মুখ্য ব্যয়	=	প্রত্যক্ষ কাঁচামাল	+	প্রত্যক্ষ শ্রম	+	প্রত্যক্ষ খরচ
উৎপাদন ব্যয়	=	মুখ্য ব্যয়	+	কারখানা উপরিব্যয়		
রূপান্তর ব্যয়	=	প্রত্যক্ষ শ্রম	+	কারখানা উপরিব্যয়		
মোট ব্যয়	=	উৎপাদন ব্যয়	+	প্রশাসনিক উপরিব্যয়	+	বিক্রয় উপরিব্যয়
বিক্রয়মূল্য	=	মোট ব্যয়	+	প্রত্যাশিত মুনাফা		

উৎপাদন ব্যয়ের উপাদানগুলোকে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

১. কাঁচামাল

(i) প্রত্যক্ষ কাঁচামাল : যে কাঁচামাল উৎপাদিত পণ্যের প্রধান উপাদান এবং এর খরচ সহজে ও সরাসরিভাবে উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যয়রূপে চিহ্নিত করা যায় তাহাই প্রত্যক্ষ কাঁচামাল। প্রত্যক্ষ কাঁচামাল মুখ্য ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন- বই উৎপাদনে কাগজ, আসবাবপত্র তৈরিতে কাঠ, চটের জন্য পাট, চিনির জন্য ইক্ষু, সুতার জন্য তুলা কিংবা কাপড়ের জন্য সুতা হলো প্রত্যক্ষ কাঁচামাল।

(ii) পরোক্ষ কাঁচামাল : প্রত্যক্ষ কাঁচামাল বাদে অন্যান্য সমস্ত ধরনের মালামালই পরোক্ষ কাঁচামাল বলে। অর্থাৎ যেসব কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য সরাসরি জড়িত নয়। যেমন- শার্ট তৈরির জন্য সুতা ও বোতাম। আসবাবপত্র তৈরির জন্য পেরেক, জুতা তৈরির আঠা ইত্যাদি। পরোক্ষ কাঁচামাল পণ্য তৈরিতে সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

২. শ্রম/মজুরি

(i) প্রত্যক্ষ মজুরি : কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে সরাসরি যে শ্রম জড়িত থাকে তাকে প্রত্যক্ষ শ্রম বলে। অর্থাৎ সেসব কারখানা শ্রমিক কাঁচামাল থেকে পণ্যকে সম্পূর্ণ উৎপাদনের দিকে নিয়ে যায় অথবা যারা আংশিক উৎপাদন স্তর থেকে আরম্ভ করে উৎপাদনটিকে পূর্ণতা দিয়ে থাকে তাদের মজুরিকে প্রত্যক্ষ মজুরি বলে। যেমন- পাটকলে শ্রমিকের মজুরি, কাপড় বয়নের মজুরি, আসবাবপত্র প্রস্তুতের মিস্ত্রি খরচ ইত্যাদি।

(ii) পরোক্ষ মজুরি : যেসব শ্রমিক সরাসরিভাবে উৎপাদন কার্যে জড়িত নয় তবে উৎপাদন কাজে সহায়তা করে। তাদের শ্রমকে পরোক্ষ শ্রম বা মজুরি বলে। যেমন- গার্মেন্টস কারখানায় হেলপারের মজুরিকে পরোক্ষ শ্রম বলা হয়। কারণ তার শ্রম সরাসরি উৎপাদন কার্যে জড়িত নয়। তাছাড়া তার শ্রমের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না।

৩. আরোপণযোগ্য খরচ

(ক) প্রত্যক্ষ খরচ :প্রত্যক্ষ কাঁচামাল বা মজুরির আওতাভুক্ত না হয়েও যে খরচগুলো পণ্যের সাথে সরাসরি চিহ্নিত করা যায় তাকেই প্রত্যক্ষ খরচ বলে। এ খরচগুলোকে আরোপণযোগ্য খরচ (Chargeable Expenses) বলা হয়। যেমন-

* দালানকোঠা নির্মাণে বিশেষ কংক্রিট মিক্সারের ভাড়া
* স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন খরচ
* জুতা তৈরির জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করা ফর্মা বা পায়ের ছাঁচ
* কোনো চুক্তির ঠিকাকার্য পাওয়ার জন্য খরচ, যেমন- দরপত্রের ক্রয়মূল্য, ভ্রমণ ব্যয় ইত্যাদি।

(খ) পরোক্ষ খরচ : যে ব্যয় উৎপাদিত প্রত্যেকটি পণ্যের জন্য আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় না, তাকেই পরোক্ষ ব্যয় বলে। যেমন-একটি টেবিল তৈরি করতে কতটুকু পেরেক খরচ হয়েছে তা চিহ্নিত করা যায় না। এ ধরনের ব্যয়গুলোকে পরোক্ষ ব্যয় হিসাবে গণ্য করা হয়। সাধারণত কোনো প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার জন্য এবং এর অভ্যন্তরের বিভিন্ন প্রকারের সহায়ক কাজ ও সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য পরোক্ষ ব্যয় সংঘটিত হয়ে থাকে। পরোক্ষ খরচ তিন প্রকার। যথা-

(ক) কারখানা উপরিব্যয় : কারখানায় ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ কাঁচামাল এবং প্রত্যক্ষ শ্রম ব্যতীত উৎপাদনের অন্যান্য যাবতীয় পরোক্ষ খরচকে কারখানা উপরিখরচ বলা হয়। যেমন- কারখানার ভাড়া, পৌরকর, বিমা, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ।

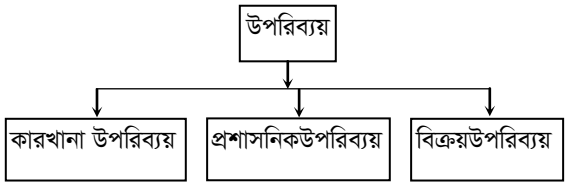

(খ) প্রশাসনিক উপরিব্যয় : অফিস ও প্রশাসন সংক্রান্ত খরচকে প্রশাসনিক খরচ বলে। অর্থাৎ সমগ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও অফিস ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত পরোক্ষ খরচসমূহকে প্রশাসনিক খরচ বা উপরিব্যয় বলা হয়। যেমন- অফিস কর্মচারীদের বেতন, অফিসের ভাড়া, এবং অফিস সংক্রান্ত অন্যান্য ধরনের ব্যয়। যেমন- কাগজপত্র, দলিলপত্র, ছাপা, ডাক ও তার, টেলিফোন ইত্যাদি।

(গ) বিক্রয় উপরিব্যয় : তৈরি মাল বিক্রয় এবং বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় খরচকে বিক্রয় ও বিলি খরচ বলে। এই ধরনের খরচ সাধারণত উৎপাদিত পণ্যের ফরমায়েশ সংগ্রহ, নতুন বাজার সৃষ্টি, পুরাতন বাজার বজায় রাখা ও খরিদ্দারকে আকৃষ্ট করার জন্য করা হয়ে থাকে। যেমন- বিজ্ঞাপন, প্রচার, নমুনা বিতরণ, বিক্রয় ম্যানেজার বা প্রতিনিধিকে প্রদত্ত বেতন বা কমিশন, বিক্রয় অফিস সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ ইত্যাদি। আবার, বিক্রীত পণ্য খরিদ্দারের নিকট পৌঁছে দেওয়া বাবদ যে খরচ হয় তাকে বিলিকরণ খরচ বলে। যেমন-দ্রব্য প্রেরণ সংক্রান্ত বিমা, গাড়ি ভাড়া বাবদ ব্যয় ইত্যাদি। আবার বিক্রয় পরবর্তীতে তাকে পণ্যের সার্ভিসিং ও মেরামতের জন্য বা পণ্য বদল করে দেওয়ার জন্য যে খরচ হয় তাও বিক্রয় খরচের অন্তর্ভুক্ত।

উৎপাদন ব্যয় বিবরণী

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে যে বিবরণী প্রস্তুত করে,তাকে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী বা ব্যয় তালিকা বলে। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণত আর্থিক বছর শেষে তাদের আর্থিক বিবরণীর অংশ হিসাবে উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদানসমূহের খরচ দেখিয়ে ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করে। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে ব্যয় বিবরণী মাসিক,ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বার্ষিক, বার্ষিক যেকোনো সময়ের জন্য তৈরি করা যেতে পারে। পণ্যের উৎপাদন ব্যয়, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ও মুনাফা নির্ণয়ের জন্য মোট তিনটি ধাপে বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। নিম্নে উৎপাদন ব্যয় বিবরণীর নমুনা ছক প্রদান করা হলো-

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম.....

উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় বিবরণী

..... সালের .....তারিখ পর্যন্ত ..... সময়ের জন্য

ব্যয়ের উপাদান	বিস্তরিত টাকা	টাকা	মোট টাকা
কাঁচামালের প্রারম্ভিক মজুদ		* **	
যোগ : কাঁচামাল ক্রয়	* **		
ক্রয় পরিবহন	* * *		
	* **		
বাদ : ক্রীত কাঁচামাল ফেরত	* * *		
ব্যবহার উপযোগী কাঁচামাল		* * *	
		* **	
		* * *	

বাদ : কাঁচামালের সমাপনী মজুদ			
ব্যবহৃত কাঁচামালের খরচ			* **
যোগ : প্রত্যক্ষ মজুরি		* **	
অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ		* * *	
মুখ্য ব্যয়			* * *
			* **
যোগ : কারখানার উপরিব্যয়			* * *
উৎপাদন ব্যয়			* **
যোগ : চলতি কার্যের (অর্ধ সমাপ্ত পণ্যের) প্রারম্ভিক মজুদ			* * *
			* **
বাদ : চলতি কার্যের (অর্ধ সমাপ্ত পণ্যের) সমাপনী মজুদ			* * *
উৎপাদিত পণ্যের ব্যয়			* * *

প্রতিষ্ঠানের নাম ----------

বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বিবরণী

সময় ----------

	টাকা	**টাকা**
তৈরি পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ		* **
যোগ : উৎপাদিত পণ্যের ব্যয়		* * *
বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয়		* **
বাদ : তৈরি পণ্যের সমাপনী মজুদ		* * *
বিক্রিত পণ্যের ব্যয়		* * *

প্রতিষ্ঠানের নাম ----------

বিশদ আয় বিবরণী

সময় ----------

	টাকা	**টাকা**
বিক্রয়	* **	
বাদ : ফেরত	* * *	
নিট বিক্রয়		* **
বাদ : বিক্রীত পণ্যের ব্যয়		* * *
মোট মুনাফা / লাভ		* **
বাদ : পরিচালন ব্যয় -		
অফিস ও প্রশাসনিক খরচ	* **	
বিক্রয় ও বিতরণ খরচ	* * *	
		* * *
নিট পরিচালন মুনাফা		* **

প্রশ্নমালা

১. দুতরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতি বলতে কী বুঝায়?

২. দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতি বা বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির দ্বারা কী দ্বিগুণ কাজ বুঝায়?

৪. ''দুতরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতি একটি পূর্ণাঙ্গ এবং বিজ্ঞান সম্মত হিসাব ব্যবস্থা''– ব্যাখ্যা করুন।

৫. দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ আলোচনা করুন।

৬. আধুনিক পদ্ধতিতে ডেবিট/ক্রেডিট কীভাবে নির্ণীত হয়?

৭. হিসাব চক্র কী?

৮. হিসাব চক্রের ধাপগুলো বর্ণনা করুন।

৯. 'হিসাব চক্র বিগত ও চলতি বছরের হিসাবের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে'–ব্যাখ্যা করুন।

১০. মূলধন জাতীয় লেনদেন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন বলতে কী বুঝায়? এদের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী?

১১. (ক) মূলধন জাতীয় আয় এবং মুনাফা জাতীয় আয় কী ?

(খ) মূলধন জাতীয় ব্যয় এবং মুনাফা জাতীয় ব্যয় বলতে কী বুঝায়?

১২. (ক) মূলধন জাতীয় লেনদেন এবং মুনাফা জাতীয় দফাসমূহের পার্থক্য নির্ণয় করুন।

(খ) হিসাববিজ্ঞানে মূলধন ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণে এত গুরুত্ব দেওয়া হয় কেন?

১৩. আর্থিক বিবরণী কী?

১৪. একটি আর্থিক বিবরণীর বিভিন্ন ধাপসমূহ কী কী?

১৫. আর্থিক বিবরণীর বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।

১৬. একটি প্রতিষ্ঠানে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আলোচনা করুন।

১৭. হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালার তিনটি 'C' সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১৮. কোন নীতিমালার উপর ভিত্তি করে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য আর্থিক বিবরণীতে দেখানো হয়ে থাকে?

১৯. যে সমস্ত নীতিমালার উপর ভিত্তি করে আধুনিক হিসাব শাস্ত্র গড়ে উঠেছে– সেগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

২০.ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পণ্যের ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য কীভাবে নিরূপণ করা হয়ে থাকে?

২১. উৎপাদন ব্যয় কী ?

২২. উৎপাদন ব্যয়ের উপাদানসমূহ কী কী?

২৩. উৎপাদন ব্যয় হিসাবের উদ্দেশ্য সমূহ আলোচনা করুন।

২৪. উৎপাদন ব্যয় বিবরণী বলতে কী বুঝায়?

২৫. উৎপাদন ব্যয় বিবরণী একটি ছকে দেখান।

২৬.আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সমন্বয় দাখিলার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন।

ইউনিট ৭ : হিসাববিজ্ঞান শিখন-শেখানো কার্যক্রমে সমন্বিত শিখনযাচাই

শিখনযাচাই শিক্ষা প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষায় ও মনোবিজ্ঞানে এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বা কৃতিত্ব, বুদ্ধির বিকাশ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, ক্ষমতা ও প্রবণতা ইত্যাদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একজন বা একদল শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। শিক্ষার গুণগত মানের স্বরূপ নির্ধারণেও শিখনযাচাই এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিখনযাচাই এর মাধ্যমে সাধারণত কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরিধি ও দক্ষতা এবং কৃতিত্বের পরিমাপ করা হয় যা থেকে শিক্ষার গুণগত মানসম্পর্কেও ধারণা করা যায়।

এ ইউনিটের আলোচ্য বিষয়সমূহ হল-

৭.১ : হিসাববিজ্ঞান শিখন-শেখানো শিখনযাচাই কৌশল,শিখন যাচাইয়ের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা

৭.২ : ধারাবাহিক বা গঠনকালীন ও প্রান্তিক বা চূড়ান্ত শিখনযাচাই

৭.৩ :শ্রেণি অগ্রগতি অভীক্ষা প্রণয়ন-১

৭.৪ :শ্রেণি অগ্রগতি অভীক্ষা প্রণয়ন-২

৭.৫ :সৃজনশীল প্রশ্ন -১

৭.৬ :সৃজনশীল প্রশ্ন-২

৭.৭ :নম্বর প্রদানের মানদন্ড

৭.১ : হিসাববিজ্ঞান শিখন-শেখানো শিখনযাচাই কৌশল, শিখন যাচাইয়ের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা

হিসাববিজ্ঞান শিখন-শেখানো শিখনযাচাই কৌশল

শিখনযাচাই/পরিমাপ(Measurement) : একজন শিক্ষার্থী কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে কী পরিমান জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জন করেছে তার সংখ্যাগত পরিমাণ নিরূপণ করাই হলো শিখনযাচাই বা পরিমাপ। যেমন-করিম বার্ষিক পরীক্ষায় হিসাববিজ্ঞানে ৭০ নম্বর পেয়েছে। এটা হল হিসাববিজ্ঞানে করিমের শিখন অগ্রগতির পরিমাপ। শিখনযাচাই মূল্যায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষাগত মূল্যায়ন ও শিখনযাচাই এর মধ্যে পার্থক্য

মূল্যায়ন ও শিখনযাচাই শব্দ দুটি অনেক ক্ষেত্রে একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও বাস্তবে এ দুটি ধারণা পৃথক। শিখনযাচাই এর প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে মূল্যায়নের সাথে এর পার্থক্যগুলো জানা প্রয়োজন।

১. **মূল্যায়ন ব্যাপক কিন্তু শিখনযাচাই সংকীর্ণ :** শিক্ষাগত মূল্যায়ন উদ্দেশ্যমুখী। অর্থাৎ শিক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্যঅর্জন সম্পর্কিত মূল্য বিচার হচ্ছে মূল্যায়নের কাজ। শিখনযাচাইও উদ্দেশ্যমুখী, তবে সংকীর্ণ। যেমন-আমরা যখন কোন নির্দিষ্ট শ্রেণির শিক্ষার্থীদের হিসাববিজ্ঞানের পারদর্শিতার শিখনযাচাই করি তখন কেবল এ শ্রেণির হিসাববিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো কতটা অর্জিত হয়েছে সেটাই বিবেচনা করি।অন্যদিকে মূল্যায়নে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার লক্ষ্য কতটা অর্জিত হয়েছে তা বিবেচনা করা হয়।

২. **মূল্যায়ন সামগ্রিক কিন্তু শিখনযাচাই বিচ্ছিন্নধর্মী :** মূল্যায়ন সার্বিক গুণসম্পন্ন, কিন্তু শিখনযাচাই বিচ্ছিন্নধর্মী। মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, বৌদ্ধিক ইত্যাদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করে। আর শিখনযাচাই এক একটি বৈশিষ্ট্য বা বিষয়ের অর্জন বা শিখন অগ্রগতি পরিমাপ করে।

৩. **মূল্যায়ন গুণগত ও পরিমাণগত কিন্তু শিখনযাচাই কেবল পরিমাণগত :** মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর কোন বৈশিষ্ট্যের পরিমাণগত ও গুণগত উভয় দিক বিচার করা হয। অন্যদিকে শিখনযাচাই হল কোন বৈশিষ্ট্যের পরিমাণগত বিচার। যেমন-একজন শিক্ষার্থী হিসাববিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে ৭০% নম্বর পেয়েছে। এটা হলো হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের জ্ঞানের শিখনযাচাই। আর এর ভিত্তিতে এবং অন্যান্য assessment প্রক্রিয়ার সাহায্যে যদি বলা হয় তার সকল বিষয়ে কৃতিত্ব সন্তোষজনক তবে সেটা মূল্যায়ন।

৪. **মূল্যায়ন ধারাবাহিক প্রক্রিয়াকিন্তু শিখনযাচাই বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া :** মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। অন্যদিকে শিখনযাচাই সম্পূর্ণরূপে সাময়িক ব্যবস্থা। একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীর কতটুকু শিখন অগ্রগতি হয়েছে সেটাই হল শিখনযাচাই এর উদ্দেশ্য। অন্যদিকে মূল্যায়ন কোন সাময়িক প্রক্রিয়া নয় রবং এটি একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া।

হিসাববিজ্ঞান শিখন-শিখানো শিখনযাচাই কৌশল

হিসাববিজ্ঞান শিখন-শিখানো শিখনযাচাই কৌশলগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল-

১. **শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ :** এক্ষেত্রে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ,আগ্রহ ও অংশগ্রহণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে শিখনযাচাই করেন।

২. **মৌখিক প্রশ্ন :** শিক্ষার্থী পাঠের কতটুকু বুঝতে পারল বা পারল না প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তা জানা সম্ভব।

৩. **শ্রেণির কাজ :** শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের দলীয়ভাবে বা এককভাবে কাজ করতে দিয়েও তাদের শিখনের অগ্রগতির মাত্রা যাচাই করা সম্ভব।

৪. **বাড়ির কাজ :** দৈনন্দিন বাড়ির কাজ দিয়ে বা বিশেষ কাজ দিয়েও শিক্ষার্থীর শিখনের ধরন ও মাত্রা সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়।

৫. **কুইজ :** সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন প্রণয়ন করে ধাঁধার আকারে প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমেও হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে শিখনযাচাই করা যায়।

৬. **ইনভেন্ট্রি বা চেকলিস্ট :** শিক্ষক কে কোন দিন কী শিখল তার তালিকা তৈরি করার জন্য শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব দিতে পারেন। শিক্ষক নিজে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর উপর একটি চেকলিস্ট তৈরি করে তাদের শিখনের অগ্রগতি যাচাই করতে পারেন।

৭. **রেটিং স্কেল :** পাঠের বিভিন্ন পয়েন্ট বা বিষয়বস্তুর উপর ৩ মাত্রা বা ৫ মাত্রা স্কেল করে শিক্ষার্থীদের শিখনযাচাই করা যেতে পারে।

৮. **বিতর্ক ও আলোচনা :** হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক, আলোচনা সভা করেও শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি যাচাই করা যায়।

৯. **উপস্থিতি :** দৈনন্দিন উপস্থিতি বা হাজিরার মাধ্যমেও শিক্ষার্থীদের শিখনযাচাই করা যায।

১০. **ডায়েরী লিখন :** শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ডায়েরী লিখতে দিয়েও তাদের মূল্যায়ন করতে পারেন।

১১. **ক্রমপুঞ্জিত বা কিউমুলেটিভ রেকর্ড :** একজন শিক্ষক এক একটি শাখার দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষার্থীদের ক্রমপুঞ্জিত বা কিউমুলেটিভ রেকর্ড সংরক্ষণ করতে পারেন। এটিও শিখনযাচাই এর অন্যতম কৌশল।

১২. **ব্যবহারিক কাজ :** হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে কোন ব্যবহারিক কাজ দিয়েও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখনযাচাই করতে পারেন। যেমন- বিদ্যালয়ের কোন অনুষ্ঠানের সকল হিসাব শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারেন।

১৩. **বিশেষ কৃতকর্মের রেকর্ড :** শিক্ষার্থীদের বিশেষ কৃতকর্মের রেকর্ড সংরক্ষণ করে এবং তার ভিত্তিতেও শিখনযাচাই করা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত কৌশলগুলো ছাড়াও শিক্ষক অন্যান্য কৌশল প্রয়োগ করেও শিক্ষার্থীদের হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে শিখনযাচাই করতে পারেন।

শিখন যাচাইয়ের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষার্থীর শিখন যাচাই শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক সকলের জন্যই এটি গুরুত্বপূর্ণ। শিখন যাচাই এর মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব শিক্ষক ও অভিভাবকগণ জানতে পারেন, একজন শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে কতটুকু জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন করেছে। এ ধরনের শিখনযাচাই শিক্ষার্থীকে জ্ঞান অর্জনে ও পাঠ্য বিষয় আয়ত্ব করতে প্রেরণা দেয়। এর ভিত্তিতে শিক্ষক ও প্রশাসকমন্ডলী উপযুক্ত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম তৈরিতে সমর্থ হয়। এছাড়া শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণে শিখন যাচাই এর কোন বিকল্প নেই। কারণ শিখন যাচাই এর মাধ্যমে শিক্ষক তাঁর শিক্ষাদান কাজের কার্যকারিতা বিচার ও উপযুক্ত শিখন শেখানো পদ্ধতি নির্বাচন করতে পারেন। এর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি তথা কৃতিত্ব তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিচার করা সম্ভব হয়। বিষয়বস্তু, শিখন শেখানো পদ্ধতি ও ব্যবহৃত শিখন শিখানো কৌশলগুলোর কার্যকারিতাও শিক্ষার্থীর শিখনযাচাই এর মাধ্যমে বিচার করা সম্ভব হয়। শিখনযাচাই এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক অগ্রগতি সম্পর্কে জানা যায়। এভাবে শিক্ষার্থীর শিখন সম্পর্কিত সুবিধা অসুবিধাগুলো অবহিত হয়ে প্রয়োজনীয় নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়। শিখনযাচাই শিক্ষাক্রমের কার্যকারিতা সম্পর্কেও অবহিত করে এবং পরিমার্জন ও মানোন্নয়নের দিক নির্দেশনা দেয়। এভাবে শিখনযাচাই শিখন শেখানো কার্যক্রমের প্রতিটি স্তরে গুণগতমান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শিক্ষার ফলপ্রসূ ও উদ্দেশ্যমুখী বাস্তবায়নে সহায়তা করে। শিখন যাচাই এর প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী শিক্ষা কর্মসূচিকে পরিচালনা করলে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়।

৭.২ : ধারাবাহিক বা গঠনকালীন ও প্রান্তিক বা চূড়ান্ত শিখন যাচাই

ধারাবাহিক বা গঠনকালীন শিখন যাচাই

ধারাবাহিক বা গঠনকালীন শিখন যাচাই (Formative Learning Assessment) একটি চলমান শিখন যাচাই প্রক্রিয়া। সাধারণত শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে পরিকল্পিত উপায়ে তদারকি করার জন্য এ জাতীয় শিখন যাচাই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মূলত যে শিখন যাচাই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কোর্স চলাকালীন সময়ে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নকালে কার্যক্রম কতটা অগ্রসর হচ্ছে তা তদারকি করা হয় , তাই ধারাবাহিক শিখন যাচাই। অনেক সময় ধারাবাহিক শিখন যাচাইকে গঠনকালীন শিখন যাচাই বা গাঠনিক শিখন যাচাই নামেও অভিহিত করা হয়। এ ধরনের শিখন যাচাই সাধারণত কোর্স বা কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে শেষ পর্যন্ত চলে। Page ও Thomas তাঁদের International Dictionary of Education এ গঠনকালীন শিখন যাচাই সম্পর্কে বলেছেন , " যে শিখন যাচাই ব্যবস্থা অভীক্ষার ফলাফল থেকে তথ্যের ফলাবর্তন বা ফিডব্যাকের (Feed back) মাধ্যমে শিখন-শেখানো ব্যবস্থাকে উন্নত করতে চায়, যা শিখন-শেখানো পদ্ধতির কার্যকারিতা ও সর্বোচ্চ শিখন প্রতিবন্ধকতার চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম , তাই ধারাবাহিক বা গঠনকালীন শিখন যাচাই। Ruth Sutton তাঁর "Assessment: A Frame Work for Teachers" গ্রন্থে বলেছেন , "ধারাবাহিক বা গঠনকালীন শিখন যাচাই হল আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত একটি চলমান অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে শিশুর শিখন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রমাণ পাওয়া যায় এবং তার মাধ্যমে পরবর্তী ধাপের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় অথবা কোন নির্দিষ্ট কাজকে পরিচালনা করা যায়। Best & Kahn তাঁদের "Research in Education" গ্রন্থে বলেছেন, "ধারাবাহিক বা গঠনকালীন শিখন যাচাই হল একটি চলমান অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। গঠনকালীন পর্যবেক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হল কোন নির্দিষ্ট শিখন কাজের কতটুকু পূর্ণ হল, তার মাত্রা নিরুপণ এবং পূর্ণ সফল শিখন ঘটতে কতটুকু বাকি থাকল তা সুনির্দিষ্টকরণ।"

ধারাবাহিক বা গঠনকালীন শিখন যাচাইয়ের বৈশিষ্ট্য

১। এটি একটি চলমান (On going)ও অবিচ্ছিন্ন (Continuous) প্রক্রিয়া।

২। এটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন কালে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা দেয়।

৩। এটি শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিতে সাহায্য করে।

৪। এটি শিক্ষার্থীদের শিখন উদ্দেশ্যকে পরিমাপ করতে সক্ষম। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত উপায়ে শিখন ঘটছে কিনা তা এ শিখন যাচাই দ্বারা সমাধান সম্ভব।

৫। এ শিখন যাচাই প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় ধরনের হয়ে থাকে।

৬। এ শিখন যাচাই প্রক্রিয়া বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। যেমন-দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক অথবা যে কোন পিরিওডিক শিখন যাচাই।

৭। এর মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষাদানের জন্য পরবর্তী কার্যক্রম কি হবে তা ঠিক করে থাকেন।

৮। এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও উপকরণের ধরণ ও ব্যবহার পরিবর্তন করা যায়।

৯। এ শিখন যাচাই প্রক্রিয়ার প্রধান ক্ষেত্র হল শ্রেণিকক্ষ। অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষেই শিক্ষার্থীদের শিখন -শেখানো সংশ্লিষ্ট সামগ্রিক প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়।

১০। এ শিখন যাচাই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের সফলতা- দুর্বলতা সনাক্ত করে তা সংশোধনের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।

১১। এ শিখন যাচাই প্রক্রিয়ার সময়সীমা বা প্রয়োগের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই।

১২। এ শিখন যাচাই প্রক্রিয়া দ্বারা শিক্ষাক্রমের সুবিধা-অসুবিধা নির্ধারণের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন বা নবায়ন করা সম্ভব।

১৩। এ শিখন যাচাই প্রক্রিয়া বারবার করতে হয় বলে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাভীতি কমে যায়।

১৪। এ শিখন যাচাই প্রক্রিয়ার ফলে শিক্ষার্থী সময় সচেতন হয়ে উঠে।

১৫। এ শিখন যাচাই প্রক্রিয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠে।

ধারাবাহিক বা গঠনকালীন শিখন যাচাইয়ের শ্রেণিবিভাগ

শ্রেণিকক্ষে একজন ব্যস্ত শিক্ষক তার পেশাগত সক্রিয়তা ও দক্ষতার উন্নয়ন এবং শিক্ষণ উদ্দেশ্যকে পরিমাপ করার জন্য প্রতি মুহূর্তে শিখন যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। একজন শিক্ষক ধারাবাহিক বা গঠনকালীন শিখন যাচাইকে নানাভাবে বিভক্ত করতে পারেন। যেমন-

১। শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ (Teachers Observation)
২। শ্রেণির কাজ (Class Work)
৩। শ্রেণি পরীক্ষা (Class Test)
৪। শ্রেণিকক্ষে মৌখিক প্রশ্ন করা (Oral Question in Classroom)
৫। সাপ্তাহিক পরীক্ষা (Weekly Test)
৬। পাক্ষিক পরীক্ষা (Fortnightly Test)
৭। মাসিক পরীক্ষা (Monthly Test)
৮। ত্রৈমাসিক পরীক্ষা (Quarterly Test)
৯। ষান্মাসিক পরীক্ষা (Six Monthly Test)
১০। অর্পিত কাজ বা এসাইনমেন্ট / বাড়ির কাজ (Assignment)
১১। টার্ম পেপার (Term Paper)
১২। সেমিনার (Seminar)
১৩। শিক্ষা সফর (Study Tour)
১৪। রেটিং স্কেল (Rating Scale)
১৫। চেক লিস্ট (Check List)

প্রান্তিক বা চূড়ান্ত শিখন যাচাই (Summative Learning Assessment)

শিখন-শেখানো কার্যক্রম বাস্তবায়ন শেষে কার্যক্রমের সামগ্রিক ফলাফল, প্রভাব ও অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা নিরুপণের জন্য সামগ্রিকভাবে যে মূল্যায়ন করা হয়, তাই হল প্রান্তিক শিখন যাচাই। এ শিখন যাচাইকে চূড়ান্ত শিখন যাচাইও বলা হয়ে থাকে।মূলত যে শিখন যাচাই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সাফল্যের নম্বর , স্কোর , গ্রেড বা সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের সাফল্যের তুলনামূলক অবস্থান নির্ণয় করা হয় এবং সামগ্রিকভাবে শিখন-শেখানো দক্ষতা নির্ণয় করা হয়, তাই প্রান্তিক বা চূড়ান্ত শিখন যাচাই।Page ও Thomas তাঁদের International Dictionary of Educationএ প্রান্তিক বা চূড়ান্ত শিখন যাচাই সম্পর্কে বলেছেন , "কোন শিক্ষা পরিকল্পনা বা কর্মকান্ডের শেষে এর কার্যকারিতা যাচাই হল প্রান্তিক বা চূড়ান্ত শিখন যাচাই। R. N. Pattel বলেছেন , "কোন কর্মকান্ড সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও সর্বশেষ শিখন যাচাই বা সিদ্ধান্ত-ই হল প্রান্তিক বা চূড়ান্ত শিখন যাচাই"।

Best &Kahn তাঁদের "Research in Education" গ্রন্থে বলেছেন , "অধিকাংশ লোক শিখন যাচাই বলতে চূড়ান্ত শিখন যাচাই এর কথাই বিবেচনা করেন। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্যসমূহ হল গ্রেড নির্ণয় , শিখন-শেখানো দক্ষতার বিচার ও শিক্ষাক্রমের পর্যালোচনা।"

প্রান্তিক বা চূড়ান্ত শিখন যাচাইয়ের বৈশিষ্ট্য

১। প্রান্তিক বা চূড়ান্ত শিখন যাচাই একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে , পর্বশেষে , সেমিস্টারশেষে করা হয়।
২। প্রান্তিক বা চূড়ান্ত শিখন যাচাইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হল গ্রেড নির্ণয় , শিখন-শেখানো দক্ষতা নির্ণয় ও শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা।
৩। এটি হল শিক্ষার্থী কর্তৃক নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের চূড়ান্ত অবস্থার শিখন যাচাই।
৪। এটি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ ও অধিকতর উন্নত কার্যক্রম গ্রহণের পথ নির্দেশ করে।
৫। এটি শিখন যাচাই প্রক্রিয়াকে তাৎপর্যপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে তোলে।
৬। প্রান্তিক বা চূড়ান্ত শিখন যাচাই হল শিখন যাচাই প্রক্রিয়ার অপরিহার্য একটি পদক্ষেপ।
৭। এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়।
৮। এটি প্রধানত আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়।
৯। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন ও তার অগ্রগতির একটি সারসংক্ষেপ পাওয়া যায়।
১০। এটি ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার জন্য কার্যকরী সিদ্ধান্ত প্রদানে সক্ষম।
১১। এ শিখন যাচাই উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচনে সহায়তা করে।
১২। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি নির্বাচনের সুযোগ থাকে।

প্রান্তিক বা চূড়ান্ত শিখন যাচাইয়ের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা

প্রান্তিক বা চূড়ান্ত শিখন যাচাই হল শিখন যাচাই প্রক্রিয়ার অপরিহার্য একটি পদক্ষেপ। নিচে প্রান্তিক বা চূড়ান্ত শিখন যাচাইয়ের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হলো-

১। **বিষয়ের দক্ষতা নির্ণয়ে :** এ শিখন যাচাইয়ের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত বিষয়ের দক্ষতা নির্ণয় সম্ভব।

২। **ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে :** এ শিখন যাচাইয়ের ফলে শিক্ষার্থী ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে যে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

৩। **শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিমাপে :** নির্ধারিত বিষয়বস্তুর শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিমাপে এ শিখন যাচাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

৪। **অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণে :** শিক্ষার্থীদের সফলতা ব্যর্থতা অর্থাৎ শিক্ষার অগ্রগতি বা অবনতি এ শিখন যাচাই প্রক্রিয়ার সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে অভিভাবকদের নিকট প্রেরণ করা যায়।

৫। **শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব পরিমাপে :** শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক কৃতিত্ব বা পারদর্শিতা এ শিখন যাচাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জানা যায়।

৭.৩ : শ্রেণি অগ্রগতি অভীক্ষা প্রণয়ন-১

যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল ও ত্বরান্বিত করা এবং উন্নতকরনের জন্য মূল্যায়ন অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মূল্যায়নের মাধ্যমেই বিচার করা হয় শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে কিনা। মূল্যায়ন সংক্রান্ত আলোচনায় তিনটি পদ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হলো টেস্ট বা অভীক্ষা (Test), পরিমাপ (Measurement) ও মূল্যায়ন (Evaluation) । অনেকে এই তিনটি শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। যদিও শব্দ তিনটি সমার্থক নয়। তবে একটির সাথে অপরটির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শিক্ষার্থীর আচরণিক অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে হলে প্রয়োজন অভীক্ষা ও পরিমাপের। যে উপকরণের সাহায্যে পরীক্ষা নেয়া হয় তা হলো অভীক্ষা। উত্তরপত্র যাচাই করে তাতে নম্বর প্রদানকে বলা হয় পরিমাপ। আর এই পরিমাপের ভিত্তিতে যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তখন তাকে বলা হয় মূল্যায়ন।

অভীক্ষা (Test) : কোন বিষয়ে একজন বা একদল শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান,দক্ষতা,দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ পরিমাপের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ও প্রণীত একগুচ্ছ প্রশ্ন বা কাজের নামই অভীক্ষা। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ের যে প্রশ্ন তৈরি করা হয় সেগুলো এক একটি অভীক্ষা।

অভীক্ষার শ্রেণিবিভাগ : পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি অনুসারে অভীক্ষাকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-১.মৌখিক পরীক্ষা ২. ব্যবহারিক পরীক্ষা ৩. লিখিত পরীক্ষা।

লিখিত পরীক্ষার শ্রেণিবিভাগ : লিখিত পরীক্ষা দুই প্রকার। যথা- ক.রচনামূলক অভীক্ষা (Essay type test) খ. নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা (Objective type test)

ক.রচনামূলক অভীক্ষা :রচনামূলক অভীক্ষায় শিক্ষার্থীর কোন বিষয়ে বর্ণনা দেয়ার, ব্যাখ্যা করার ও নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ থাকে। আমরা জানি রচনামূলক প্রশ্নের একটি বৈশিষ্ট হচ্ছে উত্তর দানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে। উত্তরদানের স্বাধীনতার তারতম্য অনুযায়ী রচনামূলক অভীক্ষাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

যথা-ক.বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (Extended answer question)

খ. সীমিত উত্তর প্রশ্ন (Restricted answer question)

ক.বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন (Extended answer question) :এ জাতীয় প্রশ্নে সমস্যাটির বিষয়বস্তু কিছুটা বিশদ হয় এবং উত্তরটি বিস্তারিতভাবে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থী তার উত্তরে বর্ণনায় নৈপুণ্য, বক্তব্যের যৌক্তিকতা, উপস্থাপনের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি প্রকাশ করতে পারে। যেমন-খতিয়ানকে হিসাবের পাকা বহি বলা হয় কেন? -ব্যাখ্যা করুন।

খ. সীমিত উত্তর প্রশ্ন (Restricted answer question) : এ ধরনের প্রশ্নে সমস্যাটিকে ছোট করার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর পরিসীমা কমিয়ে আনা হয় এবং উপযুক্ত নির্দেশনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর উত্তরটি সংক্ষিপ্ত করা হয়। যেমন-জাবেদা ও খতিয়ানের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লিখুন।

রচনামূলক অভীক্ষা (Essay type test) প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নীতিমালা

- যে উদ্দেশ্যে প্রশ্নটি করা হবে প্রশ্নের ভাষায় যেন তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। শিক্ষার্থীদের কোন প্রকার ভুল বোঝার অবকাশ যেন না থাকে।
- প্রশ্নের ভাষা শিক্ষার্থীদের ভাষার দক্ষতা অনুযায়ী হতে হবে। অজানা বাক্যের ব্যবহার বা বাক্যের জটিলতার কারণে যাতে অসুবিধা না হয় যে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।
- প্রশ্নের উত্তরের সীমা বা বিস্তৃতি সম্পর্কে উপযুক্ত নির্দেশনা দিতে হবে। যেমন-হিসাববিজ্ঞান সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে যাহা জান তা লিখ (ত্রুটিপূর্ণ)। হিসাববিজ্ঞান সৃষ্টির ইতিহাসে লুকা প্যাসিওলির অবদান লিখ(ত্রুটিমুক্ত) ।
- অল্পসংখ্যাক বিস্তৃত উত্তর প্রশ্নের পরিবর্তে বেশি সংখ্যাক সীমিত উত্তর প্রশ্ন ব্যবহার করতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি অধ্যায় থেকে প্রশ্ন করতে হবে। একবার পরীক্ষা নেওয়া দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ হলে বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষা নিতে হবে।
- প্রশ্নপত্রে প্রশ্নগুলোকে কাঠিন্যের ক্রম অনুসারে (সহজ থেকে কঠিন) সাজাতে হবে। শিক্ষার্থী প্রথমেই যেন কোন কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে উত্তর না দিতে পারার কারণে নিজের উপর আস্থা হারিয়ে যেন না ফেলে।
- শিক্ষার্থীদের ফলাফলের তুলনা করার প্রয়োজন হলে সকলের একই জ্ঞান ও দক্ষতা যাচাই করতে হবে। এ কারণে প্রশ্ন বাছাই এর সুযোগ বাতিল করতে হবে।
- প্রশ্ন তৈরি করার পর সমতুল্য একটি দলের উপর প্রয়োগ করে উত্তর লেখার জন্য প্রয়োজনীয় সময় নির্ধারণ করে নিতে হবে।

৭.৪ : শ্রেণি অগ্রগতি অভীক্ষা প্রণয়ন-২

শ্রেণি অগ্রগতি অভীক্ষা প্রণয়ন

শিক্ষার্থীর অগ্রগতি অভীক্ষা বলতে বোঝায় কোন কর্মসম্পাদনের দক্ষতা। শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন অভিজ্ঞতা অর্জনের ফলে কতটুকু জ্ঞান দক্ষতা অর্জন করেছে এবং কী ধরনের মানসিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা যাচাই করা হয়।

একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীর শ্রেণি অগ্রগতি যাচাই করার জন্য তিনি নানা ধরনের অভীক্ষা প্রণয়ন করে থাকেন । যেমন- রচনামূলক অভীক্ষা, নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা,লিখিত অভীক্ষা ইত্যাদি।

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা (Objective type test)

যে সকল অভীক্ষার গঠন, প্রয়োগ, নম্বর প্রদানবা ফল নির্ণয়ে পরীক্ষকের কোন ব্যক্তিগত প্রভাব থাকেনা, তাকে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা বলে।এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে খুব সংক্ষিপ্তভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় এবং প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর সুনির্দিষ্টভাবে দিতে হয়। এখানে একটু ভুল হলেই নম্বর কাটা যায়। তাই মনোবিদ বলেছেন যে, Objective tests are items which are highly structured and require the pupil to supply a word or two or to select the correct answer from among a limited number of alternatives.অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা হল অতি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন যার উত্তরে শিক্ষাথীরা দু- একটি শব্দ ব্যবহার করেই উত্তর দিতে পারে এবং এর জন্য খুব কম নম্বর থাকে।

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Objective Type Test)

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল-

১। এ ধরনের অভীক্ষায় প্রশ্নের সংখ্যা অনেক বেশী থাকে বলে শিক্ষার্থীর নানা ধরনের জ্ঞানকে পরিমাপ করা সম্ভব।

২। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুর জ্ঞান সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব।

৩। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়াকে সুনির্দিষ্ট করা যায় অর্থাৎ তারা সুনির্দিষ্টউত্তরটি দিতে বাধ্যহয়।

৪। এ ধরনের অভীক্ষায় প্রশ্নের উত্তরের মান সহজে নির্ণয় করা সম্ভব।কারণ পরীক্ষককে দীর্ঘ উত্তরের দিকে নজর দিতে হয়না।

৫। এ ধরনের অভীক্ষার প্রশ্নের মান পূর্ব নির্ধারিত থাকে ফলে পরীক্ষক তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব আরোপ করতে পারে না।

৬। শিক্ষকের নম্বর কম বা বেশি দেবার সুযোগ থাকেনা।

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার শ্রেণিবিভাগ (Classification of Objective Type Test)

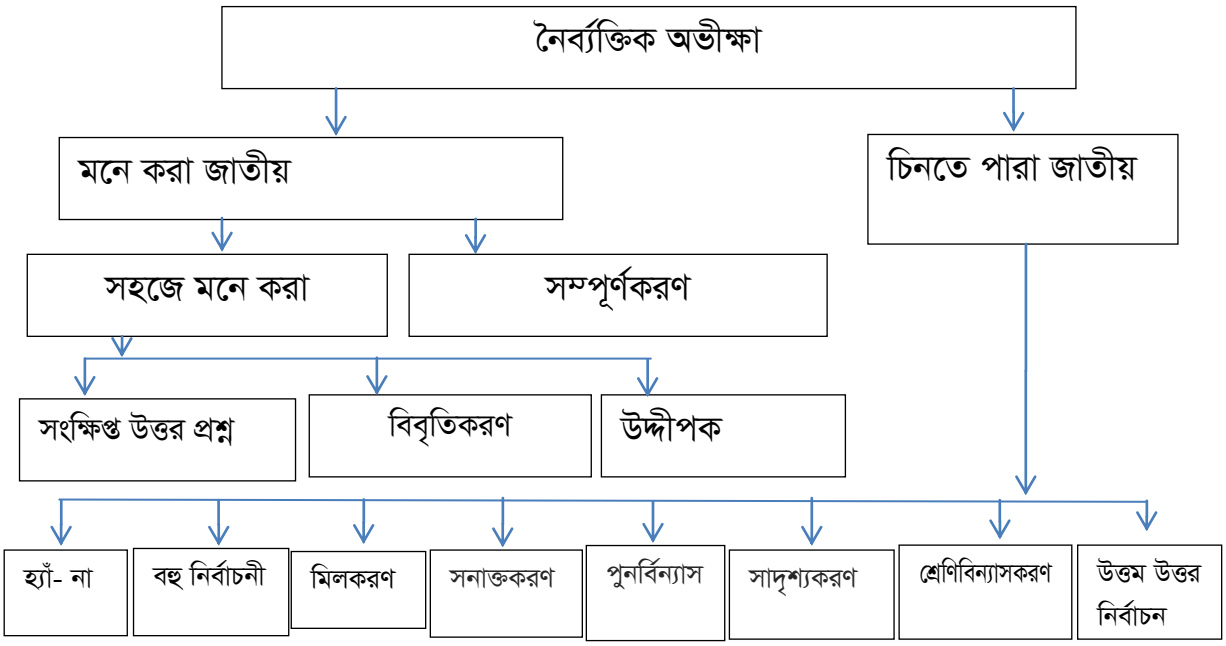

যে সকল নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষায় স্মরণ করে উত্তর দিতে হয় তাদের মনে করা জাতীয় অভীক্ষা বলে। এ জাতীয় অভীক্ষা দু' প্রকারের।

ক) সহজে মনে করা জাতীয়

খ)সম্পূর্ণকরণ জাতীয়

ক) সহজে মনে করা জাতীয়

কোন কিছু শোনা বা জানার পর তা কতটুকু মনে থাকে বা স্মরণ থাকে তা যাচাই করার জন্য এ জাতীয় অভীক্ষা প্রণয়ন করা হয়। এটি আবার তিন প্রকারের, যথা :

১। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন
২। বিবৃতিকরণ জাতীয়
৩। উদ্দীপক জাতীয়

১। **সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :**এ ধরনের অভীক্ষায় এমন ভাবে প্রশ্ন করা হয় যে শিক্ষার্থী তার স্মৃতি থেকে একটি বা দুটি শব্দ দ্বারা উত্তর দিতে পারে। এখানে অভীক্ষা পদটি প্রশ্নের আকারে উপস্থাপন করা হয় এবং উত্তরটি লেখার জন্য পাশে একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকে।যেমন, হিসাববিজ্ঞানের জনক কে?----------

২। **বিবৃতিকরণ জাতীয় :**এ ধরনের অভীক্ষায় কোন বিখ্যাত ব্যক্তির রচনা কিংবা, কোন উদ্ধৃতি অংশ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। শিক্ষার্থী তার স্মৃতি থেকে উত্তর দেয়।যেমন- মোট সম্পত্তির উপর মালিকের দাবীই হুল মালিকানা স্বত্ব। উক্তিটি কার?

৩। **উদ্দীপক জাতীয় :**যে ধরনের অভীক্ষার প্রশ্নের শিক্ষার্থীর মাঝে একটি উদ্দীপনার সৃষ্টি করে সেই ধরনের প্রশ্নকে উদ্দীপক জাতীয় প্রশ্ন বলে।এই জাতীয় অভীক্ষায় দুটি কলাম থাকে।এক কলামে কতগুলো শব্দ ব্যবহার করা হয় যে গুলো অন্য কলামের উত্তর স্মরণ করতে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।যেমন, নীচের বইটি কোন হিসাববিজ্ঞানীর লেখা?

বইয়েরনাম	লেখকেরনাম
Summa de Arithmetica, Geometria,Proportione et Proportionalite	

খ) সম্পূর্ণকরণ জাতীয় অভীক্ষা : এই জাতীয় অভীক্ষায় সাধারণত একটি অসম্পূর্ণ বিবৃতি দেওয়া থাকে। পরীক্ষার্থী উপযুক্ত শব্দ বা শব্দসমূহ ব্যবহার করে বিবৃতিটির অসম্পূর্ণ অংশটি পূর্ণ করে। যেমন- প্রাচীনকালে মানুষ হিসাব সংরক্ষণ করতো----

মনে করা জাতীয় অভীক্ষা : যে অভীক্ষায় পূর্বে চেনা ,জানা বা দেখা কোন ঘটনা বা অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যদি অভীক্ষার্থীকে সনাক্ত করতে বা চিনে বের করেতে বলা হয়,তবে তাকে চিনতে পারা জাতীয় অভীক্ষা বলে।এই জাতীয় অভীক্ষা নানা প্রকার হতে পারে। যেমন-

হ্যাঁ- না জাতীয় অভীক্ষা : এই জাতীয় অভীক্ষায় কোন বর্ণনা বা বিবরণ দেওয়া থাকে এবং উক্ত বিবরণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মতামত হ্যাঁ বা না অথবা টিক চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করতে বলা হয়,তাকে হ্যাঁ বা না জাতীয় অভীক্ষা বলে। যেমন, ভাউচার হল লেনদেনের প্রমাণপত্র। হ্যাঁ/না।

বহু নির্বাচনী অভীক্ষা : এই ধরনের অভীক্ষায় শিক্ষার্থীদের একটি সমস্যা ও তার সম্ভাব্য কতকগুলি উত্তর দেওয়া থাকে। তাদের ভিতর থেকে সঠিক উত্তরটি খুঁজে বের করতে বলা হয়,তাকে বহু নির্বাচনী অভীক্ষা বলে। যেমন-

মূলধন জাতীয় লেনদেন কোনটি? ক) সংস্থাপন মজুরি পরিশোধ খ) মনিহারি ক্রয় গ) বিজ্ঞাপন প্রদান ঘ) বেতন প্রদান

মিলকরণ জাতীয় অভীক্ষা : এই ধরনের অভীক্ষার প্রশ্নে সংযোগ মূলক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে পরীক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা হয়, তাকে মিলকরণ জাতীয় অভীক্ষা বলে।যেমন- প্রাপ্তি প্রদান হিসাবের সাথে কোনটি সামঞ্জস্যপূর্ণ?

ক) আয়- ব্যয় হিসাব খ) নগদান বহি গ) বিশদ আয়-বিবরণী ঘ) রেওয়ামিল

সনাক্তকরণ অভীক্ষা : এই ধরনের অভীক্ষায় প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের সাথে আরো কয়েকটি ভুল উত্তর মিলিয়ে সঠিকটি বের করতে বলা হয়,তাকে সনাক্তকরণ অভীক্ষা বলা হয়। যেমন-জাবেদার পরবর্তী ধাপ রেওয়ামিল /খতিয়ান/আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত/লেনদেন সনাক্তকরণ

পুনর্বিন্যাসকরণ অভীক্ষা : এই ধরনের অভীক্ষায় একটি বাক্যের শব্দগুলোকে এলোমেলোভাবে সাজিয়ে রেখে পরীক্ষার্থীদের সঠিকভাবে সাজাতে বলা হয়,তাকে পুনর্বিন্যাসকরণ অভীক্ষা বলে। যেমন-হিসাবচক্রের প্রথম চারটি ধাপ সাজিয়ে লিখ। খতিয়ানে স্থানান্তর/জাবেদা চূড়ান্তকরণ/লেনদেন সনাক্তকরণ/লেনদেন বিশ্লেষণ

সাদৃশ্যকরণ অভীক্ষা : এই ধরনের অভীক্ষায় প্রথমে সম্পর্কযুক্ত দুটি বস্তু,ঘটনা বা ধারনার অবতারণা করা হয় এবং তারপর আরো একটি বস্তু,ঘটনা বা ধারনা দিয়ে পরীক্ষার্থীকে এ জাতীয় বস্তু,ঘটনা বা ধারনার সাথে কোন বস্তু,ঘটনা বা ধারনার সম্পর্ক তা নির্ণয় করতে বলা হয়,তাকে সাদৃশ্যকরণ অভীক্ষা বলে। যেমন-রেওয়ামিল তৈরির মূল ভিত্তি হল খতিয়ান। খতিয়ান তৈরির মূল ভিত্তি হল- ক)লেনদেন খ)জাবেদা গ) কার্যপত্র প্রস্তুত ঘ)আর্থিক বিবরণী।

শ্রেণিবিন্যাসকরণ অভীক্ষা : এই ধরনের অভীক্ষার প্রশ্নে সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় পরীক্ষার্থীর পৃথকীকরণ ক্ষমতা যাচাই করা হয় এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্যগুলোর একটি বৈশিষ্ট্য বা গুণ ধরে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য খুঁজে উত্তর প্রদান করতে হয়,তাকে শ্রেণিবিন্যাসকরণ অভীক্ষা বলা হয়। যেমন,এখানে কোনটি ভিন্ন?

ক) মোটর গাড়ি খ) ঠেলা গাড়ি গ) রেলগাড়ি ঘ) স্টিমার

উত্তম উত্তর নির্ণয় অভীক্ষা : এই ধরনের অভীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিতে কার্যকারণ সম্পর্ক যৌক্তিকতার মাধ্যমে সনাক্তকরতে বলা হয়, তাকে উত্তম উত্তর নির্ণয় অভীক্ষা বলে।এতে একটি প্রশ্নের একাধিক সম্ভাব্য উত্তর থাকে,যে উত্তরটি সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত সেটি খুঁজে বের করতে বলা হয়।যেমন- হিসাববিজ্ঞানকে ব্যবসায়ের ভাষা বলা হয় কেন? ক)আর্থিক অবস্থা জানতে সহায়তা করে খ) ব্যবসায়ের সকল তথ্য পরিবেশন করে গ)আর্থিক লেনদেন সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করে ঘ)ব্যবসায়ের মুনাফা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৭.৫ : সৃজনশীল প্রশ্ন (Creative Question)-১

সৃজনশীল প্রশ্ন

যে প্রশ্নের শুরুতে একটি নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপক এবং উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট চারটি প্রশ্ন থাকে, তাই সৃজনশীল প্রশ্ন (**Creative Question).** এখানে প্রশ্ন চারটি কাঠিন্যের ক্রমানুসারে থাকে। একটি সৃজনশীল প্রশ্ন চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর যাচাই করতে পারে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষার প্রশ্ন কাঠামোতে সৃজনশীল প্রশ্ন দুই ধরনের। যথা-

১. রচনামূলক সৃজনশীল প্রশ্ন ও ২.বহু নির্বাচনী প্রশ্ন।

১. রচনামূলক সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক পড়ে কোন বিষয়ে পরিস্কার ধারনা অর্জন করল কিনা তা যাচাই করা হয়।এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মেধার পুরোপুরি বিকাশ ও মূল্যায়ন সম্ভব।একই সাথে তা বাস্তবে বা ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে শিখবে।একটি সৃজনশীল প্রশ্নের শুরুতে একটি নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপক এবং উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট তিনটি প্রয়োগমূলক প্রশ্ন থাকে। প্রশ্ন তিনটি কাঠিন্যের ক্রমানুসারে থাকে।একটি সৃজনশীল প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের যাচাই করা যায়।

সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো

হিসাববিজ্ঞানে সৃজনশীল প্রশ্নের তিনটি অংশ থাকে।প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

ক) জ্ঞান,যা সহজ প্রয়োগমূলক।এ অংশটির জন্য ২ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

খ)অনুধাবন,মধ্যম প্রয়োগমূলক।এই অংশটির জন্য ৪ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

গ) উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা বা কঠিন প্রয়োগ স্তরের প্রশ্ন।এই অংশটির জন্য ৪ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

উদ্দীপক/দৃশ্যকল্প

উদ্দীপক/দৃশ্যকল্প হচ্ছে পাঠ্য বিষয়ের আলোকে তৈরি একটি বাস্তব পরিস্থিতি। এটি কখনো লেনদেন সমষ্টি,হিসাব সমষ্টি,অনুচ্ছেদ,স্তবক,সারণি,মন্তব্য ইত্যাদিও হতে পারে। সাধারণত উদ্দীপকটি হয় মৌলিক,সম্পূর্ণ নতুন এবং বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত।সৃজনশীল প্রশ্নটি মানসম্পন্ন হলো কিনা তা উদ্দীপকের মানের উপরই নির্ভর করে।প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তরের প্রশ্নের উত্তর করার ক্ষেত্রে যাতে শিক্ষার্থীকে অবশ্যই উদ্দীপকের সাহায্য নিতে হয় প্রশ্ন দুটি সেভাবেই তৈরি করা হয়। সহজভাবে বলাযায় উদ্দীপকটি ঢেকে রেখে যদি প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা অংশের উত্তর করা যায় তবে বুঝতে হবে উদ্দীপকটি সঠিকভাবে প্রণয়ন করা হয়নি।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নে নির্দেশনাসমূহ

- যে বিষয়বস্তুকে নিয়ে প্রশ্ন করা হবে তা শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- গুরুত্বহীন (Trivial) বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করা যাবেনা।
- প্রশ্নের শুরুতে একটি মৌলিক, আকর্ষণীয় ও সংক্ষিপ্ত উদ্দীপক তৈরি করতে হবে। উদ্দীপক পাঠ্যপুস্তক থেকে সরাসরি নেওয়া যাবে না।তবে উদ্দীপক অবশ্যই শিক্ষাক্রম/সিলেবাস/পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর আলোকে প্রণীত হবে।
- উদ্দীপকে কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়া থাকবে না। বরং উদ্দীপক শিক্ষার্থীকে বিভিন্নভাবে চিন্তা করেতে উৎসাহিত করবে।
- উদ্দীপকের ক নং প্রশ্নের উত্তর খুব সহজেই দিতে পারবে। উদ্দীপকের খ ও গ নং প্রশ্নের উত্তর খুব সহজে দেওয়া যাবে না।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের প্রতিটি অংশের অর্জনযোগ্য দক্ষতা পরিমাপের উপযোগী হতে হবে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যেন বিভিন্নঅংশের উত্তরের কোন পুনরাবৃত্তি নাঘটে।
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যেন প্রশ্নপত্রের অন্যান্য প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরেও কোন পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
- সৃজনশীল প্রশ্নের কোন অংশের উত্তর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্থাৎ তথ্য, তত্ত্ব,ধারনা,সূত্র ইত্যাদি অবশ্যই শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকে থাকতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর প্রদানের নির্দেশনা

সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়।এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় ।এই প্রশ্ন পদ্ধতিতে একজন পরীক্ষাথীকেউদ্দীপক বিবেচনায় এনে উত্তর দিতে হচ্ছে।এক্ষেত্রে উদ্দীপক বিবেচনায় এনে উত্তর দিতে হয়। উদ্দীপক ভাল করে পড়ে এবং বুঝে পাঠ্যবইয়ের তথ্যের আলোকে একজন শিক্ষার্থী উত্তর দিতে গেলে পূর্বেও সনাতন পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে সময় পেত এখন শিক্ষার্থীরা সেই সময় পায় না। কাজেই সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে একটি সৃজনশীল প্রশ্নের প্রতিটি অংশের (ক,খ,গ) জন্য শিক্ষার্থীর কাছে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠার উত্তর প্রত্যাশিত নয়। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে -

১। জ্ঞান দক্ষতার জন্য একটি শব্দ বা একাধিক শব্দ বা বাক্যেপ্রশ্নের উত্তর হতে পারে।তবে উত্তর সর্বোচ্চ ৩ বাক্যেরবেশি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

২। অনুধাবন দক্ষতার প্রশ্নের উত্তর সর্বোচ্চ ৫ বাক্যে সীমিত থাকা বাঞ্ছনীয়।তবে প্রশ্নের উত্তরের চাহিদা অনুযায়ী এই বাক্য সংখ্যা কম বা বেশি হতে পারে।

৩। প্রয়োগ দক্ষতার প্রশ্নের সর্বোচ্চ ১২ বাক্যে সীমিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে প্রশ্নের চাহিদা অনুযায়ী উত্তরে বাক্যের এই সংখ্যা কম বা বেশি হতে পারে।

সৃজনশীল প্রশ্নের উদাহরণ- ১

জনাব পার্থ সাহাএকজন কাপড়ের ব্যবসায়ী। নরসিংদীতে তারব্যবসায় অবস্থিত। তিনি দু' তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসারে যথাযথভাবে প্রতিটি হিসাবের বই সংরক্ষণ করেন। ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তার ব্যবসায়ে লেনদেনগুলো নিম্নরূপ-

ডিসেম্বর ১ নগদ ৭,০০,০০০ টাকা মূলধন স্বরূপ কারবারে আনা হলো।
ডিসেম্বর ১২ ২৫,০০০ টাকার কাপড় ধারে ক্রয় করা হলো।
ডিসেম্বর ২৩ নগদে ৬০,০০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো।
ডিসেম্বর ২৫ কর্মচারী রতনকে বেতন প্রদান করা হলো ৮,০০০ টাকা।
ডিসেম্বর ৩১ নগদে কমিশন প্রাপ্তি ৬,০০০ টাকা।

ক) ডিসেম্বর মাসে মোট কত টাকার পণ্য ক্রয় করা হলো?
খ) জনাব পার্থ সাহার উপর্যুক্ত লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় কর।
গ) জনাব পার্থ সাহার উপর্যুক্ত লেনদেনেসমূহ হিসাবের কোন কোন প্রাথমিক বইতে লিপিবদ্ধ হবে?

ক) এর উত্তর : ডিসেম্বর মাসে পণ্য ক্রয়ের পরিমাণ

তারিখ	বিবরণ	বিস্তারিত টাকা	টাকা
২০১৭ ডিসেম্বর -১২	কাপড় ধারে ক্রয় করা হলো		২৫,০০০

খ) এর উত্তর : প্রদত্ত লেনদেনগলোর ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়

তারিখ	হিসাব খাত	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
২০১৭ ডিসেম্বর ১	নগদান হিসাব ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট	৭,০০,০০০	 ৭,০০,০০০
ডিসেম্বর ১২	ক্রয় হিসাব ডেবিট বিবিধ পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট	২৫,০০০	 ২৫,০০০
ডিসেম্বর ২৩	আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট	৬০,০০০	 ৬০,০০০
ডিসেম্বর ২৫	বেতন হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট	৮,০০০০	 ৮,০০০০
ডিসেম্বর ৩১	নগদাব হসাব ডেবিট প্রাপ্ত কমিশন হিসাব ক্রেডিট	৬,০০০	৬,০০০

গ) এর উত্তর :

লেনদেনসমূহ হিসাবের যে যে প্রাথমিক বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় তা হলো-

তারিখ	বিবরণ	প্রাথমিক বইয়ের নাম
২০১৭		
ডিসেম্বর ১	নগদ ৭,০০,০০০ টাকা মূলধন স্বরুপ কারবারে আনা হলো	নগদ প্রাপ্তি জাবেদা
ডিসেম্বর ১২	২৫,০০০ টাকার কাপড় ধারে ক্রয় করা হলো	ক্রয় জাবেদা
ডিসেম্বর ২৩	নগদে৬০,০০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয় করা হলো	নগদ প্রদান জাবেদা
ডিসেম্বর ২৫	কর্মচারী রতনকে ৮,০০০ টাকার বেতন প্রদান করা হলো	নগদ প্রদান জাবেদা
ডিসেম্বর ৩১	নগদে কমিশন প্রাপ্তি ৬,০০০ টাকা	নগদ প্রাপ্তি জাবেদা

সৃজনশীল প্রশ্নের উদাহরণ-২

কল্যাণ ব্রাদার্স এর ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসের খতিয়ানের উদ্বৃত্তগুলো ছিল নিম্নরূপ-

হিসাবের নাম	টাকা	হিসাবের নাম	টাকা
মূলধন	১,১০,০০০	বীমা সেলামী	৫,০০০
হাতে নগদ(০১/০১/১৭)	১৫,০০০	আমদানী শুল্ক	৩,৫০০
দেনাদার	২৫,০০০	কমিশন প্রাপ্তি	২,০০০
পাওনাদার	১৫,০০০	বিনিয়োগ	৩০,০০০
উত্তোলন	১০,০০০	ব্যাংক জমার সুদ	৫০০
ক্রয়	৩০,০০০	আসবাবপত্র	৪০,০০০
বিক্রয়	৪৫,০০০	বিজ্ঞাপন	১,০০০
বিনিয়োগের সুদ	৩,০০০	প্রারম্ভিক মজুত পন্য	২৫,০০০
সমাপনী মজুদ পন্য	১২,০০০	সমাপনী ব্যাংকে জমা	৬,০০০

ক) কল্যাণ ব্রাদার্সের রেওয়ামিলে যে যে দফা অন্তর্ভুক্ত হবেনা তার মোট পরিমাণ কত?

খ) উপর্যুক্ত খতিয়ান উদ্বৃত্ত দ্বারা জনাব কল্যাণ ব্রাদার্সের একটি রেওয়ামিল তৈরি কর।

গ) উপর্যুক্ত রেওয়ামিল হতে মুনাফা জাতীয় আয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের মোট পরিমাণ নির্ণয় কর।

ক) এর উত্তর :কল্যাণ ব্রাদার্সের রেওয়ামিলে যে দফাগুলি রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হবেনা তার পরিমাণ-

হিসাবের নাম	টাকা
হাতে নগদ(০১/০১/১৭)	১৫,০০০
সমাপনী মজুত পণ্য	১২,০০০
	২৭,০০০

উত্তর : ২৭,০০০ টাকা

খ) কল্যাণ ব্রাদার্সের রেওয়ামিল

কল্যাণ ব্রাদার্স

রেওয়ামিল

৩১ শে ডিসেম্বর২০১৭

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	খঃ পৃঃ	ডেবিট টাকা	ক্রেডিট টাকা
১	মূলধন		২৫,০০০	১,১০,০০০
২	দেনাদার			
৩	পাওনাদার			১৫,০০০
৪	উত্তোলন		১০,০০০	
৫	ক্রয়		৩০,০০০	
৬	বিক্রয়			৪৫,০০০
৭	বিনিয়োগের সুদ			৩,০০০
৮	বীমা সেলামী		৫,০০০	
৯	আমদানী শুল্ক		৩,০০০	
১০	কমিশন প্রাপ্তি			২,০০০
১১	বিনিয়োগ		৩০,০০০	
১২	ব্যাংক জমার সুদ			৫০০
১৩	আসবাবপত্র		৪০,০০০	
১৪	বিজ্ঞাপন		১,০০০	
১৫	প্রারম্ভিক মজুত পন্য		২৫,০০০	
১৬	সমাপনী ব্যাংক জমা		৬,০০০	
			১,৭৫,৫০০	১,৭৫,৫০০

উত্তর : ১,৭৫,৫০০ টাকা।

গ) মুনাফা জাতীয় আয় নির্ণয়-

বিবরণ	টাকা
বিক্রয়	৪৫,০০০
বিনিয়োগের সুদ	৩,০০০
কমিশন প্রাপ্তি	২,০০০
ব্যাংক জমার সুদ	৫০০
	৫০,৫০০

মুনাফা জাতীয় ব্যয়

বিবরণ	টাকা
ক্রয়	৩০,০০০
বীমা সেলামী	৫,০০০
আমদানী শুল্ক	৩,৫০০
বিজ্ঞাপন	১,০০০
প্রারম্ভিক মজুত পণ্য	২৫,০০০
	৬৪,৫০০

উত্তর : মুনাফা জাতীয় আয় ৫০,৫০০ টাকা এবং মুনাফা জাতীয় ব্যয় ৬৪,৫০০ টাকা।

৭.৬ : সৃজনশীল প্রশ্ন (Creative Question)-২

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্নের রচনামূলক সৃজনশীল প্রশ্ন (CQ) নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার আমরা এ অধ্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্নের বহু নির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ) নিয়ে আলোচনা করব।

২. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন (Multiple Choice question)

শিক্ষার্থীর চিন্তাকরার দক্ষতা কোন স্তরে অবস্থান করছে তা মূল্যায়ন করাই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও পরীক্ষার উদ্দেশ্য।শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান পরিমাপ করার জন্য পরীক্ষার প্রয়োজন।বর্তমানে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা পরিমাপের জন্য বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়। বহু নির্বাচনী প্রশ্ন এমন এক ধরনের প্রশ্ন যে প্রশ্নের শুরুতে একটি বিবৃতি অংশ থাকে এবং উত্তর অংশে কয়েকটি বিকল্প উত্তর দেয়া থাকে যার একটি বিকল্প সঠিক।

বহু নির্বাচনী প্রশ্নের গঠন কাঠামো

বহুনির্বাচনী প্রশ্নের একটি উদ্দীপক(Stem)/নির্দেশনা(Instruction) থাকে এবং তার ভিত্তিতে কতগুলো বিকল্প উত্তর(options) দেওয়া থাকে। বিকল্প উত্তরসমূহের মধ্যে একটি সঠিক উত্তর (key) এবং অপরগুলি বিক্ষেপক (Distracters)। এগুলো এমনভাবে প্রণয়ন করা হয় যেন পরীক্ষার্থীদের (যাদের বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই) সেই সকল বিক্ষেপকের দিকে ধাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা

- প্রয়োজনীয় সব তথ্য সরবরাহ করবে।
- সহজ ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে হবে।
- অপ্রাসঙ্গিক উপাদানমুক্ত হবে।
- প্রয়োজনীয় শব্দ অন্তর্ভুক্ত করবে (উত্তরসমূহে কোনো শব্দের পুনরাবৃত্তি থাকবে না)।
- হ্যাঁ বোধক হতে হবে (আর না বোধক শব্দের ব্যবহার অনিবার্য হলে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমনভাবে লিখতে হবে)।
- এমন কোনো ইঙ্গিত দিবে না যাতে পরীক্ষার্থী উত্তরগুচ্ছ থেকে সঠিক উত্তর বাছাই করতে এবং ভুল উত্তর বাদ দিতে পারে।
- নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি করবে না, অর্থাৎ ইতিবাচক হবে

বিকল্প উত্তরসমূহ

- বিষয়বস্তু এবং ব্যাকরণগত গঠনের দিক থেকে প্রশ্নের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে।
- প্রশ্নের অসম্পূর্ণ বাক্যকে অর্থপূর্ণ করে তুলবে।
- পরীক্ষার্থীদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে (প্রতিটি বিকল্প উত্তর মোট পরীক্ষার্থীর কমপক্ষে ৫% পরীক্ষার্থীর পছন্দ করার সম্ভাবনা থাকতে হবে)।
- ক্রমানুযায়ী তালিকাভুক্ত হবে (সংখ্যাবাচক হলে)।
- দৈর্ঘ্যে প্রায় পরস্পর সমান হবে (বাক্যে শব্দ বেশি হলে তা সঠিক উত্তর হবার সম্ভাবনা থাকে)।
- Mutually exclusive/Mutually inclusive যথাসম্ভব পরিহার করবে (প্রকৃতপক্ষে সেক্ষেত্রে বিকল্প উত্তরের সংখ্যা কমে যায়)।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রকারভেদ

১.সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Simple MCQ)
২.বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Multiple Completion MCQ)
৩.অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (Situation Set MCQ)

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। প্রশ্নের শুরুতে সূচনা বা বিবৃতি বা উদ্দীপক থাকবে। একে বলা হয় থিম/স্টিম।
২। উত্তর নির্বাচনে সাধারণত ৪টি বিকল্প বা options থাকবে।
৩। সঠিক বিকল্পটিকে বলা হয় সঠিক বিকল্প বা শবু এবং ভুল বিকল্পগুলোকে বলা হয় বিক্ষেপক বা Distracters।

সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (Simple MCQ)

১. প্রশ্ন শুরু হয়ে থাকে প্রশ্নের আকারে অথবা অসম্পূর্ণ বাক্য হিসেবে যা উদ্দীপকের কাজ করে। তবে এক্ষেত্রে যথাসম্ভব অসম্পূর্ণ বাক্য পরিহার করা উত্তম।
২. ৪টি বিকল্প উত্তর থাকে যার মধ্যে একটি সঠিক।
৩. এ ধরনের প্রশ্নে একটি নতুন পরিস্থিতির দরকার হবে। তবে কখনও কখনও কোন তত্ত্ব, তথ্য, সূত্র, নিয়ম-নীতি ইত্যাদিকে সরাসরি জানতে চাওয়ার দরকার হলে এই অংশের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে নতুন পরিস্থিতির প্রয়োজন নাও হতে পারে।
৪. সহজ স্তরের প্রশ্নসমূহ করা হয়ে থাকে। তবে উদ্দীপকে চিন্তার গভীরতার প্রতিফলনের উপর নির্ভর করে এই ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে মধ্যম ও কঠিন স্তরের প্রশ্নও করা যাবে।

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (Multiple Completion MCQ)

১. নতুন পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে এ ধরনের প্রশ্নের শুরুতে একটি অসমাপ্ত বাক্য থাকে এবং তার পরপরই নিচে ৩টি তথ্য/বিবৃতি/ধারণা দেয়া হয়।
২. ৩টি তথ্য/বিবৃতি/ধারণার ১টি/২টি/৩টি সঠিক হতে পারে।
৩. এ তথ্য সমূহকে সাজিয়ে ৪টি বিকল্প উত্তর তৈরি করা হয় এবং ৪টি বিকল্প উত্তর থেকে শিক্ষার্থীকে একটি বাছাই করতে হয়।
৪. এ ধরনের প্রশ্ন নতুন।
৫. প্রশ্নে বৈচিত্র আসে।
৬. মধ্যম ও কঠিন স্তরের দক্ষতা যাচাই করা হয়।
৭. প্রশ্নে উদ্দীপক ও নির্দেশনা ভিন্নভাবে থাকে।

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (Situation Set MCQ)

একটি উদ্দীপক/দৃশ্যকল্প/সূচনা বক্তব্য (Stem/Scenario/Situation) দিয়েশুরু হবে।

১. এ ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্নে একই উদ্দীপক/দৃশ্যকল্প/তথ্য থেকে কয়েকটি প্রশ্নকরতে হবে।
২. প্রশ্নগুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে অথবা নাও হতে পারে।
৩. উদ্দীপক হতে পারে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ, মানচিত্র, সারণি, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, লেখচিত্র, ছবি ইত্যাদি।
৪. প্রশ্নপ্রণেতা উদ্দীপক নিজে তৈরি করতে পারেন অথবা বিভিন্ন উৎস (পত্রপত্রিকা, রেফারেন্স বই, প্রবন্ধ, গল্প, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, টেলিভিশিন, বিজ্ঞাপন, ও বিজ্ঞাপনচিত্র , চলচ্চিত্র ইত্যাদি) থেকে নিতে পারেন।
৫. মূলত মধ্যম ও কঠিন স্তরের প্রশ্ন তৈরি করা হয়। তবে উদ্দীপকের দৈর্ঘ্য বড় হলে অনেক সময় সহজ স্তরের প্রশ্নও তৈরি করা হয়। তবে তা না করাই ভালো।

প্রশ্নের উদ্দীপক তৈরির কৌশল

- পাঠ্যপুস্তক থেকে অর্জিত জ্ঞানকে কোনো ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে উদ্দীপক প্রণয়ন করতে হবে এবং উদ্দীপক প্রণয়নের সময় বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে দক্ষতার স্তরকে বিবেচনায় রেখে পরিস্থিতি নির্বাচন করতে হবে।
- উদ্দীপকে তথ্যের বহুমুখিতা থাকতে হবে।
- উদ্দীপক হবে মৌলিক। সরাসরি পাঠ্যপুস্তকের সাথে কোনো অংশ/অনুচ্ছেদ ব্যবহৃত হবে না।
- কখনও কখনও সিলেবাস বহির্ভুত কোন প্রবন্ধ, গল্প, ছোট গল্প, এবং কবিতা থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে উদ্দীপকটি যেন প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন তৈরির চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়।
- উদ্দীপকের ভাষা হবে আকর্ষণীয়, সহজে বোধগম্য এবং যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত।
- অপ্রয়োজনীয় শব্দ/বাক্য পরিহার করতে হবে। উদ্দীপক পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে এবং বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে প্রণীত হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের একাধিক অধ্যায় সমন্বয় করেও উদ্দীপক প্রণয়ন করা যেতে পারে।
- পাঠ্যপুস্তক থেকে অর্জিত জ্ঞানকে কোনো ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে উদ্দীপক প্রণয়ন করতে হবে।
- পত্রপত্রিকা, রেফারেন্স বই, প্রবন্ধ, রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারিত বিভিন্ন তথ্য বা ঘটনা, প্রামাণ্য চিত্র, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন চিত্র ইত্যাদি উদ্দীপকের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ, মানচিত্র, সারণি, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, লেখচিত্র, ছবি ইত্যাদি অথবা এগুলোর সমন্বয়ে উদ্দীপক তৈরি হবে।
- দৃশ্যকল্পে প্রশ্নের উত্তর সরাসরি থাকবে না, তবে উত্তর করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করবে।
- একটি প্রশ্নের উত্তর/উত্তরের ইঙ্গিত অন্য কোনো প্রশ্নের উদ্দীপকে থাকবে না।

বহুনির্বাচনী প্রশ্নের উদাহরণ

১। সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন(১)
প্রতিষ্ঠানকে তৃতীয় পক্ষের নিকট বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে সহায়ক কোনটি?
ক) হিসাব খ) লেনদেন গ) জাবেদা ঘ) খতিয়ান
উত্তর : ক) হিসাব

১। সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন(২)
হিসাবের সহকারি বই কোনটি?
ক) জাবেদা খ) খতিয়ান গ) রেওয়ামিল ঘ) নগদান বই
উত্তর : ক) জাবেদা

২। বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন(১)
হিসাববিজ্ঞানের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে-
i. আর্থিক ফলাফল নির্ণয়
ii. আর্থিক অবস্থা নিরুপন
iii. অর্থনৈতিক তথ্য পরিবেশন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii
উত্তর : ক) i ও ii

২। বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন(২)
সমাপনী দাখিলার জন্য প্রয়োজন হবে-
i. উত্তোলন হিসাব
ii. আসবাবপত্র হিসাব
iii. ব্যয় হিসাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) iiও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii
উত্তর : গ) i ও iii

৩। অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন(১)
হিসাববিজ্ঞানে লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের যথাযথ পদ্ধতি কী?
ক) দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির অনুসরণ খ) নগদান বই প্রস্তুতকরণ গ) একতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসরণ
ঘ) রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ
উত্তর : ক) দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির অনুসরণ

৩। অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন (২)
জনাব খসরুর পুরাতন যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের ফলে কোনটি ক্রেডিট হবে?
ক) নগদান হিসাব খ) বিক্রয় হিসাব গ) যন্ত্রপাতি হিসাব ঘ) ব্যাংক হিসাব
উত্তর : গ) যন্ত্রপাতি হিসাব

৭.৭ : নম্বর প্রদানের মানদন্ড

নম্বর প্রদান

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষা পদ্ধতি এবং উত্তর পত্র মূল্যায়নের কোন সুনির্দিষ্ট বা আদর্শমান এখনো গড়ে ওঠেনি। তাই যতজন পরীক্ষক ততটাই পরীক্ষার মান আমরা দেখতে পাই। উত্তর পত্র মূল্যায়ন ও নম্বর প্রদানে সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম না থাকায় পরীক্ষক মহলে যে কত বিচিত্র ও ভ্রান্ত ধারনা আছে তার কোন সীমা পরিসীমা নেই। একেক জন পরীক্ষকের মূল্যায়নের রীতি একেক রকমের।কোন পরীক্ষক ভাষাগত ও ব্যাকরণের দিকে বেশি মনোযোগী হন আবার কোন পরীক্ষক উত্তর পত্রে বেশি উদ্বৃতি পছন্দ করেন। আবার কারো কারো বেশি উদ্বৃতি পছন্দ নয়। হাতের লেখা কেমন বা বানান ভুলের জন্য কোন নম্বর কাটা হবে কিনা ,পরীক্ষক ভাষার উপর বেশি গুরুত্ব দিবেন না তথ্যের উপর গুরুত্ব দিবেন এ সকল বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই ,ফলে উত্তর পত্র মূল্যায়নে ও নম্বর প্রদানে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব পড়ে। অনেকে ভাল লিখে কম নম্বর পায় আবার অনেকে

খারাপ লিখেও ভাল নম্বর পায় ।নম্বর প্রদানে অনেক সময় অভীক্ষকের ব্যক্তিগত মেজাজ, রুচি, প্রবণতার উপরও নির্ভর করে। এ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানী স্যান্ডিফোর্ড বলেন, নম্বর প্রদান ঘন্টায় ঘন্টায় এবং খাওয়ার আগে ও পরে পরিবর্তিত হয় ।এসব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য অভীক্ষা প্রণয়নকারীকে /প্রশ্ন প্রদানে একটি আদর্শ মানদন্ড নির্ধারণ কারা উচিৎ ।সকল ধরনের নৈর্ব্যক্তিক বিশেষ করে বহু নির্বাচনীমূলক বা শূন্যস্থান পূরণ মূলক প্রতি প্রশ্নে এক নম্বর বরাদ্দ থাকে বিধায় এ ধরনের উত্তর মূল্যায়নে কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়না। সমস্যাপূর্ণ ক্ষেত্র হল রচনামূলক প্রশ্নের নম্বর বন্টন ও নম্বর প্রদানে ।প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য বিষয় হল কত সময় পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত? প্রশ্ন পত্রে নম্বর বন্টনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য উত্তরের বিস্তৃতি, উত্তরের প্রকৃতি, কাঠিন্যের মাত্রা,সংশ্লিষ্ট ডোমেইন ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনার দাবী রাখে। এ রকম একটি সম্ভাব্য মানদন্ড নিম্নে প্রদত্ত হলো –

ক্রমিক নং	ক্ষেত্র	প্রশ্নের ধরন	মানদন্ড
১	জ্ঞান	কে, কি,কোথায়,কোনটি------- সংজ্ঞায়িত করা,নামকরণ,নির্দেশ করা ইত্যাদি	১ ২
২	উপলব্ধি	উপলব্ধি কেন,কীভাবে,সাদৃশ্য নির্ণয়,তুলনা করা ইত্যাদি	৩
৩	প্রয়োগ	শ্রেণিবিন্যাস, ভাবসম্প্রসারণ, সর্বায়ন, ব্যাখ্যা,সনাক্ত করা ইত্যাদি	৪
৪	বিশ্লেষণ	বিশ্লেষণ,পার্থক্য,ব্যাখ্যা,আলোচনা করা ইত্যাদি	৪
৫	সংশ্লেষণ	উৎপাদন করা,প্রস্তাব করা,পরিকল্পনা করা, সংক্ষেপ করা ইত্যাদি	৫
৬	মূল্যায়ন	মূল্যায়ন যাচাই করা,গুরুত্ব ,তাৎপর্য,মূল্যায়ন,সমালোচনা বিবেচনা করা ইত্যাদি	৬

সুতরাং নম্বর প্রদানের জন্য একটি উপযুক্ত মানদন্ড থাকা একান্ত জরুরি ।তা না হলে নম্বর প্রদানে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে। বর্তমানে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির কারণে এই পার্থক্য অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।

পরীক্ষার নম্বর প্রদানের মানদন্ড যাচাইকরণ

উত্তরপত্র নিরীক্ষণের পূর্বে শিক্ষার্থী মূল্যায়নের নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষা করার লক্ষ্যে নম্বর প্রদানের মানদন্ড তৈরি করা প্রয়োজন ।কারণ পরীক্ষককে প্রশ্নে উল্লেখিত নম্বরের প্রেক্ষিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে হয়। প্রশ্নের প্রতিটি অংশের যদি নম্বর বিভাজন করা থাকে তবে নিরীক্ষকের জন্য সুবিধা হয় ।অন্যথায় সম্ভাব্য উত্তর নির্ধারণ করতে হয়। এক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রে বিঘ্নিত হয়ে থাকে। এজন্যই নিরীক্ষককে বেশ কিছু সূচি নির্ধারণ করে নম্বর প্রদানের মানদন্ড নির্দিষ্ট করে নিতে হয়। যেমন-

১। বানান ভুল,ভাষাগত ত্রুটি।

২। সংশ্লিষ্ট চিত্র এবং চিত্রের লেবেলিং।

৩। প্রশ্নের সাথে উত্তরেরে যথার্থতা,সংগঠনের মান,উপস্থাপন ইত্যাদি।

প্রশ্নমালা

১. শিখনযাচাই বলতে কী বুঝায়? শিক্ষাগত মূল্যায়ন ও শিখনযাচাই এর মধ্যে পার্থক্য কী?
২. হিসাববিজ্ঞান শিখন-শেখানো শিখনযাচাই কৌশলগুলি আলোচনা করুন।
৩. অভীক্ষা, পরিমাপ ও মূল্যায়ন বলতে কী বুঝায়?
৪. রচনামূলক অভীক্ষা (Essay type test) প্রণয়নের নীতিমালা আলোচনা করুন।
৫. সৃজনশীল প্রশ্ন কী? সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ধাপগুলি আলোচনা করুন।
৬. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন কী? বহু নির্বাচনী প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নীতিমালা আলোচনা করুন।
৭. নম্বর প্রদানের মানদন্ড যাচাইকরণ বলতে কী বুঝায়?

ইউনিট ৮ : হিসাববিজ্ঞান শিখন-শেখানো পরিবেশ উন্নয়ন

আমাদের চারপাশে আমরা যা কিছু দেখতে পাই তাই আমাদের পরিবেশ। আমরা বেড়ে উঠি এই পরিবেশের মধ্যে। বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখি,সমাজে বসবাস করি এ সব কিছুই পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত।আমাদের বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ইউনিটের আলোচ্য বিষয়সমূহ হল-

৮.১ : মাধ্যমিক পর্যায়ে হিসাববিজ্ঞান পাঠের উপযোগী শিখন-শেখানো পরিবেশ তৈরি

৮.২ : হিসাববিজ্ঞান শিক্ষকের যোগ্যতা ও গুণাবলী

৮.৩ : হিসাববিজ্ঞান শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন

৮.১ : মাধ্যমিক পর্যায়ে হিসাববিজ্ঞান পাঠের উপযোগী শিখন-শেখানো পরিবেশ তৈরি

বিদ্যালয়ের পরিবেশ

হিসাববিজ্ঞান পাঠের জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয়ের পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন।বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা দিনের একটি লম্বা সময় অতিবাহিত করে। সুতরাং বিদ্যালয়ের পরিবেশ তাই যে কোন অবস্থাতেই ভাল হওয়া প্রয়োজন। খেলার মাঠ, খেলার সরঞ্জাম, লাইব্রেরী, বিজ্ঞানাগার কম্পিউটার ল্যাব, দক্ষ শিক্ষক, শিক্ষার্থী,অভিভাবক, বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো ইত্যাদি নিয়েই বিদ্যালয়ের পরিবেশ। একজন শিক্ষার্থীর নিকট এগুলো খুবই দরকারী বিষয়। লেখাপড়া শেখার জন্য এগুলি শিক্ষার্থীর মৌলিক দাবী। বিদ্যালয় একটি সামাজিক সংগঠন। সমাজের প্রয়োজনে মানুষ বিদ্যালয় সৃষ্টি করে। সমাজ উন্নয়নের চর্চা হয় এই বিদ্যালয়ে।তাই সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা বিদ্যালয়ে থাকতে হবে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ যদি সুন্দর হয় তবে শিক্ষার্থীর মন বিদ্যালয়ে পড়ে থাকবে এবং সে বিদ্যালয়ে আসার জন্য উদ্গ্রীব থাকবে। শ্রেণির শিখন-শেখানো কাজে শিক্ষার্থীর এ মানসিকতা খুবই প্রয়োজন। তাই যে কোন অবস্থাতেই বিদ্যালয়ের পরিবেশ ভাল হওয়া জরুরি। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে হিসাববিজ্ঞান বিষয়টি পড়ানোর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, উপকরণ, উপকরণ কক্ষ, শ্রেণিকক্ষ, শ্রেণিকক্ষে উপকরণাদি ঝুলানোর সুব্যবস্থা ইত্যাদি।

বিদ্যালয়ের পরিবেশের শ্রেণিবিভাগ

বিদ্যালয়ের পরিবেশকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১) বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ

২) বিদ্যালয়ের বাহ্যিক পরিবেশ

১) বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ

অভ্যন্তরীণ পরিবেশ বলতে বিদ্যালয়ের ভেতরের পরিবেশকে বোঝায়।হিসাববিজ্ঞান বিষয় শিখন-শেখানোতে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে যে সকল উপাদানের মাধ্যমে পরিবেশ সৃষ্টি কার হয় তাকে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ বলে। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উপর বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ থাকে। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উপাদানসমূহ হল-

- দৈনন্দিন কর্মসূচি
- সময় তালিকা
- উপযুক্ত শ্রেণিকক্ষ
- শিক্ষা উপকরণ
- আসন ব্যবস্থা
- আলো বাতাস
- বিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা
- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি
- প্রশিক্ষিত শিক্ষক
- শিক্ষার্থীর আন্তরিকতা ও সহযোগিতা
- বিদ্যালয় ও অভিভাবক সম্পর্ক
- শ্রেণি সংগঠন
- সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী
- বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা
- পরীক্ষা গ্রহণ
- ছাত্রাবাস পরিচালনা
- পাঠাগার ব্যবস্থাপনা
- শিক্ষকের আগ্রহ
- বিদ্যালয়ের কর্মপরিবেশ
- অফিস ব্যবস্থাপনা

- ❖ নথি সংরক্ষণ
- ❖ শিক্ষকের প্রেষণা ও প্রস্তুতি
- ❖ অন্যান্য শিক্ষকের সহযোগিতা
- ❖ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা
- ❖ নিয়মানুবর্তিতা

উপরের এই সব উপাদানের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগি পরিবেশ।

বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ উন্নয়ন

আমাদের দেশের বিদ্যালয় গুলিতে নানা ধরনের অসুবিধা রয়েছে। এই অসুবিধাসমূহ শ্রেণির শিখন কার্যক্রমের উপর নানা প্রভাব বিস্তার করে। ফলে অনেক সময় শিক্ষকের আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ফলপ্রসূ পাঠদান করতে পারেননা।নিম্নে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ কীভাবে উন্নয়ন করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

- দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ
- উপযুক্ত শ্রেণিকক্ষ
- আদর্শ ছাত্র -শিক্ষক অনুপাত
- প্রয়োজনীয় শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী
- যথাযথ জায়গায় বোর্ড স্থাপন
- পানীয় জলের ব্যবস্থা করা
- পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা
- তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার
- পয়ঃনিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা
- লাইব্রেরির সুবিধা
- বিদ্যুৎ সংযোগ
- বাণিজ্য মেলার আয়োজন
- সেমিনার

বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ হিসাববিজ্ঞান শিক্ষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।তাই বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ উপযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২) বিদ্যালয়ের বাহ্যিক পরিবেশ

শিখন-শেখানো পরিবেশের ক্ষেত্রে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যেগুলোর নিয়ন্ত্রণে বিদ্যালয়ের কোন হাত থাকেনা। এ সকল উপাদানগুলো বিদ্যালয় বা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ঐ সব উপাদান দ্বারা যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাকে বাহ্যিক পরিবেশ বলে। অর্থাৎ বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের বাইরের পরিবেশকে বাহ্যিক পরিবেশ বলে। বাহ্যিক পরিবেশ বিদ্যালয়ে হিসাববিজ্ঞান শিক্ষনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই বিদ্যালয়ে হিসাববিজ্ঞান শিক্ষণে বাহ্যিক পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিদ্যলয়ের বাহ্যিক পরিবেশের উপাদানগুলো হল-

- বিদ্যালয়ের অবস্থান
- যাতায়াত ব্যবস্থা
- রাজনৈতিক অবস্থা
- সামাজিক অবস্থা
- ধর্মীয় মূল্যবোধ
- জলবায়ু
- আর্থিক অবস্থা
- সরকার
- আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি
- শিক্ষানীতি
- শিক্ষা ও সংস্কৃতি
- শিক্ষাক্রম
- তথ্য প্রযুক্তি
- উৎপাদন ব্যবস্থা
- কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র

ভাল শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ পরিবেশের সাথে বাহ্যিক পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাহ্যিক পরিবেশের উন্নয়ন কৌশল

অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উপর বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ থাকলেও বাহ্যিক পরিবেশের উপর কোন হাত নেই।অনেক ক্ষেত্রে এটি একটি জটিল ব্যাপার। কারণ বাহ্যিক পরিবেশ উন্নয়ন নির্ভর করে সরকারের সঠিক নীতি মালার উপর, সামাজিক সচেতনতা ও রাজনীতিবিদদের সঠিক ভূমিকা পালনের উপর।আবার জলবায়ুর প্রভাবের উপরও অনেক সময় নির্ভর করে। নিম্নে একটি বিদ্যালয়ের বাহ্যিক পরিবেশ উন্নয়ন কৌশল আলোচনা করা হল-

- সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি
- বিদ্যালয়ের চারপাশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন
- রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি
- শান্তি শৃঙ্খলার উন্নয়ন
- দ্রব্য মূল্যের স্থিতিশীলতা
- সময়োপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন
- বিদ্যালয়ের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি
- উন্নতমানের জীবনবোধ তৈরি
- প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান
- তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার
- জলবায়ু পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
- জীবনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিক্ষার্থীর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের উপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।একটি ভাল পরিবেশ যেমন শিক্ষার্থীকে অনেক কিছু দিতে পারে তেমনই একটি খারাপ পরিবেশের কারণে শিক্ষার্থী অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

৮.২ : হিসাববিজ্ঞান শিক্ষকের যোগ্যতা ও গুণাবলী

আধুনিক যুগে হিসাববিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এই শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মাঝে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সঞ্চারিত করতে হলে হিসাববিজ্ঞান শিক্ষকের দক্ষতা, যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য গুণাবলী থাকতে হবে। বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক ছাড়া হিসাববিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার লাভ করা সম্ভব নয়। একজন হিসাববিজ্ঞান শিক্ষকের যোগ্যতাকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা যায়।
ক। শিক্ষাগত যোগ্যতা
খ। সাধারণ যোগ্যতা

ক। শিক্ষাগত যোগ্যতা: একজন হিসাববিজ্ঞান শিক্ষকের অবশ্যই অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকের মতই প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে। একজন হিসাববিজ্ঞান শিক্ষকের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হল বি কম। একজন হিসাববিজ্ঞান শিক্ষক যদি দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন হতে চায় তবে তাঁর এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান ও সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। শিক্ষককে হিসাববিজ্ঞান সহ বিভিন্ন ধরনের আইন ও বিধি-বিধান জানতে হবে। যেমন-অংশীদারি আইন, কোম্পানি আইন, চুক্তি আইন, ব্যাংকিং আইন, বীমা আইন ইত্যাদি। তদুপরি হিসাববিজ্ঞান শিক্ষকের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ থাকা উচিত। এ কারণে তাঁর বি এড ডিগ্রী থাকা একান্ত প্রয়োজন।

খ। সাধারণ যোগ্যতা: একজন হিসাববিজ্ঞান শিক্ষকের অবশ্যই নিম্নলিখিত সাধারণ যোগ্যতা থাকতে হবে। যেমন-

১। আদর্শবাদী: একজন হিসাববিজ্ঞান শিক্ষককে অবশ্যই আদর্শবাদী হতে হবে। একজন আদর্শবান শিক্ষক সহজেই শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। শিক্ষক তাঁর আদর্শ শিক্ষার্থীদের মাঝে সঞ্চারিত করে তাদেরকে শিক্ষা লাভে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াস পান। ফলে শিক্ষার্থীরা পাঠ গ্রহণে মনোযোগী হয়।

২। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন: একজন হিসাববিজ্ঞান শিক্ষককে অবশ্যই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হতে হবে। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীরা শ্রদ্ধাশীল থাকে। ফলে তাঁর পাঠদান শিক্ষার্থীরা খুব মনোযোগ সহকারে গ্রহণ করে।

৩। বন্ধুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি: একজন হিসাববিজ্ঞান শিক্ষককের দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করতে হলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বন্ধুসুলভ হতে হবে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে কোনরূপ দেয়াল থাকা উচিত নয়। তাহলে তাদের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুসুলভ সম্পর্ক বজায় থাকলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে হিসাববিজ্ঞানের কঠিন সমস্যাগুলো সহজেই সমাধান করতে পারবে।

৪। নির্ভীক ও দৃঢ়চেতা : একজন হিসাববিজ্ঞান শিক্ষককে অবশ্যই উন্নত চরিত্র, নির্ভীক ও দৃঢ়চেতা হতে হবে। তাঁকে সহজ, সরল ও সাবলীল হতে হবে। পাঠদানকালে তিনি যা বোঝেন তা দৃঢ় ও সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করবেন।

৫। বিচক্ষণ : একজন হিসাববিজ্ঞান শিক্ষককে অবশ্যই সুচতুর , উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন ও বিচক্ষণ হতে হবে। পাঠদানকালে হঠাৎ যে কোন প্রশ্নের তাৎক্ষণিক উত্তর দেবার ক্ষমতা তার থাকতে হবে।

৬। ধৈর্য সম্পন্ন: একজন সার্থক হিসাববিজ্ঞান শিক্ষককের অবশ্যই ধৈর্যশীল ও পরিশ্রমী হতে হবে। শিক্ষার্থীরা হিসাববিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলো আয়ত্ত করতে না পারলে ধৈর্যসহকারে বারবার তাদেরকে পাঠদান করতে ও বোঝাতে হবে।

৭। বিনয়ী: একজন সার্থক হিসাববিজ্ঞান শিক্ষককে অবশ্যই নম্র, ভদ্র, বিনয়ী, হাসিখুশি ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা তাঁর উপর আস্থা ও শ্রদ্ধা রাখতে পারে।

৮। **সুন্দর বাচনভঙ্গিঃ** একজন দক্ষ, যোগ্যতাসম্পন্ন ও সফল হিসাববিজ্ঞান শিক্ষককের বাচনভঙ্গি অবশ্যই সুন্দর ও আকর্ষণীয় হতে হবে। সুন্দর বাচনভঙ্গিসহ পাঠ উপস্থাপন করা হলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ হয় এবং সেই সাথে সাথে পাঠ আত্মস্থ করা সহজতর হয়।

৯। **দুরদৃষ্টি সম্পন্ন :** একজন হিসাববিজ্ঞান শিক্ষককে অবশ্যই দুরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে। তাঁকে পূর্ব থেকেই বুঝতে হবে শ্রেণিকক্ষে কোন বিষয় কিভাবে উপস্থাপন করতে হবে। পাঠদানের সাথে কোন শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করলে শিক্ষার্থী সহজে তা আয়ত্ত্ব করতে পারবে, সেটি তাকে বুঝতে হবে।

১০। **শিক্ষার্থীর আগ্রহ বৃদ্ধিঃ** একজন হিসাববিজ্ঞান শিক্ষকের অন্যতম গুণ ও যোগ্যতা হল শিক্ষার্থীর আগ্রহকে বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হওয়া। শিক্ষার্থীর সঙ্গে অনভিপ্রেত আচরণ না করে তাকে প্রশংসা করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আগ্রহকে বৃদ্ধি করতে হবে। সুতরাং একজন হিসাববিজ্ঞান শিক্ষককের একটি প্রধান গুণ হলো শিক্ষার্থীর আগ্রহকে জোরদার করতে সচেষ্ট হওয়া।

১১। **পাঠ পরিকল্পনার সাহায্য নেয়া :** একজন সফল ও দক্ষ হিসাববিজ্ঞান শিক্ষকের অন্যতম গুণ হলো তিনি পাঠদানের সময় পাঠপরিকল্পনার সাহায্য নিবেন। হিসাববিজ্ঞান শিক্ষক দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন হতে চাইলে পাঠদানের পূর্বে তাকে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত করতে হবে। পরিকল্পিতভাবে পাঠদান শিক্ষার্থীকে অধিকতর তথ্য গ্রহণের সুবিধা প্রদান করে।

১২। **আত্মসমালোচনা :** একজন সার্থক হিসাববিজ্ঞান শিক্ষককে তার কার্যক্রমের সমালোচনা করতে হবে। সফল হিসাববিজ্ঞান শিক্ষক হতে হলে প্রতিটি পাঠদানের শেষে যাচাই করে দেখতে হবে কোথাও কোন সমস্যা হয়েছে কিনা। সমস্যা হলে তা কী কারণে হয়েছে এবং সমস্যা কীভাবে সমাধান করলে সর্বোত্তম সুবিধা পাওয়া যাবে ইত্যাদি। একজন হিসাববিজ্ঞান শিক্ষক তাঁর দৈনন্দিন শিক্ষা কার্যক্রম সমালোচনা করার মাধ্যমে তাঁর পাঠদানকে উন্নত করতে পারেন।

১৩। **শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার :**একজন আধুনিক হিসাববিজ্ঞান শিক্ষককে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাদান করার যোগ্যতা থাকতে হবে।

১৪। **প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজের দায়িত্বগ্রহণ :**একজন দক্ষ হিসাববিজ্ঞান শিক্ষককে শিক্ষাদানের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব পালনে আগ্রহী হতে হবে।

১৫। **উপকরণ ব্যবহারে পারদর্শী হওয়া :** একজন আধুনিক হিসাববিজ্ঞান শিক্ষককে হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়াবলী সহজভাবে উপস্থাপনের জন্য পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ ব্যবহারে পারদর্শী হতে হবে।

৮.৩ : হিসাববিজ্ঞান শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন

পেশাগত উন্নয়ন

শিক্ষকতা একটি মহান ও স্বীকৃত পেশা। তাই একজন হিসাববিজ্ঞান শিক্ষককে অবশ্যই তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হয়। শিক্ষকতাকে আধুনিক ও সময়োপযোগি করতে হলে পেশাগত উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা খুবই জরুরি। শিক্ষকতা একটি সমাজসেবামূলক কাজ। তাই এ কাজের উন্নয়নের সাথে সমাজের উন্নয়ন সম্পৃক্ত। পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন বিষয় ও পেশার প্রতি গভীর জ্ঞান আহরণের ইচ্ছা এবং শিক্ষার্থী প্রীতি। এছাড়া প্রয়োজন দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ। যেমন- বলা ও লেখার দক্ষতা, উপকরণের ব্যবহার, শিক্ষার্থীর পরিমাপও মূল্যায়নদক্ষতা ইত্যাদি। বর্তমান আর্থ- সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে বিষয়বস্তু ও ধ্যান ধারণায় নতুনত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। সেজন্য শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক পাঠদান কৌশল পরিচালনা, শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতা প্রয়োজন। একজন হিসাববিজ্ঞান শিক্ষকের অবশ্যই শিক্ষা, পেশাগত বিষয়াবলি ও সাধারণ বিষয়াবলিতে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও ধারণা থাকতে হবে।

পেশাগত উন্নয়নের গুরুত্ব

নিম্নোক্ত কারণে পেশাগত উন্নয়ন প্রয়োজন। যেমন-

১। পেশাগত মূল্যবোধ ও আনুগত্য সৃষ্টি
২। শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি
৩। গুণগত শিক্ষার উন্নয়ন সাধন
৪। কার্যকর শিক্ষাদান ও জ্ঞান বৃদ্ধি
৫। বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উন্নয়ন সাধন
৬। পেশাগত সুসম্পর্ক সৃষ্টি এবং
৭। শিক্ষা উপকরণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

হিসাববিজ্ঞান শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে করণীয় দিকসমূহ

পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো একজন হিসাববিজ্ঞান শিক্ষকের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়। বর্তমান সময়ের সর্বশেষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন পেশাগত দায়িত্ববোধ ও অংগীকার। পেশাগত উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। এজন্য নিম্নোক্ত উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তোলা সম্ভব। যেমন-

- পাঠ্যপুস্তক , সহায়ক গ্রন্থ পাঠ ও অনুশীলন
- পেশাগত সংগঠনের সদস্য হওয়া
- জার্নাল, নিউজ লেটার প্রভৃতি পত্রিকা সংগ্রহ

- গবেষণা প্রতিবেদন সংগ্রহ
- সেমিনার, ওয়ার্কশপ,দলগত আলোচনা, বিতর্ক প্রভৃতির আয়োজন করা
- অভিভাবকদের মতামত বিনিময় সভার আয়োজন করা
- শিক্ষা সংবাদ, শিক্ষা বার্তা, সাময়িকী ইত্যাদি মানসম্মত বই অধ্যয়ন
- শিক্ষা সম্মেলন, শিক্ষা মেলা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন
- শিক্ষক নিজে গবেষণা কাজে নিয়োজিত থেকে এবং শিক্ষার্থীদেরকে নির্দেশিত কাজ দিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি
- পূর্ব নির্ধারিত ভিডিও প্রদর্শন, চলচিত্র বা টিভি অনুষ্ঠান দেখা (যেমন- বাউবি পরিচালিত শিক্ষামূলক কার্যক্রম) বা রেডিও-তে প্রচারিত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান নিয়মিত শোনা
- শিক্ষকের ব্যক্তিগত ও স্কুল পাঠাগার ব্যবহার করা

সময়োপযোগী শিক্ষা ধারণা সম্পর্কে নিজেকে প্রস্তুত করা সমাজের চলমান ঘটনাবলির পরিবর্তনের সাথে সাথে একজন হিসাববিজ্ঞান শিক্ষককে তথ্য সমৃদ্ধ হতে হয়। হিসাববিজ্ঞান শিক্ষার বিভিন দিক সম্পর্কে বিষয়ভিত্তিক তথ্যসমূহ হালনাগাদ করতে হলে নিম্নোক্ত উৎসের সহযোগিতা নিতে হয়। যেমন-

- দৈনিক পত্রিকা
- রেডিও-টিভি অনুষ্ঠান
- শিক্ষকদের পারস্পরিক আলোচনা
- সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন
- সেমিনার- সিম্পোজিয়াম
- ইন্টারনেট ব্রাউজিং
- প্রবন্ধ
- সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্স
- পেশাগত জার্নাল, সাময়িকী
- বিষয়ভিত্তিক ম্যাগাজিন
- সুধী সমাবেশ / সংঘ
- ওয়ার্কশপ, দলীয় আলোচনা ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাছে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হলেন শিক্ষক। তাই তাকে চলমান বিশ্বের তথ্য ভান্ডারের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়া এবং তা শিক্ষার্থীদের জানানো পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের হাতিয়ার এবং দায়িত্ব বলে বিবেচিত।

প্রশ্নমালা

১. বিদ্যালয়ের পরিবেশ বলতে কী বুঝায়?
২. বিদ্যালয়ের পরিবেশের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন।
৩. বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ বলতে কী বুঝায়? এ পরিবেশ উন্নয়নের উপায়সমূহ আলোচনা করুন।
৪. বিদ্যালয়ের বাহ্যিক পরিবেশ বলতে কী বুঝায়? এ পরিবেশ উন্নয়নের উপায়সমূহ আলোচনা করুন।
৫. একজন হিসাববিজ্ঞান শিক্ষকের যোগ্যতা ও গুণাবলী আলোচনা করুন।
৬. পেশাগত উন্নয়ন কী? এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৭. হিসাববিজ্ঞান শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে করণীয় দিকসমূহ আলোচনা করুন।
৮. সময়োপযোগী শিক্ষা ধারণা সম্পর্কে হিসাববিজ্ঞান শিক্ষককে প্রস্তুত হবার কৌশল বর্ণনা করুন।

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

১. Weygandt, Kieso & Kimmel – Principles of Accounting (9th Edition)
২. হিসাববিজ্ঞান (নবম ও দশম শ্রেণি)-জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB)
৩. প্রফেসর দীপক কুমার নাগ– উচ্চ মাধ্যমিক হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র (সৃজনশীল)
৪. প্রফেসর পরেশ চন্দ্র মণ্ডল ও অন্যান্য– উচ্চ মাধ্যমিক হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র (সৃজনশীল)
৫. প্রফেসর আবদুর রহিম আকন ও অন্যান্য– উচ্চ মাধ্যমিক হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র (সৃজনশীল)
৬. Basu & Das– Cost Accounting.
৭. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (পেডাগজী)-ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এসিসট্যান্স প্রজেক্ট,২য় পর্যায়
৮. সহকারী প্রধান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল-মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প
৯. মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষক নির্দেশিকা-ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ
১০. বিষয়ভিত্তিক সিপিডি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল- হিসাববিজ্ঞান
১১. ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ- মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প
১২. প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা (ToT Guide),একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি-টিকিউআই-২
১৩. জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২, হিসাববিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি-জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB)
১৪. শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানবৃন্দের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল- সেসিপ